আবরণ



বিচিত্রা

৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২॥

'......the painted veil which
those who live
call life.'

সহসা আঁতকে ওঠে মেয়েটি।

কী ?—প্রশ্ন করে অন্যজন।

বন্ধ ঘরের অন্ধকারেও মনে হয় আতংকের ছায়া ফুটে উঠেছে মেয়েটির মুখে।

—কে যেন দোর ঠেলছে।

—বোধ হয় তোমাব আয়া। কী জানি, কোনো চাকর বাকর নয়তো।

—ওরা তো এ সময় আসে না! জানে আমি ঘুমোই।

—তাহলে কে ?

—ওয়ালটার!

ফিস ফিস করে উত্তর দেয় মেয়েটি। আতংকে ঠোঁট কাঁপছিল তার। জুতো জোড়ার দিকে ইংগিত করে মেয়েটি। কিন্তু তার ভয়ের ছোঁয়াচ সংগীটিকেও কেমন বিহ্বল করে তুলেছিল যেন। জুতোটাও বুঝি ঢুকছে না পায়। একটু কেমন আঁট। সু-হর্ন এগিয়ে দিলো মেয়েটি। একটা কিমনো সর্বাংগে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে আসে মেয়েটি তারপর। ড্রেসিং টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় সে। মাথার চুলগুলো কেমন বিশ্রী এলোমেলো। অসংযত চুলগুলো বিন্যস্ত করে নেয় দাঁড়িয়ে। ওর জুতো পরা হয়ে গিয়েছে তখন। কোটটা এগিয়ে দিলো তাকে মেয়েটি।

—কিন্তু আমি বের হবো কী করে ?

—একটু অপেক্ষা করো বরং। দেখে আসছি বাইরে সব ঠিক আছে কিনা।

—কিন্তু ওয়ালটার নিশ্চয়ই আসে নি। পাঁচটার আগে কখনো কি লেবরেটরি থেকে বেরোয় ওয়ালটার ?

—তাহলে······?

ফিস ফিস করে কথা বলে তারা। মেয়েটি কাঁপছিল থর থর করে। ভাবনা ছিল ওর এমনি সংকট মুহূর্তে হয়তো সব গুলিয়ে ফেলবে মেয়েটি—রাগ হোল মেয়েটির ওপর তার। এমনি আশংকাই যদি ছিল আগে বলেনি কেন ?

আতংকে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে মেয়েটির। বাহু জড়িয়ে ধরে সে সংগীটির—লক্ষ্য করে ওর দৃষ্টিপথে। বারান্দার দিককার জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা। জানলার খড়-খড়ি নাবান, ছিটকিনি তোলা, হাতলের সাদা নবটা ঘুরে গেল-না ধীরে ধীরে! কিন্তু বারান্দায় কারো চলার শব্দ নেই তো! এমনি নিঃশব্দ গতি কেমন সন্ত্রস্ত করে তুলছিল ওদের। একটা মিনিট কেটে গেল, কোন সাড়া-শব্দ নেই আব! আবার যেন একটা ভৌতিক শিহরণ,—চুপি চুপি নিঃশব্দে আর একটা জানলার হাতলও ঘুরে গেল-না! কিটীর সমস্ত স্নায়ু বুঝি শিথিল হয়ে আসছিল, এক্ষুনি বুঝি সে চিৎকার করে উঠবে। সর্বনাশ! কিটীর মুখ চেপে ধরে তার সংগীটি। ওরই হাতের মুঠোর ভেতর মিলিয়ে গেল কান্নার বেগ। সব নিস্তব্ধ চারিদিকে। ওর সংগীটির গায়ে হেলান দিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো কিটী, হাঁটু কাঁপছিল তার, এই বুঝি মূর্ছা যাবে। ভ্রূকুটির রেখা দেখা দিলো ওর কপালে। কঠিন হাতে তুলে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিলো ও কিটীকে। মুখের রঙ ধবধবে সাদা, রক্তের চিহ্ন মাত্রও নেই একটু—ওর মুখও বুঝি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে কেমন। দাঁড়িয়ে রইলো সেও কিটীর পাশে, অপলক দৃষ্টি জানলার ঐ হাতলটার উপর। কারো মুখে কথা নেই। বুঝলো কাঁপছে কিটী।

—দোহাই তোমার, কিটী; অমন করো না।

কেমন যেন বিরক্তির প্রকাশ।

—যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন এ-বিপদ থেকে তো উদ্ধার পেতে হবে কোন রকমে!

রুমাল খুঁজছিল কিটী। হাত-ব্যাগটা এগিয়ে দিলো তাকে।

—তোমার টুপি?

—নিচে রেখে এসেছি।

—সর্বনাশ!

—শোন, অস্থির হয়ো না কিটী। একশবার বলছি ওয়ালটার আসেনি। এ সময় সে আসতে পারে না কিছুতেই। কোনো দিন কি এসেছে এমনি সময়?

—না।

—তবে? আমি বাজি ফেলছি, তোমার আয়া এসেছিল।

হাসিব একটা নিষ্প্রভ ছায়া খেলে গেল কিটীর ঠোঁটের কোনে। ওর কথাব আত্মবে সুব কিছুটা বল ফিরিয়ে আনে কিটীর মনে। হাতেব মৃদু চাপ অনুভব করে কিটী তার হাতে। সম্বিত ফিরে পেতে একটু সময় লাগে কিটীর।

—শোন, এ ভাবে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। ঐ বারান্দার দিকটায় একটু দেখে আসবে? বলে ও।

—কিন্তু আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

—ঘরে ব্র্যাণ্ডি আছে?

মাথা নাড়ে কিটী।

ভ্রুকুটি-কুটিল হয়ে আসে ওর ভ্রূ যুগল। কেমন অধৈর্য হয়ে উঠছিল সে। বুঝতে পারছিল না কী করবে। হাত ছুটো ওর চেপে ধরে হঠাৎ কিটী।

—সে যদি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে?

জোর করে এক-টুকরো হাসি আনে ওর ঠোঁটের কোনে। গলার স্বুর মৃদু মিঠে। বলে ও:

—মনে হয় না। একটু স্থির হও কিটী, আমি বলছি তোমার স্বামী আসেনি। যদি এসেই থাকে, নিচে অপরিচিত লোকের টুপি আর উপরে এসে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ, এই দেখেও তার কি চুপ করে থাকা সম্ভব? নিশ্চয়ই তোমার কোন চাকর এসেছিল। চীনেরাই শুধু ও-রকম করে দরজার হাতল ঘুরোয়।

বুকে যেন বল আসে আরো একটু।

—যদিও-বা আয়া, তবু ব্যাপারটা……

—ভয় কী, ওকে সামলে নেওয়া যাবে। সরকারি চাকুরির খুব কিছু সুবিধে না থাকলেও অন্তত ইচ্ছামতো ওটা গুছিয়ে নিতে পারবো।

হয়তো ঠিক। উঠে দাঁড়ায় কিটী। দু-বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে যায় ওর দিকে। দৃঢ় আলিংগনে টেনে নেয় কিটীকে, বিলম্বিত চুম্বন নেমে আসে কিটীর ঠোঁটের ওপর। অদ্ভুত আনন্দ-বেদনার কেমন শিহরণ লাগে শিরায় শিরায়! কিটী বিহ্বল, বিমুগ্ধ; বাহু-বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় কিটী। ছিটকিনি খুলে খড়খড়ি তুলে বাইরে তাকায় সে। কেউ নেই কোথাও। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীর ড্রেসিং-রুমে উঁকি দেয় একবার। তারপর নিজের বসার ঘরে। শূন্য; কেউ নেই। শোবার ঘরে ফিরে যায় কিটী। ইসারা করে ওকে।

—কেউ নেই।

—আমার ধারণা সবটাই একটা দৃষ্টিভ্রম।

হাসে একটু সে।

—হেসো না বলছি। কী ভয় আমার হয়েছিল! বসার ঘরে গিয়ে বসো একটু। মোজা চড়িয়ে জুতোটা পরে আসছি এক্ষুনি।

অপেক্ষা করছিল সে কথামতো।

ফিরে এলো কিটী কয়েক মিনিটের ভেতবই। সিগারেট ফুঁকছিল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বললো :

—দেখ, কিছুটা ব্র্যাণ্ডি আব সোডা ব্যবস্থা করতে পাবো ?

—দাঁড়াও দেখছি।

বেল বাজায় কিটি।

—আমি ভাবছিলাম বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে নিশ্চয়ই তোমার ভয় করবে না, কেমন না ?

অপেক্ষা করে তারা। মুখে রা নেই কারো।

বেয়ারা আসে।

হুকুম করে কিটী।

—আচ্ছা, লেবরেটবিতে একটা ফোন করে দেখোনা ওয়ালটার আছে কিনা? বলে কিটী। তোমার গলার আওয়াজ কেউ চিনবে না।

রিসিভার তুলে নম্বর চাইলো। ডাঃ ফেন আছেন ? জিজ্ঞাসা করে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

—টিফিনেব পর থেকে ওয়ালটার নাকি সেখানে নেই। বেয়ারাটাকে জিজ্ঞাসা করো তো বাড়ি এসেছিল কিনা ?

—ও আমি পারবো না। যদি সত্যই ও বাড়ি এসে থাকে, অথচ আমার সঙ্গে দেখা হয়নি ওর,—ভারি বিশ্রী হবে কিন্তু তখন—

বেয়ারা ফিরে এলো বোতল আর গ্লাস নিয়ে। টাউনসেণ্ড একটা গ্লাস এগিয়ে দেয় কিটীকে। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায় কিটী।

—যদি ওয়ালটারই এসে থাকে ?…আবার প্রশ্ন করে কিটী।

—কী আর হবে, কিছু মনে করবে না সে।

—কে, ওয়ালটার? অবিশ্বাসের সুর বেজে উঠে কিটীর কণ্ঠে।

—আমার কিন্তু ধারণা ডাঃ ফেন ভীষণ লাজুক। তা ছাড়া, জানো তো এ-রকম কেলেঙ্কারি অনেকেই কিন্তু সইতে পারে না। আর কোনো রকম কেলেঙ্কাবি সৃষ্টি করে যে কিছু লাভ হবে না এটা বোঝাবার মতো সহজ বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে ওর। তবে আমি এখনো বিশ্বাস করি না ওয়ালটারই এসেছিল। আর সত্যি সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে, এও আমি নিশ্চিত কোন কথাই ও বলবে না, কোন আমলই দেবে না হয়তো।

কী যেন ভাবে কিটী কিছুক্ষণ। বলে :

—আমাকে অদ্ভুত ভালোবাসে ওয়ালটার।

—সে তো আরো ভালো কথা। তাকে সামলে নিতে পারবে খুব সহজে।

সেই মন-ভোলানো হাসির রেখা ভেসে উঠে ঠোঁটের কোনে আবার। এ হাসির মাদকতা এড়াতে পারেনি কোনদিন কিটী। সে এক অদ্ভুত মৃদু হাসি। স্বচ্ছ চোখের নীল তারায় চিকমিকিয়ে উঠে এর ঝলক, তারপর ধীবে ধীরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে ঐ হাসি। ছোট ছোট শুভ্র দাঁতের পাটি ও-হাসির মাদকতা যেন আরো দেয় বাড়িয়ে। ঐ হাসিব কামনা উচ্ছলতায় যেন উদ্বেল হয়ে উঠে কিটীর বুকের ভেতর। জোয়ার বয়ে যায় প্রতি শিরায় শিরায়। সব ভুলে যায় কিটী।

—যাক গে, কোনো লাভ নেই আর মিছে ভেবে। এই তো হবার ছিল।

গা-ঝাড়া দেয় কিটী।

—দোষ অবিশ্যি আমারই।

—সত্যি, তুমি এ-সময় কেন এসেছিলে বলোতো? তোমায় দেখে কিন্তু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—না এসে যে পারলাম না !

—সত্যি ?……

বিহ্বল কিটী—নিজেকে এগিয়ে দেয় আরো একটু। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওব দিকে—সে দৃষ্টিতে জ্বলে উঠে কামনার শিখা। টাউনসেণ্ড আরো নিবিড় বাহুবন্ধনে টেনে নেয় কিটীকে। সেই নিভৃত আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেয় কিটী—পূর্ণ পবিতৃপ্তিতে।

—আমাব উপর নির্ভর ক'বা কিটী।

—তোমাকে পেয়ে খুবই খুশি আমি। মাঝে মাঝে ভাবি—যে সুখ আমি পেয়েছি তোমার কাছ থেকে ততটুকু সুখী তোমাকেও যদি কবতে পারতাম আমি !

—তাহলে আর কোন ভয় নেই তোমাব ?

—ভয় নয়, আমি ঘৃণা কবি ওয়ালটাবকে।

এব যে কী উত্তব ভেবে পেলো না টাউনসেণ্ড। সে শুধু একটুখানি চুম্বন এঁকে দিলো প্রত্যুত্তরে। ঠোঁটেব পবশ যেন আবো কোমল হয়ে এলো কিটীব ঠোঁটের ওপর।

কিটীব মণিবন্ধে আঁটা ছোট সোনাব হাতঘড়িটা তুলে দেখালো টাউনসেণ্ড।

—এখন আমার কী কবা উচিত বলোতো ?

—কী ? কেটে পড়া ?

মৃদু হাসে কিটী। মাথা নাড়ে টাউনসেণ্ড।

আরো নিবিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে কিটী। কিন্তু বুঝতে পাবে ওর চলে যাবাব ইচ্ছা ; শিথিল করে দেয় বাহুবন্ধন।

—সত্যি, এ ভারি লজ্জার কথা, তুমি তোমার কাজকর্মে খুবই অবহেলা করছো কিন্তু। যাও, এবাবে পালাও দেখি লক্ষ্মী ছেলেটির মতো।

—কেন, আমায় তাড়াতে পারলে বাঁচো, না ? কথায় একটু কপট সুর।

—তুমি জানো, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না একটু সময়ও।
কিটী গম্ভীর। হেসে ওঠে টাউনসেণ্ড। আত্মতৃপ্তির হাসি।
—যাক শোন। তোমার ঐ ছোট্ট মাথাটা আজকের ঐ আগন্তুকের কথা ভেবে আর ঘামিও না লক্ষীটি। তোমার আয়াই তো এসেছিল। আর সত্যিই যদি কোন রকম গোলমাল বেঁধে উঠে তার যা কিছু ব্যবস্থা আমিই করবো, এইটুকু কথা আমি দিচ্ছি তোমাকে।
—কেন, এরকম অভিজ্ঞতা তোমার আছে নাকি?
খেলে গেল কেমন একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের হাসি কিটীর চোখে মুখে।
—না, তবে এইটুকু বলতে পারি মগজ বলে একটা পদার্থ এখনো আছে আমার মাথায়।

বাড়ি থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল কিটী। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে কিটী তার শিরায় শিরায়। বয়স ওর চল্লিশ পেরিয়েছে মাত্র। কিন্তু কী চমৎকার দৈহিক গঠন ওর—কৈশোরের চাঞ্চল্য ওর চলার প্রতি ছন্দে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিটী সেদিকে। ছায়ায় ঘেরা বারান্দা। প্রেমের পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে ভরা ওর মন। ওই ভাবেই সে দাঁড়িয়ে থাকে আরো অনেকক্ষণ।
তাদের বাড়িটা পাহাড়ের ধারে 'হ্যাপিভ্যালিতে'। পীকের উপর আরো বনেদি পরিবেশে থাকার সংগতি কোথায় তাদের। অদূরে নীল সমুদ্র; পোতাশ্রয়ে জাহাজের আনাগোনার ভিড়; কিছুই যেন ধরা পড়ছিল না তার উদাসীন দৃষ্টিতে। সে মগ্ন তার প্রেমিকের চিন্তায়।

বিকেলের এই বিশ্রী ঘটনার কথাই ভাবছিল কিটী। কিন্তু সে-যে সত্যি কিটীকে চায়; কী করে ফিরিয়ে দেয় তাকে? এমনি টিফিনের পর আরো কদিনই তো এসেছে টাউনসেণ্ড। তুপুরের এই রোদে কেই-বা খোঁজ নেয়! তার আসা-যাওয়া বাড়ির বেয়ারাগুলোও টের পায়নি কোনদিন। কী বিশ্রী এই হংকং সহরটা! কিছুতেই এটাকে বরদাস্ত করতে পারেনি কিটী! ভিক্টোরিয়া রোডের ঐ নোংরা ছোট্ট বাড়িটায় যেতেও কেমন ভয়-ভয় করে তার। ঐখানেই তারা দেখা করতো গত কদিন; কিউরিও-র দোকান। দোকানের ঐ বুড়ো চীনেটার চাউনি সহ্য করতে পারে না কিটী। ঐ বুড়োটাই ওকে দোকানের পেছন দিকে দোতলার সিঁড়িতে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসতো, ওর ঐ বিশ্রী হাসিটায় গা ঘিন-ঘিন করে উঠতো কিটীর।

দোতলার ঘরটার চেহারা আরো জঘন্য। দেয়ালের গায়ে কাঠের পালঙটির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠতো সে।

প্রথম দিনই চার্লিকে বলেছিল কিটী।

—কী বিশ্রী ভয়ানক জায়গা এটা!

—হ্যাঁ, তোমার আসবার আগে পর্যন্ত কিন্তু তাই ছিল বটে। উত্তর দিয়েছিল চার্লি। পরমুহূর্তেই কিন্তু আবার সব ভুলে গিয়েছিল কিটী।

তুজনার কেউ তারা মুক্ত নয় আজ। এই কথাটা ভাবতেও ভীষণ খারাপ লাগে কিটীর। চার্লির স্ত্রীকে কোনদিন ভালো লাগেনি তার! এমনি এলোমেলো চিন্তার স্রোত কিছুক্ষণের জন্য যেন বাধা পেলো ডরোথি টাউনসেণ্ডের কথায়। ডরোথি! কী অদ্ভুত নাম! বয়সটাও তো কম নয়! আটত্রিশ তো বটেই। ওর স্ত্রী সম্বন্ধে কোনদিন কোন আলাপই হয়নি চার্লির সংগে। আর কতটুকু পরোয়াই-বা করে চার্লি তার স্ত্রীকে। দেখতেই পারে না তাকে। তবে অভদ্র নয় চার্লি। কথাগুলো

ভাবতে ভাবতে একটা পরিহাসের হাসি ভেসে ওঠে কিটীর মুখে, অনেকটা চার্লির মতো। স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও স্ত্রীর সম্বন্ধে ভুলেও কোনদিন কোন কটু কথা শোনেনি ওর মুখে। কিটীর এলোমেলো চিন্তাধারা কত কী ভেবে চলে এমনি। ডরোথি কিছুটা লম্বাটে, কিটীর চেয়েও। দোহারা। মাথার চুলগুলো কেমন ফ্যাকাশে বাদামি। বয়সের লাবণ্যটুকু ছাড়া কোন দীপ্তি নেই তার কান্তিতে। কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও চেহারা মোটা-মুটি ভালোই। নীলাভ চোখ দুটোও কেমন যেন ভাষাহীন। গায়ের চামড়া, ওদিকেও দুবার তাকাতে ইচ্ছে করে না। কোনো আভা নেই গালে, কেমন ফিকে ফ্যাকাশে। পোশাকও পরে তেমনি, যেমন তার পদমর্যাদা—হংকং এ সহকারী ঔপনিবেশিক সেক্রেটারির স্ত্রী তো সে! ভাবতে ভাবতে প্রচ্ছন্ন পরিহাসের একটুখানি আভা ফুটে ওঠে কিটীর ঠোঁটের কোনে।

ডরোথি টাউনসেণ্ডের গলাটা ভারি মিষ্টি। এটা কিটী অস্বীকার করে না। মা হিসেবেও চমৎকার এই ডরোথি। চার্লি প্রশংসা করেছে অনেকবার। কিটীর মার ভাষায় ডরোথি সত্যি-কারের একজন ভদ্রমহিলা। তবু ওকে দেখতে পারে না কিটী। ভালো লাগেনা ওর গা-ছাড়া ব্যবহার। ওর বাড়িতে পার্টি বা ডিনারে ওর ভদ্রতার আতিশয্য বিশ্রী লাগে কিটীর। দেখে দেখে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়েছে কিটীর মনে যে, সংসারে ডরোথি আর কিছুই জানে না নিজের ছেলেদের ছাড়া। ওর দুই ছেলে তখন ইংলণ্ডে, ছোট ছয় বছরের ছেলেটিকেও দেশে পাঠিয়ে দেবে শিগগির। সব সময়ই ডরোথি বুঝি আছে একটা মুখোস পরে। ওর মুখে হাসি, মিষ্টি কথা, যখনকার-যা সবই আছে ঠিক। কিন্তু তবুও যেন ওর ভদ্রতার ভেতর অন্তরংগতার কেমন অভাব। এই সারা কলোনিতে হয়তো দুটি একটিই অন্তরংগ বন্ধু আছে ডরোথির—শুধু এদের মুখেই ডরোথির প্রশংসা। তার

সম্বন্ধেও মিসেস টাউনসেণ্ডের ধারণাটা খুবই সন্তোষজনক নয় এই কথাটাও যেন কেন মাঝে-মাঝে মনে হয় কিটীর।

আরক্তিম হয়ে ওঠে কিটী ভাবতে ভাবতে। কিন্তু এসব ভেবেই-বা কী লাভ! ডরোথির বাবা ছিলেন একজন ঔপনিবেশিক গভর্ণর। তবে যতদিন চাকুরি ততদিনই সমাজে মর্যাদা। উঠতে বসতে সম্মান, আদর আপ্যায়ন। কিন্তু অবসর নেবার পর সমাজে কোথায় তাঁর স্থান! ডরোথি টাউন-সেণ্ডের বাবা আর্ল'স-কোর্টে একটা ছোট্ট বাড়িতে অবসর ভোগ করছেন এখন। কিটীর মা কিন্তু কোনদিন সইতে পারতেন না এদের সব। কিটীর বাবা বাবনার্ড গারস্টিন কিংস কাউন্সেল। কিছুদিনের ভেতর হয়তো জজও হবেন। সাউথ কেনসিংটনেই আছেন ওঁরা এখন।

বিয়ের পর হংকং এসে এই কথাটা কোন মতেই নিজের মনে খাপ খাওয়াতে পাবছিল না কিটী যে, স্বামীব পদমর্যাদাব ওপবই তাব নিজেব সামাজিক প্রতিষ্ঠা। আপ্যায়নেব ত্রুটি অবিশ্যি কোন-দিক থেকেই হয়নি; দু তিনটে মাস তাব কেটেছিল রোজই কোন-না-কোন পার্টিতে যোগ দিয়ে। রাজভবনে স্বয়ং গভর্ণরও তাকে আপ্যায়িত করেছেন। অথচ এর ভেতবও এটুকু সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল যে, সবকারি ব্যাকটিওলজিষ্ট-এব স্ত্রী হিসেবে তার সামাজিক মূল্য কতটুকু। ভীষণ বাগ হোত কিটীর। স্বামীকে বলেছিল :

—এ অসহ্য! আমাদের বাড়িতে পাঁচ মিনিট কথা বলার যোগ্যতা এদের কারো আছে? এদের কাকুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করার কথা মা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না!

—কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ বলো? এতে কীই-বা যায় আসে? স্বামী বলেছিল।

—যায় আসে না সত্যি। কিন্তু জানো তো আমাদের বাড়িতে কারা সব আসতো, আর এখানে কেউ গ্রাহ্যই করে না যেন!

—জানো তো, সামাজিক জীব হিসেবে বৈজ্ঞানিকের কোনই অস্তিত্ব নেই? মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল ওয়ালটার।

বুঝতে পেরেছে কিটী এতদিনে সেই কথাটা। বিয়ের আগে জানা ছিল না কিটীর।

মনের ভাব গোপন করেছিল কিটী হালকা হাসির ভেতর। কিন্তু এই হালকা ভাবের পেছনে যে তিরস্কারটুকুও ছিল ওয়ালটার কিন্তু তা বুঝতে পেরেছিল। কিটীর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে একটুখানি চাপ দিয়েছিল শুধু।

—সত্যি, আমি খুবই দুঃখিত কিটী। এ নিয়ে মন খারাপ করো না লক্ষ্মীটি।

—পাগল নাকি! উত্তর দিয়েছিল কিটী।

ওয়ালটার নিশ্চয়ই আসেনি চাকরদের ভেতরই কেউ হয়তো! এরা জানতে পারে অনেক কিছু, কিছু যায় আসে না—জানলেও মুখ খুলবে না কখনো, চুপ করেই থাকে।

দরজার হাতলটা কেমন অদ্ভুত ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়েছিল; ভাবতেও বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে ওঠে যেন এখনো। এ রকম বিপদের ঝক্কি আর কখনো নেবে না কিটী। এর চেয়ে কিউরিও দোকানে যাওয়াই ভালো। কেউ কিছু জানবে না—ভয়েরও কিছু নেই। দোকানের মালিক জানে চার্লিকে।

পেছনে লাগার সাহস করবে না কখনো। চার্লি ভালোবাসে তাকে, এই তো তার বড় পাওয়া—কী তার চাই এর চেয়ে!

এমনি কত কী ভাবছিল কিটী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ভাবতে ভাবতে নিজের বসার ঘরে ফিরে যায় কিটী। সোফায় গা এলিয়ে হাত বাড়ায় একটা সিগারেট তুলে নিতে। একটা বইয়ের উপর কী একটা কাগজের টুকরো পড়ে আছে যেন! খুলে দেখে কিটী। পেনসিলে লেখা—

> প্রিয় কিটী,
> এই বইটা তুমি চেয়েছিলে। বইটা নিয়ে যাচ্ছিলাম, রাস্তায ডাঃ ফেনের সংগে দেখা। বললেন তিনিও বাড়ির পথে যাচ্ছেন। তাঁর হাতেই দিয়ে দিলাম।
> ভি-এইচ

বেলটা টেপে কিটী। বইটা কে এনেছে জিজ্ঞাসা করে বেয়ারাকে।
—কর্তা নিজেই এসেছিলেন, টিফিনের পর। উত্তর দেয় বেয়ারা।
আর সন্দেহ নেই, ওয়ালটারই এসেছিল তবে।

টেলিফোনটা তুলে নেয় কিটী। খবরটা দিলো চার্লিকে; কিন্তু কোনো সাড়া নেই!
—এখন কী করবো? আবার জিজ্ঞাসা করে কিটী।
—একটা জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত আছি। এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। আপাততঃ চুপ করে থাকো।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখে কিটী, বুঝতে পারে যার জন্যে তার এতটা ধৈর্যচ্যুতি সে কিন্তু নির্বিকার।

সোফাটায় এসে বসে আবার। হাতের উপর মুখটা ভর দিয়ে ভাবতে থাকে কিটী। ওয়ালটার নিশ্চয় মনে করেছে সে ঘুমিয়ে—তাই বুঝি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ—অস্বাভাবিক নয়! তারা কোন কথাবার্তা বলছিল কি তখন? মনে করতে চেষ্টা করে কিটী, কই না, জোরে তারা কোন কথা বলে নি! কিন্তু টুপিটা যে ছিল!

চার্লি টুপিটা আবার কেন যে নিচে রেখে এসেছিল! কিন্তু ওকে দোষ দিয়ে কী লাভ? নিচে রেখে আসাই তো স্বাভাবিক! তবে হয়তো নজরে পড়েনি ওয়ালটারের। নিশ্চয়ই খুব তাড়াহুড়ো ছিল তখন ওর—বইটা রেখেই হয়তো বেরিয়ে গিয়েছিল ওয়ালটার। কিন্তু কী আশ্চর্য, জানলায় না গিয়ে দরজায়ই তো আগে ধাক্কা দেওয়া উচিত ছিল ওর! ঘুমিয়ে আছে মনে করে হয়তো ডাকেনি আর তাকে! সত্যি, কী বোকা সে!

একটু গা ঝাড়া দেয় কিটী।

চার্লির কথা ভাবতে ভাবতেই কেমন একটা মধুর শিহরণ জাগে ওর শিরায় শিরায়। ভাববার কী! ঠিকই হয়েছে! চার্লি তো বলেইছে বিপদে থাকবে তার পাশে! আসুক না যত বিপদ·········কী যায় আসে·········। যা খুশি করুক ওয়ালটার। চার্লি আছে তার পাশে। ভয় কী! ওয়ালটার জানুক, জানলেই ভালো! কোনদিন ভালোবাসতে পারেনি সে ওয়ালটারকে! চার্লি টাউনসেণ্ডকে ভালোবাসার পর স্বামীর আদর ওর মনে হয়েছে বিষ! স্বামীর সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু ওয়ালটার কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না। কিটী অস্বীকার করবে। আর অস্বীকার করা একান্তই যদি অসম্ভব হয় সত্যকে প্রকাশ করে দিতে একটুও ভয় পাবে না আর কিটী। যা খুশি করবে ওয়ালটার।

বিয়ের তিন মাসের ভেতরই কিটী বুঝতে পেরেছিল কী ভুল সে করেছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী তার মা—সে তো নয়!

দেয়ালের গায় তার মার একটা ফটো ঝুলছিল। কিটীর দৃষ্টি পড়লো সেটার উপর। কিন্তু সে জানে না কেন এটাকে

টাঙিয়েছে এখানে—যার উপর তার এমন কিছু টান নেই! তার বাবার ফটোও ছিল একটা বাড়িতে; সেটা নিচে পিয়ানোটার ওপর। উইগ আর গাউন পরা। কিন্তু এ পোশাকেও ছবিটা তেমন খোলেনি আদৌ। ছোট খাটো ওঁর চেহারা; চোখ দুটো যেন কেমন ক্লান্ত; উপরের ঠোঁট যেন একটু লম্বা; মুখটা একটু পাতলা ধরণের। প্রসন্ন করতে গিয়েও কেমন একটা কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠেছে মুখে। তবু মিসেস গারস্টিন স্বামীর এই ছবিটাই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ছবিটা—স্বামী যেদিন সরকারি উকিল হিসেবে আদালতে যোগ দিয়েছিলেন, সেই দিনকার তোলা; ভেলভেট গাউনে তাঁকে মানিয়েছিল চমৎকার—চুলে পাখির পালক আর হাতে ফুলের তোড়া। মিসেস গারস্টিন সোজা দাঁড়িয়েছিলেন। বয়স তখন তাঁর বছর পঞ্চাশেক। পাতলা চেহারা। চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে আছে। কিন্তু তাঁর নাকটা ভারি সুন্দর। মাথায় বেশ কিছুটা ঘনকৃষ্ণ চুল। সুন্দর কালো চোখ দুটো যেন সদা চঞ্চল, আর ঐটুকুই তাঁর চেহারার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কথা বলবার সময় ঐ চঞ্চল চোখ দুটো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়; কোনো কিছু, কারো উপর যেন নিবদ্ধ নয় তাঁর দৃষ্টি—বুঝি কোন সংযোগ নেই কথার সংগে ওঁর মনের।

কিটী জানতো তার মায়ের স্বভাব—বড় কঠিন, দয়া মায়ার লেশ মাত্র নেই। উচ্চাশা ওঁর বড় বেশি, কর্তৃত্বাভিমানও যথেষ্ট। লিভারপুলের এক সলিসিটরের মেয়ে তিনি। তাঁরা পাঁচ বোন। বারনার্ড গারস্টিনের সংগে নর্দান সারকিটেই তাঁর প্রথম পরিচয়। সেদিন মনে হয়েছিল গারস্টিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত—কিন্তু

বাস্তবে হয়নি তা। পরিশ্রমে বিমুখ ছিলেন না তিনি, প্রতিভাও ছিল তাঁর ; কিন্তু নিজেকে বড় করবার ইচ্ছারই যেন অভাব ছিল তাঁর ভেতর। তাঁর চরিত্রের এই দিকটাই সহ্য করতে পারেননি মিসেস গারস্টিন। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিজের উন্নতি এবং সাফল্য সম্ভব এঁকেই আশ্রয় করে। তাই নিজের অভীপ্সিত পথে চালিয়ে নিলেন স্বামীকে। স্বামীর স্পর্শকাতর স্বভাব হয়তো বিদ্রোহ করেছে কখনো, কিন্তু অশান্তি বাড়বার সংগে সংগে ক্লান্ত হয়ে পরাভব স্বীকার করেছেন বারনার্ড। এটা মিসেস গারস্টিন আবিষ্কার করেছিলেন। তাই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির তাগিদেই উপায় খুঁজতে লাগলেন মিসেস গারস্টিন। যে-সব সলিসিটর তাঁর স্বামীকে ব্রীফ দিতেন তাঁদের তিনি তোয়াজ করতেন—ওদের বাড়ির মেয়েদের সংগে হৃদ্যতা করতে চেষ্টা করতেন মিসেস গারস্টিন।

মাঝে মাঝেই ডিনার পার্টি দিতেন মিসেস গারস্টিন। কিন্তু গত পঁচিশ বছরে এমন কেউ আসেনি তাঁর পার্টিতে যাকে সত্যিকার পছন্দ করতেন তিনি। ক্ষমতাপ্রিয়তার মতো কৃপণ স্বভাবও আর একটা বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রের। বেশি খরচ করা ঘৃণার চোখে দেখতেন তিনি। অল্প খরচেও বেশি জাঁক-জমক করতে পারেন তিনি এটা ছিল তাঁর একটা গর্ব। তাই তাঁর ডিনারে বাহুল্য থাকতো কিন্তু খরচ করতেন খুব কম। দুধের সোয়াদ ঘোলে মেটাতে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত।

বারনার্ড গারস্টিনের ওকালতির পশার মোটামুটি মন্দ ছিল না। তবু তাঁর পরে বার-এ যোগ দিয়েও অনেকেই তাঁকে ছাড়িয়ে গেল। মিসেস গারস্টিন স্বামীকে পার্লামেন্টে দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করলেন। ইলেকশন খরচ অবিশ্যি পার্টিরই ; কিন্তু এখানেও তাঁর কৃপণ স্বভাব তাঁর ক্ষমতা লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। তিনি যথাযথ খরচ করতে পারলেন না। নির্বাচনে জয়লাভ করতে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সব চাঁদা দেওয়া দরকার বারনার্ড গারস্টিন তাও যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারেন নি। নির্বাচনে হেরে গেলেন গারস্টিন। পার্লামেণ্ট সদস্যের স্ত্রী বলে পরিচয় দেবার আকাংক্ষা ছিল তাঁর, তবু মিসেস গারস্টিন এ পরাজয়ের নৈরাশ্য স্থির-চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই সুযোগে অনেক বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর, পরাজয়ের গ্লানির ভেতরও এইটুকুই তাঁর লাভ। তিনি অবিশ্যি জানতেন বারনার্ড পার্লামেণ্টে গিয়ে কিছুই করতে পারবেন না, তবু তাঁর আশা ছিল তু-একবার দাঁড়াতে পারলে অন্তত একটা পার্টির সহানুভূতি থাকবে বরাবরই।

বারনার্ড কিন্তু তখনো তাঁর জুনিয়র নাম কাটাতে পারেন নি। তাঁর চেয়েও কম বয়সের অনেকেই ততদিনে কিংস কাউন্সেল হয়ে গিয়েছে। এতদিনে তাঁরো হওয়া প্রয়োজন, নইলে যে জজ হওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া মিসেস গারস্টিনের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদও ছিল কম নয়। বড় বড় ডিনার পার্টিতে তাঁর চেয়ে কম বয়সের মেয়েদের পেছনের আসনে বসা তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু এতদূর এগিয়ে এসেও স্বামীর কঠিন একগুয়েমির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে অবশেষে। স্বামীর স্বভাবের এদিকটা সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় ছিল না এতদিন। বারনার্ডের কী জানি কেন একটা ভয় ছিল কে-সি হয়ে হয়তো কোন ব্রীফই পাবেন না তিনি। স্ত্রীকে বুঝিয়েছিলেন যা আছে তাই তো বেশ, যা নেই তার জন্য লোভ করে লাভ কী? হয়তো উপার্জন আরো কমে যেতে পারে। স্ত্রী টাকার যুক্তিতে নরম হবেন এই ধারণা বারনার্ড করেছিলেন। কিন্তু কোন কথায় কান দেননি মিসেস গারস্টিন। বরং ভীরুতার অপবাদই তিনি দিয়েছিলেন স্বামীকে। তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন মিসেস গারস্টিন। অবশেষে এবারও নতি স্বীকার করেছিলেন বারনার্ড।

ঠিকই আশংকা করেছিলেন বারনার্ড, পশার তিনি করতে পারেন নি। খুব কম ত্রীফই আসছিল তাঁর হাতে, অসাফল্যের নৈরাশ্য মনেই গোপন রইলো তাঁর, স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগও প্রকাশ পেলো না কখনো। স্বভাবতই বাড়িতে কথা কইতেন কম—আরো যেন নির্বাক হয়ে গেলেন তিনি দিনে দিনে। কিন্তু এটাই আশ্চর্য, পরিবারের কারো নজরে এলো না তাঁর এ পরিবর্তন। টাকা উপার্জনের একটা যন্ত্র মাত্র, এই ছিল তাঁর পরিচয় নিজের মেয়েদের কাছে। তাদের খাওয়া-পরা আর আমোদ-প্রমোদের যোগান দিতে কুকুরের জীবন যাপন করাই তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁরই দোষে সেই প্রাচুর্য যখন কমে আসলো, স্বভাবতই তাদের ব্যবহারও যেন আরো কঠোর হয়ে দেখা দিলো। এই ক্ষুদ্র মানুষটির অন্তরে যে বেদনার কী জ্বালা গুমড়ে মরছিল কেউই খোঁজ নিলো না তার—নীরবে উদয়াস্ত খেটেই গেলেন তিনি। তাদের কাছে তিনি অপরিচিত। তবে এ বোধ ছিল তাদের, তিনি যখন পিতা, তাদের ভালোবাসা তাঁর কর্তব্য।

কিন্তু মিসেস গারস্টিনের চরিত্রের একটা বড় গুণ তাঁর অদম্য মনোবল। তাঁর পরিচয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুর ভেতর কাউকেও বুঝতে দেননি কখনো তাঁর আশাভংগের দুঃখটুকু। জীবন যাত্রার ধারা কোন দিক দিয়েই কোন পরিবর্তন করেন নি মিসেস গারস্টিন। নিজের সুষ্ঠু পরিচালনায় আগেরই মতো ডিনার পার্টি চলছিল তাঁর নিজেরই বাড়িতে। সামাজিকতা আর পরিবেশ রক্ষার মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অম্লান রেখেছিলেন তিনি। সব রকম বিষয়-বস্তুর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন বলেই গল্প-গুজবের আসরে তাঁর প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারতো না।

তাই ব্যক্তিগত জীবনে অসাফল্য সত্ত্বেও সামাজিক জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রইলো।

তবু হাইকোর্টের জজ হবার সম্ভাবনা স্বপ্ন হলেও বারনার্ড গারস্টিন একদিন কাউন্টি কোর্টের অথবা কোন কলোনির বিচারালয়ে আসন পাবেন এইটুকু ক্ষীণ আশা ছিল মিসেস গারস্টিনের মনে। তাই ওয়েলসের কোন সহরের রেকর্ডার নিযুক্ত হওয়ার সংবাদে অনেকটা আশান্বিত হয়েছিলেন। মিসেস গারস্টিনের শেষ ভরসা মেয়েরা। এদের মনমতো বিয়ের ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে নিজের ব্যর্থ জীবন কতকটা সার্থকতা পাবে এই আকাংক্ষাই তাঁর মনকে জুড়ে রইলো তখন। তাঁর দুই মেয়ে, কিটী আর ডরিস। ডরিসকে সুন্দরী বলা চলে না। নাকটা ভীষণ লম্বা, শরীরের গড়নও বেশ স্থূল। ভালো উপার্জনশীল কোন যুবকের সংগে ওর বিয়ে দেবেন ডরিস সম্বন্ধে মিসেস গারস্টিনের এইটুকুই আশা। এর বেশি তিনি চাননি।

কিন্তু কিটী সত্যিই সুন্দরী—ছেলেবেলা থেকেই। বড় বড় ঘনকৃষ্ণ ড্যাব-ড্যাবে চোখ ওর। মাথার চুল কোঁকড়া বাদামি রঙ, একটু যেন লালচে আভা, সুন্দর ছোট ছোট দুপাটি দাঁত, মাখনের মতো নরম গায়ের চামড়া। চেহারার দোষ—চোয়াল দুটি চওড়া আর নাক ডরিসের মতো লম্বা না হলেও বড় বেশি মোটা। তারুণ্যের দীপ্তিটুকুই ওর সৌন্দর্য, আর সেই জন্যই ওকে কাঁচা বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার মিসেস গারস্টিন বুঝতে পেয়েছিলেন। তাকালেই কেমন চোখ ঝলসে দেয়, ওর চামড়ার রঙ এমনি উজ্জ্বল। ওর টানা-টানা জ্বলজ্বলে চোখের দিকে একবার তাকালেই যেন বুকের ভেতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠে—মন মাতিয়ে দেয়। চলার ঢঙ চমৎকার। মিসেস গারস্টিন তাঁর সবটুকু স্নেহ ওর উপরেই উজার করে দিয়েছিলেন—একে নিয়েই অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখতেন তিনি কল্পনায়। শুধু একটা ভালো

বিয়ের ব্যবস্থাই নয়, এর চেয়েও আরো কিছু করাই ছিল মনের একান্ত আকাংক্ষা।

অপরূপ রূপসী সে এই ধারণা নিয়েই গড়ে উঠেছিল কিটী এবং মার মনের যে কী আকাংক্ষা তারও পরিচয় পেয়েছিল সে। তার নিজের মনেও ছিল সেই একই কামনা। উপযুক্ত ছেলেদের সংগে যোগাযোগ করিয়ে দেবার মানসে অনেক নাচের পার্টিতে উপস্থিত থাকতেন মিসেস গারস্টিন মেয়েকে নিয়ে। সার্থক হয়েছিল তাঁর চেষ্টা। অল্পদিনের ভেতরই অনেক স্তাবক এলো কিটীকে ঘিরে। কিন্তু কেউ মনমতো হোল না, তাই কারো কাছে ধরা দিলো না কিটী। সাউথ কেনসিংটনের বাড়ির ড্রয়িং-রুমে প্রতি রবিবার অনেকেরই আনাগোনা হতে লাগলো। কিন্তু মিসেস গারস্টিন দেখে খুশি হলেন এদের কাছ থেকে মেয়েকে বাঁচাবার জন্য কোন সাবধানতার প্রয়োজন হোল না, মেয়েরাই সব গুছিয়ে নিয়েছে। কিটী এদের সবাইকে খেলিয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু যখনই প্রস্তাব করেছে ওর কাছে প্রত্যেককেই প্রত্যাখ্যান করেছে সুন্দরভাবে।

এমনি করে কেটে গেল অনেক দিন। কিটীর উপযুক্ত কাউকেই পাওয়া-গেল না তখনো। বয়স তার তেমন কিছু হয়নি —আরো অপেক্ষা করা যেতে পারে। বন্ধুদের কাছে মিসেস গারস্টিন বলে বেড়ালেন—একুশ বছর বয়স হবার আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই তাঁর কাছে। কিন্তু পর পর তিন চার বছর কেটে গেল এমনি। পুরনো স্তাবকদের কেউ কেউ আবার এলো নূতন করে প্রস্তাব নিয়ে, কিন্তু এদের সবাই তখনো কপর্দকহীন। কিটীর চেয়ে বয়সে ছোট দু একটি ছেলেও এলো সে সময়। একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সিভিলিয়ান—(কে-সি-আই-ই) বিয়ে করতে চেয়েছিল কিটীকে—ভদ্রলোকের বয়স তখন তেপান্ন। কিটী তখনো ঘুরে বেড়ায় নাচের পার্টিতে।

সে যায় উইম্বলডনে, লর্ডসে, এ্যাসকট, হেনলি আরো কত জায়গায়। জীবনটাকে উপভোগ করবার নেশায় ছুটে বেড়ায় কিটী। কিন্তু তখনো অর্থশালী প্রতিপত্তিশালী কেউ আসেনা তার পাণি-প্রার্থী হয়ে। মিসেস গারস্টিন অধীর হয়ে উঠেছিলেন ততদিনে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বেশি বয়সের লোকের দিকেই যেন ঝুঁকছিল কিটী একটু বেশি। মেয়েকে মনে করিয়ে দিলেন বয়েস বাড়বার সংগে সংগে রূপও তার কমে আসবে অথচ কম বয়সের রূপসী মেয়ের অভাব হবে না দিনে দিনে। তিনি এও মনে করিয়ে দিলেন সময় গেলে আর ফিরে পাবে না।

ভ্রূক্ষেপ করেনি কিটী। তার রূপ তখনো অটুট আছে, আরো বেড়েছে এই তার ধারণা। রূপের জৌলুস কিসে বাড়ে সে বিদ্যাও সে আয়ত্ব করেছে এতদিনে। কী করে সাজতে হয় সেও শিখেছে কিটী। শুধু বিয়ের জন্যই যদি বিয়ে করতে হয় কত ছেলে এসে লুটিয়ে পড়বে তার পায়ের তলায়। কিন্তু কিটী তা চায়নি। ভয় কী, উপযুক্ত কেউ না কেউ আসবেই—দুদিন আগে আর পরে। কিন্তু মিসেস গারস্টিন অন্যদিক থেকে বিচার করলেন। মেয়ের এমনি অপচয়ে বিষিয়ে উঠলো তাঁর মন, অধৈর্য হয়ে উঠলেন তিনি। দৃষ্টি আরো খাটো করলেন মিসেস গারস্টিন! যাদের দিকে ঘৃণায়ও তাকাতেন না কোনদিন সেই সব উকিল বা ব্যবসায়ীদের ভেতর থেকে কাউকে বেছে নিতে মনস্থির করলেন তিনি।

পঁচিশ বছর বয়সেও অবিবাহিত রয়ে গেল কিটী। বিরক্ত হয়ে উঠলেন মিসেস গারস্টিন, মনের অসন্তুষ্টিভাব মেয়ের কাছে প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধা করলেন না তিনি। আর কত কাল পিতা ভরণ-পোষণ করবেন তাদের। মেয়েকে সুযোগ দেবার জন্য সাধ্যাতীত খরচ করেছেন তাঁরা, সে সুযোগ মেয়ে নিতে পারলো কই! আর কীই-বা করার আছে তাঁদের। কিন্তু এই

কথাটা মিসেস গারস্টিন বুঝতে পারেন নি যে, তাঁরই কঠোর আর নিষ্প্রাণ ব্যবহারের জন্যই বড় লোকের ছেলেরা দূরে সরে গিয়েছে, অথচ সকল দোষের বোঝা তিনি চাপিয়ে দিলেন মেয়ের মাথায়। এরপর সুরু হোল ডরিসের পালা। তার লম্বা নাক, কুৎসিৎ গড়ন তবু অল্প দিনের ভেতরই জিওফ্রে ডেনিসনের সঙ্গে ওর এনগেজ-মেণ্ট হয়ে গেল। এক বিত্তশালী সার্জেনের ছেলে। যুদ্ধের সময় ব্যারণ হয়েছিলেন তার বাবা। জিওফ্রে পিতার টাইটেলের উত্তরাধিকারী! মেডিকেল ব্যারণ এমন কিছু লোভনীয় মর্যাদা নয় তবু মন্দের ভালো! তাছাড়া অর্থের তো অভাব নেই। আতংকগ্রস্ত কিটী কেমন ঝোঁকের বশেই যেন বিয়ে করে বসলো ওয়ালটার ফেনকে।

খুব অল্পদিনেরই পরিচয়, কখনো বিশেষ নজরেও পড়েনি তার। কখন কী ভাবে তার সংগে পরিচয় খেয়ালই নেই কিটীর। এনগেজমেণ্টের পর ওয়ালটারই তাকে বলেছিল এক নাচের পার্টিতে তার এক বন্ধুর মারফত পরিচয়। কিটী তেমন কিছু আমল দেয়নি সেদিন। আর ওর সংগে নেচে থাকলেও সে তার স্বভাববশেই—যে তাকে আমন্ত্রণ জানায় তারই সংগেই তো নাচে সে। দিন কতক পর অন্য এক নাচের পার্টিতে ওয়ালটার আলাপ করেছিল তার সংগে—কিটী কিন্তু চিনতে পারেনি সেদিন। পরে ওয়ালটার কিটীকে বলেছে আরো অনেক নাচের পার্টিতে দেখা হয়েছে তার সংগে।

—দেখুন, অনেকবার আপনার সংগে নেচেছি, আপনার নামটা কিন্তু আমার জানা হয়নি এখনো।

তার স্বভাবসুলভ চাপল্যের হাসি হেসে বলেছিল কিটী।

শুনে ওয়ালটার অবাক!

—সে কী, আমার নাম জানেন না? আপনার সংগে আমাকে তো পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

—তা হবে, আমার কিন্তু ভারি ভুলো মন। আচ্ছা, আমার নামটাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন না?

হাসলো ওয়ালটার। তার চেহারার কঠিন গাম্ভীর্যের ভেতরও তার হাসিটি বড় মিষ্টি।

—নিশ্চয়ই জানি।

কিছুক্ষণ নীরব।

—আচ্ছা, আপনার কি জানবার কোন কৌতূহল নেই? জিজ্ঞাসা করেছিল ওয়ালটার।

—সব মেয়েদের যেমন থাকে।

·—আমার নামটা জানবাব জন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও কি আপনার ইচ্ছে হয়নি?

বেশ মজা লাগছিল কিটীব। সে অবাকও হচ্ছিল এই ভেবে ওর সম্বন্ধে চিন্তা করবার কথা ওয়ালটাবের মনে আসে কেন! তবু ওকে খুশি কববার ইচ্ছা হোল কিটীর। তার মন-মাতানো হাসি ঠোঁটের কোনে এনে ওয়ালটারের দিকে তাকিয়ে ছিল কিটী। তার সুন্দর চোখ দুটি অরণ্যের মাঝে শিশিব-সিক্ত সরোবরের মতো ঝলমলিয়ে উঠলো। ফিক করে হেসে ফেললো সে।

—বলুন না, আপনার নামটা!

—ওয়ালটার ফেন।

নাচতেও জানে না, পরিচয়ের গণ্ডিও তার অতি সংকীর্ণ, অথচ কেন যে এসব পার্টিতে আসতো ওয়ালটাব এই কথাটাই বুঝতে পারেনি কিটী। মনে হয়েছিল কিটীর, হয়তো তাকে ভালো-বেসেছে ওয়ালটার। পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলে দিলো এ চিন্তা: এমনি অনেক মেয়েই মনে করে পরিচিত সব পুরুষই বুঝি তাদের প্রেমে পড়েছে! কিন্তু কী জানি কেন ওয়ালটারের কথা একটু

বেশি ভাবতে সুরু করেছিল কিটী। অনেকেই প্রেমে পড়েছে তার, কিন্তু ওয়ালটারকে মনে হোল যেন একটু অন্য রকম! অনেকের সংগে খুবই খোলাখুলি মিশেছে কিটী, অনেকে চুমুও খেয়েছে তাকে; কিন্তু ওয়ালটার তো কোনদিন করেনি এমনি। বেশি কথা বলতো না ওয়ালটার। ভালোই লাগতো কিটীর, বিশেষ করে ওর মুখের মিষ্টি হাসিটুকু। কথা বললেও বাজে কথা বলতো না কখনো ওয়ালটার। স্বভাবত ওয়ালটার লাজুক। কিটী জানতে পেরেছিল ওয়ালটার প্রাচ্য দেশে কোথাও থাকে, ছুটিতে দেশে এসেছে।

সে এক রবিবার বিকেল। তাদের সাউথ কেনসিংটনের বাড়িতে ওয়ালটার এসেছিল। অনেক কেউ ছিল তখন বাড়িতে। অনেকক্ষণ নীরবে বসেছিল ওয়ালটার। কেমন অসোয়াস্তি বোধ করেই যেন আপন মনে বেরিয়ে গেল ওয়ালটার। কিটীর মা পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিটীকে—কেন এসেছিল ওয়ালটার।

—বুঝতে পারছি না তো, তুমি ওকে আসতে বলেছিলে নাকি মা?

—হ্যাঁ, ব্যাডেলেদের বাড়িতে ওর সংগে পরিচয়। ও বললো তোর সংগে নাকি অনেক নাচের পার্টিতে দেখা হয়েছে। ওকে বলেছিলাম রবিবার দিন আমি বাড়ি থাকি।

—ওর নাম ফেন। প্রাচ্যে কোথায় যেন কী চাকুরি করে।

—তাই। শুনেছি ও নাকি ডাক্তার। আচ্ছা, ও কি তোকে ভালোবাসে নাকি?

—আমি তার কী জানি।

—কে তোকে ভালোবাসে এদ্দিনে এই কথাটা তুই বুঝতে পারিস নিশ্চয়ই!

—কী জানি। ভালোবাসলেও ওকে আমি বিয়ে করবো না কখনো। বলেছিল কিটী।

কোন উত্তর দেননি মিসেস গারস্টিন। তাঁর নীরবতা অসন্তুষ্টির

মেঘে ভারাক্রান্ত। লজ্জায় রঙিন হয়ে উঠেছিল কিটী। সে জানতো সে কাকে বিয়ে করবে বা না-করবে সে চিন্তা আর মা করে না—কোন রকমে তাঁর হাত থেকে বিদেয় হলেই হোল।

পরের সপ্তাহে পর পর কদিনই নাচের পার্টিতে দেখা হয়েছে ওয়ালটারের সংগে। সলজ্জ ভাবটা যেন একটু কেটেছিল ততদিনে। আলাপ পরিচয় হয়েছিল আরো। সে ডাক্তার, তবে প্রফেশনে ছিল না। ব্যাকটিওলজিষ্ট। (এ সম্বন্ধে অবশ্যি কিটীর খুবই অস্পষ্ট ধারণা) হংকং-এ চাকুরি করে। আসছে শরতে কর্মস্থলে ফিরবে। চীন সম্বন্ধে অনেক কথাই সে বললো। যখনই যে যা বলে মন দিয়ে শোনা কিটীর স্বভাব—তবু হংকং-এর কথা যেন বিশেষ করে ভালো লেগেছিল কিটীর। সবই তো আছে সেখানে, ক্লাব আছে, টেনিশ আছে; রেস, পলো, গলফ, কোনটারই অভাব নেই।

— আচ্ছা, ওখানে সবাই নাচে?

—হ্যাঁ, নাচে বইকি।

কিটীর মনে হয়েছে, এ কথাগুলো ওয়ালটার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছে কিনা কে জানে। মনে হয় কিটীর সংগ ভালো লাগতো ওয়ালটারের। কিন্তু তার হাতের একটু স্পর্শে, চোখের চাউনিতে বা কথায় এমন একটু ইংগিতও দেয়নি কখনো, যা থেকে মনে করা যায় নাচের পার্টিতে দেখা একটী মেয়ে ছাড়া কিটী আরো কিছু। পরের রবিবারেও তাদের বাড়িতে এসেছে ওয়ালটার। কিটীর বাবা সেদিন বাড়িতে। বৃষ্টিতে গলফের মাঠে বের হতে পারেন নি। অনেক আলাপ হোল দুজনে। চলে যাবার পর কী আলাপ হয়েছে ওয়ালটারের সংগে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিটী।

—হংকং-এ চাকুরি করে। ওখানকার চীফ-জস্টিস আমার 'বার'এর বিশেষ বন্ধু। তবে ছেলেটাকে খুব বুদ্ধিমান মনে হোল আমার। কিটী জানতো তার এবং তার বোনের কল্যাণে যে সব ছেলেরা এ বাড়িতে আসে এদের কাউকেই পছন্দ করতেন না তার বাবা।

—বাবা, আমার বন্ধুদের কাউকেই তো তুমি দেখতে পারো না! বললো কিটী।

তাঁর ক্লান্তদৃষ্টি কিটীর মুখের উপর রেখে বললেন তিনি।

—তুমি একে বিয়ে করবে ঠিক করেছো নাকি?

—না তো!

—ও তোমায় ভালোবাসে?

—কী জানি, কোন লক্ষণ তো দেখিনি!

—কিন্তু ওকে তোমার ভালো লাগে?

—খুব বেশি ভালো লাগে বলে তো মনে হয় না। মাঝে মাঝে বরং বিরক্তি আসে ওর উপর।

কিটীর মনোমত নয় ওয়ালটার। বড় বেঁটে আর রোগা। একটু ঘোলাটে রঙ, পরিষ্কার দাড়ি গোঁফ কামানো—কেমন ছিমছাম গড়ন। চোখ দুটো কালো, কিন্তু বড় নয়, দৃষ্টি স্থির, একটুও চাঞ্চল্য নেই সেখানে। যখন যেদিকে তাকায় গভীর মনোনিবেশ তখন সে দৃষ্টিতে। কেমন যেন একটা কৌতূহল সব সময়—মাধুর্যের অভাব। খাড়া ঋজু নাসিকা, সুন্দর ভ্রূ-যুগল আর সুঠাম মুখের গড়ন—সব মিলে সুশ্রীই বটে ওয়ালটার। কিন্তু আশ্চর্য—সুশ্রী মনে হয় না কিটীর। ওর হাব-ভাবে সব সময়ই একটা বিদ্রূপের প্রকাশ।

ওকে ভালোভাবে জানবার সুযোগের সংগে সংগে ওর সংগটা যেন কেমন অসোয়াস্তিকর মনে হতে লাগলো কিটীর।

অনেক দিনই কেটে গেল—দেখা সাক্ষাতও হয়েছে তাদের অনেকবার। কিন্তু ওয়ালটার তেমনি অনাসক্ত, উদাসীন, তেমনি

অবোধ্যই রয়ে গেল। কিটীর সংগে মিশতে ও ঠিক সংকোচ করতো না, তবে কেমন একটা অপ্রস্তুত জড়সড় ভাব সব সময়। ওয়ালটারের কথাবার্তাও রয়ে গেল তেমনি নৈর্ব্যক্তিক। সত্যি সত্যিই ওয়ালটার তাকে ভালোবাসে না এই ধারণাই বদ্ধমূল হোল কিটীর। কিটীকে ওর ভালো লাগে, কথা বলতে ইচ্ছে করে ওর কিটীর সংগে; কিন্তু আসছে নভেম্বরে চীনে ফিরে যাবার পর আর মনেই থাকবে না কিটীর কথা। কী জানি, হয়তো-বা সেখানকার হাসপাতালের কোন নার্সকেই ভালোবাসে ওয়ালটার, এমনি কথাও ভাবে কিটী, কোনো পাদ্রির মেয়েও হতে পারে। ঐ রকম মেয়েরই তো যোগ্য ওয়ালটার।

তারপর হঠাৎ হয়ে গেল ডেনিসনের সংগে ডরিসের এনগেজমেণ্ট। প্রস্তুত ছিল না কিটী আঠার বছর বয়সেই মনোমত ব্যবস্থা করে নিয়েছে ডরিস, আর পঁচিশ বছর বয়সেও কিছুই করতে পারলো না কিটী। আদৌ যদি বিয়ে না করে কিটী, কেমন হয়? অক্সফোর্ডের একটী ছেলে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকে সে সময়—কিন্তু তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ছেলেকে বিয়ে করে কেমন করে? কেমন যেন গোল পাকিয়ে উঠছে সব। গত বৎসর ঐ বিপত্নীক নাইটকে প্রত্যাখ্যান না করলেই পারতো। মার কথা ভাবতেও ওর ভয় লাগে। আর ডরিস? তারই জন্যে তো ডরিসকে কেউ আমলই দেয় নি এতকাল? এর কি শোধ নেবে না ডরিস এবার? ভেঙে পড়ে কিটীর মন।

সেদিন বিকেলে হেরডদের ওখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল কিটী। ব্রম্পটন রোডে দেখা ওয়ালটার ফেনএর সংগে। পথে দাঁড়িয়ে সে কথা বললো কিটীর সংগে। পার্কের দিকটায় যেতে অনুরোধ জানালো কিটীকে। বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না

কিটীর—বাড়ির পরিবেশ আর লোভনীয় নয় তার কাছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললো তারা, অতি সাধারণ এলো-মেলো কথা। গরমে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করে ওয়ালটার কিটীকে।

—ঐ সময়টা আমরা সচরাচর গ্রামের বাড়িতেই কাটিয়ে থাকি। সারা বছরের খাটুনির পর কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েন বাবা, এ সময়টা তাই একটু নিরিবিলি থাকতেই ভালো লাগে।

মিথ্যে কথা বলে কিটী। সে জানে কোন ক্লান্তি বা অবসাদ-বোধ নেই তার বাবার; আর ছুটি কাটানোর ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসাই-বা করে কে। তবে গ্রামের ঐ পরিবেশে স্বল্প ব্যয়ে দিন কাটে—এইটাই আসল কথা।

—ঐ চেয়ার তুটোয় একটু বসবেন? হঠাৎ বলে ওঠে ওয়ালটার। দৃষ্টি অনুসরণ করে লক্ষ্য করে কিটী অদূরে গাছতলায় তুটি খালি চেয়ার।

—চলুন। বলে কিটী।

বসবার পর আবার যেন কেমন নিস্পৃহ নীরব হয়ে পড়লো ওয়ালটার। অদ্ভুত মানুষ এই ওয়ালটার। কিটী বক-বক করে যেতে লাগলো অনবরত। কিন্তু কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারছিল না কেন ওয়ালটার ডেকে এনেছে তাকে এইখানে। হয়তো হংকং-এর ঐ নার্স টার কথা বলবে তাকে!

আচমকা ওয়ালটার মুখ ফিরে তাকালো কিটীর দিকে ওরই একটা কথার মাঝখানে। বুঝতে পারলো কোন কথাই শোনেনি ওয়ালটার এতক্ষণ। ওর মুখের রঙ খড়ির মতো সাদা।

—আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, মিস গারস্টিন।

ফিরে তাকায় কিটী ওর দিকে।

ওয়ালটারের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা বেদনাকাতর উদ্বেগের জ্বালা। কণ্ঠস্বর চাপা নিচু, কেমন যেন অধীর ভাব। কিন্তু এ

চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ বুঝবার আগেই সে আবার বললো কিটীকে।

—মিস কিটী, আপনি আমায় বিয়ে করবেন?

কিটী প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। সপ্রশ্ন দৃষ্টি!

—কেন, আপনি কি জানেন না আমি আপনাকে ভালোবাসি! বলে ওয়ালটার।

—কই, আপনি তো সে রকম ভাব দেখান নি কোনদিন!

—সত্যি আমি একটু অদ্ভুত! মন যা চায় না—তা বলা আমার কাছে সহজ, কিন্তু মন যা চায় তা যে বলতে পারি না।

বুকের ভেতর কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছিল কিটীর। বিয়ের প্রস্তাব তার কাছে আরো এসেছে অনেকবার, কিন্তু এর আকস্মিকতা যেন অভিভূত করে ফেললো কিটীকে। এমনি ভাবে কেউ তো প্রস্তাব করেনি তার কাছে কোনদিন।

—এ আপনার অসীম দয়া বলবো।

উত্তর দেয় কিটী একটু সংশয় রেখে মনে।

—প্রথম দৃষ্টিতেই আপনাকে ভালোবেসেছিলাম আমি। অনেক-বারই বলতে চেয়েছি, কিন্তু পারি নি।

—কিন্তু এসব কথা এমনি করে বলে? হেসে প্রশ্ন করে কিটী। হাসবার একটু সুযোগ পেয়ে খুশিই হয়েছিল কিটী। ঐ সুন্দর রুপোলি রোদের আবহাওয়াটা কেমন গুমোট হয়ে উঠছিল হঠাৎ। ভ্রূকুটি কাটলো ওয়ালটার।

—তা, আমি কী বলতে চাইছি আপনি বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আশা ছাড়িনি আমি কখনো; কিন্তু এখন আপনিও বাইরে যাচ্ছেন আমিও চলে যাবো হয়তো শিগগিরই—

—আমি আপনার সম্বন্ধে কিন্তু এভাবে কখনো ভাবিনি।

কেমন যেন অসহায় ভাবেই বলে ফেলে কথাটা কিটী।

আর কোন কথা বলেনি ওয়ালটার। মাথা নিচু করে ঘাসের

দিকে দৃষ্টি রেখে বসে রইলো সে। অদ্ভুত মানুষ। তার মুখ থেকে শুনে আজ কিটীর যেন মনে হোল এ রকম ভালোবাসার কথা শোনেনি কোনদিন। কেমন ভয় হোল তার—আবার নিজেকে কেমন উচ্ছ্বসিতও মনে হোল যেন।

—আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।

তবু নীরব রইলো ওয়ালটার। একটুও নড়ে না। তবে কি কথা আদায় করে সে উঠবে এখান থেকে! সে হয় না। অসম্ভব! মাকে বলতে হবে যে! কথাটা বলেই উঠে যাওয়া উচিত ছিল কিটীর। ভেবেছিল কিটী—ওয়ালটার হয়তো একটা কিছু বলবে তাকে, অপেক্ষা করছিল কিটী তাই। কিন্তু এখন, কী জানি কেন নিজেরও উঠতে ইচ্ছা করছিল না কিটীর! ওর দিকে তাকিয়ে ছিল না কিটী—তবু ও তো তার সামনেই! তারই মতো মাথায় উঁচু কাউকে বিয়ে করবে সে ভাবতেও যে পারেনি কোনদিন কিটী। কাছে এলে মনে হয় ওর দেহের গঠন কী সুন্দর, অথচ মুখের কান্তি কেমন পাণ্ডুর! তবু ওরই বুকের উদগ্র কামনা-বহ্নীর পরশ উপলব্ধি করে কিটী।

—আমি আপনাকে চিনি না, কিছুই তো জানি না আপনার।

কম্পিত স্বরে বলে কিটী।

ওয়ালটার তাকায় কিটীর দিকে—কিটীর মনে হয় ঐ দৃষ্টি যেন আকর্ষণ করছে তাকে। দৃষ্টিতে ওর কেমন একটা কমনীয় ভাব, সে তো আগে দেখেনি কখনো এমনটি। কী এক দুর্বার আকর্ষণ ঐ চোখ দুটিতে—বেত্রাহত কুকুরের দৃষ্টিরই মতো।

—পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে আমি হয়তো আরো শোধরাবো, আপনারও জানবার সুযোগ হবে। বলে ওয়ালটার।

—আপনি বড় বেশি লাজুক, কেমন না? বলে কিটী।

এমন অদ্ভুত প্রস্তাব কিটী আর শোনেনি কখনো। এখনো কিন্তু তার মনে হচ্ছিল এ পরিস্থিতিতে বলার মতো শেষ কথাই

বুঝি তারা বলেছে। কিটী ভালোবাসেনি ওয়ালটারকে। অথচ আশ্চর্য, কেন যে এখনো ওকে প্রত্যাখ্যান করতে ইতস্তত করছে! —সত্যি, আমি বড় স্টুপিড। মন চাইছে বলি, পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে ভালোবাসি আমি তোমায়, অথচ বলতে পারি না সে কথা। বলে ওয়ালটার।

আরো অদ্ভুত লাগলো কিটীর। তবু কিটীর মনকে অজান্তে যেন স্পর্শ করে এই কথাগুলো: এই প্রথম তুমি সম্বোধন। অনুভূতিহীন নয় ওয়ালটার, প্রকাশ করতে পারে না স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে। এই উপলব্ধিটাই যেন কিটীব মন এগিয়ে দিলো ওয়ালটারের দিকে—ভালো লাগলো তার ওয়ালটারকে।

নভেম্বরে ডরিসের বিয়ে। ওয়ালটার সে সময় চীনের পথে। কিটী যদি বিয়ে কবে ওকে সেও তো তখন থাকবে সংগে। ডরিসের বিয়েতে ব্রাইডস-মেড হওয়া—কিছুতেই পারবে না কিটী। পালাতে হবে তাকে। ডরিসেব বিয়ের পরও সে থাকবে অবিবাহিতা—এমনি অবস্থাব কথা কল্পনায়ও আনতে পারে না কিটী। সবাই জানে ডরিস বয়সে কত ছোট আর সেই তুলনায় কিটীকে মনে হবে বুড়ি। তার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সেদিন। ওয়ালটারের সংগে তার বিয়ের প্রস্তাব তুলনামূলক বিচারে খুবই গ্রহণযোগ্য নয় সত্যি, তবু তো বিয়ে! চীনে থাকতে পারার সম্ভাবনাটাও ব্যাপারটাকে আরো সহজ করে দিলো কিটীর কাছে। মার মুখের সেই তিক্ত ভাষণ, ব্যবহারের সেই অপ্রিয় প্রকাশ আর যেন সহ্য করতে পারছিল না কিটী। তারপর তার সমবয়সীদের সবারই বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। কাবো কারো সন্তান কোলে এসেছে এর মধ্যে। ওদের সংগে দেখা করতে গিয়ে ওদের ছেলেমেয়েদের মৌখিক আদর করা অসহনীয় ঠেকছিল কিটীর কাছে। এরই ভেতর এলো ওয়ালটার যেন নতুন জীবনের ইংগিত নিয়ে।

কিটী ফিরে তাকায় ওয়ালটারের দিকে—ওর মুখে হাসি। সে হাসিতে যে কী ইংগিত জানে কিটী।

—আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হই, আপনি প্রস্তুত তো ?

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাক-রোধ হয়ে আসছিল ওয়ালটার-এর। রক্তিম হয়ে উঠলো তার ফ্যাকাশে গাল দুটো।

—নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি তৈরি। যত শিগগির সম্ভব। হনি-মুনের জন্য যাবো ইটালিতে আমরা—আগষ্ট আর সেপ্টেম্বর, এ দুমাস থাকবো আমরা বাইরে।

এই সুযোগে মা বাবার সংগে গ্রামে যাবার হাত থেকে রেহাই পাবে কিটী। সংগে সংগে মানস-চক্ষে ভেসে উঠলো 'মর্ণিং পোস্টে' তাদের বিয়ের খবর। মাকে সে ভালোই জানে। এ খবর ফলাও করে প্রকাশ করতে একটুও আটকাবেনা তাঁর। তারপর ডরিসের যখন বিয়ে কিটী তখন বহুদূরে।

নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো কিটী।

—আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে। তবে আপনার মনের মতো হতে আমায় কিন্তু কদিন সময় দেবেন। বলে কিটী।

—তাহলে তুমি স্বীকৃতি দিলে ? বাধা দিয়ে বলে ওয়ালটার—

—হ্যাঁ।

ওয়ালটারের হাত কিটীর মুঠোর ভেতর।

বিয়ের আগে স্বামীকে কতটুকু-বা চিনতে পেরেছিল কিটী, আর আজ বিয়ের পর দুবছর কেটে গেছে—এখনই-বা কতটুকু বেশি বুঝতে পেরেছে সে ওয়ালটারকে। প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল কিটী ওর দয়ায়, নিজেকে উচ্ছ্বসিত করেছিল ওর কামনায়। স্বভাবতই ওয়ালটার বিবেচক, কিটীর সুখ এবং আরামের ব্যবস্থা

করতে সব সময়ই লক্ষ্য থাকতো তার। কিটীর মনের একটুখানি ইচ্ছাও অপূরণ রাখেনি সে। নানারকম উপহার নিয়ে এলো কিটীর জন্য। একটুখানি অসুস্থতায়ও তার চেয়ে চিন্তান্বিত দেখা যায়নি অন্য কাউকে—অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতো ওয়ালটার কিটীর অসুস্থতায়। কিটীর জন্য কিছুমাত্র কষ্ট করতে পারাও সৌভাগ্য বলে মনে করতো ওয়ালটার। শিষ্টাচারের কোন অভাব ছিলনা তার ভেতর। কিটী ঘরে ঢুকবার সময় তার সম্মানে উঠে দাঁড়াতো, গাড়ি থেকে নামবার সময় হাত ধরে সাহায্য করতো কিটীকে, পথে দেখা হলে মাথার টুপি নামিয়ে নিতো সে। কিটী ঘর থেকে বেরোবার সময় নিজ হাতে দোর খুলে এগিয়ে দিতো তাকে। দোরে নক না করে ওর বসার ঘরে বা শোবার ঘরে ঢুকতো না কখনো ওয়ালটার। কিটীর মনে হোত এ যেন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার নয়—সে বুঝি বাড়ির একজন অতিথি মাত্র। লাগতো মন্দ না, কিন্তু কেমন যেন ছেলেমি মনে হোত কখনো। আরো একটু কম কেতাদুরস্ত হলে হয়তো-বা সোয়াস্তি পেতো কিটী। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা নিবিড় হোল না মোটেই—কিটী যেন দূরেই রয়ে গেল স্বামীর কাছ থেকে।

কিন্তু কিটী বুঝতে পারলো না ওয়ালটারের মনের আবেগ। সে বুঝলো না ওর আত্মসংযম নিজের লাজুক স্বভাবের জন্য না অন্য কিছু কারণে। মনের মনিকোঠায় তাই বুঝি পেলো না প্রবেশের অধিকার। তাই তো ওর বাহুবন্ধনে ধরা দেবার সংগে সংগে ওর কামনার নিবৃত্তি বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে কিটীর মনে। ওর মনের বাসনা প্রকাশ করার ভীরুতা কিটীকে বিরূপ করেছে ওর প্রতি। ওর হৃদয়ের কাকুতিকে প্রলাপোক্তি বলে বিদ্রূপ করে আঘাত দিয়েছে কিটী। ওয়ালটারের বাহুবন্ধন নিথর হয়ে গেছে ঐ আঘাতে, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিথিল করে এনেছে তার বন্ধন, নীরবে হয়তো বেরিয়ে গেছে ওয়ালটার নিজের শোবার

ঘরে। বুঝতে পেরেছে কিটি। তাই বলেছে ওয়ালটারকে :
—কী যে বোকা তুমি। আমি কি সত্যি সত্যি তোমার ওসব কথায় কিছু মনে করি নাকি!
একটু ফিকে হাসি শুধু হেসেছে ওয়ালটার।
নিজেকে বিলিয়ে দেবার অক্ষমতা ওয়ালটারের ভেতর আবিষ্কার করেছিল কিটী কিছুদিনের ভেতরই। আত্মসচেতন আর আত্মকেন্দ্রিক ওয়ালটার। কোন পার্টিতে সবাই হয়তো এক সুরে গান ধরেছে, ওয়ালটার কিন্তু যোগ দিতে পারে না এ সবে। সে বসে থাকে নিশ্চুপ, মুখের কোনে একটু হাসি,—এমনি ভাব যেন আনন্দ পাচ্ছে সেও; কিন্তু সে হাসিতে নেই আন্তরিকতা, তাতে নেই স্বতঃস্ফূর্তি, বিদ্রূপের রেশ তার ঐ হাসিতে। একটু সিনিক। মনে হবে ও বুঝি ভাবছে—ঐ তো সব একদল নির্বোধ কেমন নিজেদের আনন্দে মত্ত। কিটীর আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের ভেতর পারে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে ওয়ালটার। চীনে আসবার সময় জাহাজে সবাই পরেছে ফ্যান্সি ড্রেস—ওয়ালটার পরেনি কিছুতেই। তার ঐ নিস্পৃহ আত্মসমাহিত ভাব কিটীকেও বঞ্চিত করেছে আনন্দ থেকে। কিটীও পারেনি অংশ গ্রহণ করতে। কিটী প্রাণ চঞ্চল্। ক্লান্তি নেই তার অবিরাম কথায়, হাসতে পারে সে প্রাণ-খোলা হাসি। ওয়ালটারেব নীরবতা শুধু পীড়াই দেয় কিটীকে। সব মন্তব্যের উত্তর না দেওয়া ওয়ালটারের স্বভাব! কিন্তু বিরক্তি আসে কিটীর। কিটীর যুক্তি, প্রয়োজনের তাগিদেই শুধু কথা নয়। এমনি নির্বাক থাকলে মানুষ যে একদিন হারিয়ে ফেলবে কথা বলবার শক্তি।
চারিত্রিক মাধুর্যের অভাবের জন্যই লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি ওয়ালটার এই হংকং এসে। কিটী বুঝেছিল কথাটা খুব অল্পদিনের ভেতরই। ওয়ালটারের কাজকর্ম সম্বন্ধেও কোন ঔৎসুক্য দেখায়নি কিটী। তবে ব্যাকট্রিওলজিস্টের যে কোন

পদগৌরব নেই হংকংএর ইংগ-সমাজে, এই কথাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল কিটী খুব সহজেই। ওয়ালটারও তার জীবনের এই দিকটা অপ্রকাশিত রেখেছিল কিটীর কাছে। গোড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছে কিটী, কিন্তু ওয়ালটার আমল দেয়নি—শুধু এড়িয়েই গেছে তাকে।

—জেনে কী লাভ বলো, জিনিসটা খুবই নিরস! পয়সাও নেই এতে। সে বলেছে কিটীকে।

খুবই চাপা ওয়ালটার। তার জীবনের পূর্ব ইতিহাস, জন্ম, শিক্ষা সব কিছুই জেনেছে কিটী তাকে সোজা প্রশ্ন করে। নিজে থেকে বলেনি কিছু ওয়ালটার, বিরক্তি বোধ করতো সে। তাই যখনই আগ্রহ দেখিয়ে প্রশ্ন করেছে কিটী সংক্ষিপ্ত উত্তরে এড়িয়ে গেছে ওয়ালটার। এই যে এড়িয়ে যাওয়া, গোপন করার ইচ্ছে থেকে নয় বুঝতে পারতো কিটী। এর কারণ তার স্বভাবজাত গোপনতা প্রীতি। আত্মকথা পছন্দ করে না ওয়ালটার, অসোয়াস্তি বোধ করে সে। সে জানে না, সে চায় না নিজেকে প্রকাশ করতে। বই পড়তে ভালোবাসে ওয়ালটার, কিটীর মনে হয় ওসব নিরস। বিজ্ঞান আলোচনায় ব্যস্ত না থাকলে ওয়ালটার পড়তো চীনের ইতিহাস বা অমনি কোন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু। বিশ্রাম সে জানতো না। তবে খেলাধুলোয় সখ ছিল তার—টেনিস আর ব্রীজ তার প্রিয় গেম।

তাই মাঝে মাঝে অবাক লাগতো কিটীর কেন তাকে ভালোবেসেছিল এই আপনভোলা মানুষটা। এই অতি-সংযমী, প্রাণহীন, আত্মসমাহিত লোকটার কাছে নিজেকে যতটুকু অযোগ্য মনে হোত কিটীর, তেমন আর কারো কথা কল্পনায়ও আসতো না তার। তবু এটা ধ্রুব সত্য যে তার স্বামী গভীরভাবে ভালোবাসে তাকে। তাকে সন্তুষ্ট করতে দুনিয়ায় সব কিছু করতে প্রস্তুত সে; কিটীর হাতে ওয়ালটার যেন একটা মোমের ডেলার মতো।

তার পরিচিত লোকদের প্রতি ওয়ালটারের প্রীতি দুর্বলতার একটা মুখোশ বলেই মাঝে মাঝে মনে হোত কিটীর। কিটীর ধারণা ওয়ালটার খুবই চতুর। এ ধারণা ছিল আরো অনেকেরই। ওয়ালটারের উদাসীন ব্যবহার নির্লিপ্ততা বাড়িয়ে দিলো কিটীরও মনে।

চার্লস টাউনসেণ্ডের সংগে কিটীর প্রথম পরিচয় হংকং-এ কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর, তাদেরই বাড়িতে এক ডিনার পার্টিতে। মিসেস টাউনসেণ্ডের সংগে অনেক টি-পার্টিতে দেখা হয়েছে এর আগেই। চার্লস টাউনসেণ্ড কলোনির এ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি। মিসেস টাউনসেণ্ডের ব্যবহারে লক্ষ্য করলেও পদাধিকার বলে চার্লস টাউনসেণ্ড তাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবে এটা হতে দেবে না মনে রেখেই কিটী প্রস্তুত হয়ে এসেছিল সেদিন ওদের পার্টিতে। তাদের রিসিভ করেছিল একটা বড় হলঘরে। হংকং-এর অন্য সব বাড়ির ড্রয়িংরুমের মতোই এ ঘরটিও প্রয়োজনীয় আসবাবে সজ্জিত। পার্টিটা একটু বড় রকমেরই ছিল সেদিন। তারাই সবার শেষে এসে পৌঁছলো। প্রবেশ করার সংগে সংগেই উর্দিপরা দেশীয় ভৃত্য ককটেল আর অলিভ দিয়ে গেল তাদের। পরে মিসেস টাউনসেণ্ড সমাদর করে নিয়ে গেল তাদের।

কিটী দেখলো একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

—ইনি আমার স্বামী। পরিচয় করে দেয় মিসেস টাউনসেণ্ড।

—আজকের পার্টিতে আপনার পাশে বসার সৌভাগ্য কিন্তু আমারই। বলে টাউনসেণ্ড।

সহজ হয়ে গেল কিটী একটি কথায়। কোথায় যেন উবে গেল

তার মনের সেই বৈরীভাব। চার্লির সহাস্য দৃষ্টির ভেতর কিটী লক্ষ্য করলো চঞ্চল বিস্ময় আর আমন্ত্রণ। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলো কিটী, হেসে জবাব দিতে ইচ্ছা হোল তার।

—আজকের ডিনারটাই কিন্তু মাটি হয়ে গেল ডরোথি। বলে চার্লি।

—কেন ?

—আমাকে বলা উচিত ছিল। আমি তো কিছুই জানি না।

—কী জানো না ?

—কই, কেউ তো আমায় কিছু বলোনি। এমন এক অনিন্দ্য রূপসীর সংগে পরিচয় হবে জানলে প্রস্তুত থাকতে পারতাম।

—কিন্তু প্রস্তুত হবার বা বলার কী আছে এতে ?

—কিছুই না! থাক গে, যা বলার আমিই বলছি।

ভাবছিল কিটী, কী জানি বলেছে মিসেস টাউনসেণ্ড স্বামীকে তার সম্বন্ধে। চার্লি নিশ্চয়ই জানতে চেয়েছিল তার কথা! সহাস্য সপ্রশংস দৃষ্টি কিটীর সর্বাংগে বুলিয়ে নিলো টাউনসেণ্ড। মনে পড়লো তার।

ডাঃ ফেনের স্ত্রীর সংগে পরিচয় হবার কথা স্ত্রীর কাছেই শুনেছিল টাউনসেণ্ড। সেদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল স্ত্রীকে।

—মিসেস ফেন দেখতে কেমন ?

—সত্যি, অপূর্ব সুন্দরী! অভিনেত্রীর মতো চেহারা।

—স্টেজে নামে নাকি !

—বোধ হয় না! ওর বাবা একজন, কী জানি, ডাক্তার, উকিল বা ঐরকম একটা কিছু—ঠিক মনে নেই। ওদের একদিন ডিনারে ডাকলে হয় না!

—তাড়া কিসের, ডাকলেই হবে।

কলোনিতে আসার পর থেকেই ওয়ালটারকে চেনে, চার্লি এই কথাটা বলেছিল কিটীকে খাবার টেবিলে।

—আমরা এক সংগে অনেকবার ব্রীজ খেলেছি। ক্লাবে ওঁর মতো ব্রীজ খেলোয়াড় আর দ্বিতীয় নেই কেউ।

কথাটা ফেরবার পথে ওয়ালটারকে বলেছিল কিটী।

—এ একটা এমন কিছু বড় কথা নয়!

—আচ্ছা, মিঃ টাউনসেণ্ড কেমন খেলেন?

—খারাপ বলবো না। তবে তাস ভালো থাকলে বেশ খেলে, আর হাতের তাস খারাপ এলেই সব গুলিয়ে যায় ওর!

—তোমার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় নিশ্চয়ই!

—নিজের খেলা সম্বন্ধে তেমন কিছু উঁচু ধারণা নেই আমার। দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন বলে পরিচয় দিতে পারি নিজেকে। টাউনসেণ্ডের ধারণা সে একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। কিন্তু তা সে নয়।

—তুমি এঁকে খুব পছন্দ করো না, না?

—পছন্দও করিনা আবার অপছন্দও নেই। আমার ধারণা নিজের কাজটুকু ভালোভাবেই গুছিয়ে নিতে পারে টাউনসেণ্ড। আর সবাই তাকে ভালো স্পোর্টসম্যান বলেই তো জানে। আমার কোনই আগ্রহ নেই ওর সম্বন্ধে।

কিটীর বড় রাগ হয় ওয়ালটারের উপর। ভেবে পায় না সব কিছুতেই এমনি সাবধানতার কী প্রয়োজন? কাউকে হয় পছন্দ হবে নয় হবে না। বলতে দোষ কী? তবে চার্ল্স টাউনসেণ্ডকে ভালো লেগেছে কিটীর। পরিচয় হবার আগে এতটা ভাবতে পারেনি কিটী।

মনে হোল কিটীর, কলোনিতে খুবই পপুলার চার্ল্স। সেক্রেটারি অবসর নেবার পর টাউনসেণ্ডই সেক্রেটারি হবে এই সবার ধারণা। সে টেনিস খেলতো, গলফের মাঠেও যাতায়াত ছিল তার। রেসের ঘোড়াও ছিল। কারো উপকার করতে পিছপাও ছিল না কখনো। 'লাল ফিতার' আঁটুনি ছিল না তার কাজে।

কোন চাতুরি জানে না টাউনসেণ্ড। গোড়াতে এর কোন সুবাদই সহ্য করতে পারেনি কিটী। ওর সবই ভণ্ডামি এই ধারণাটাই পোষণ করছিল কিটী এতাবদ। কিন্তু কিটী বুঝতে পারলো তার ভুল।

বেশ উপভোগ করেছিল কিটী সেই সন্ধেটা। লণ্ডনের থিয়েটার, অ্যাসকট আর কাউএস-এর গল্প, এমনি কত কী কথা হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়। ডিনারের পর সবাই এসে বসলো আবার ড্রয়িংরুমে, টাউনসেণ্ড তখনো কিটীর পাশে। অনেক হালকা কথায় হাসিয়েছিল কিটীকে। ওর কথা বলার ধরনের জন্য বোধ হয় খুব আমোদ লেগেছিল কিটীর। ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মমতার সুর, ওর নীল চোখের চাউনিতে সস্নেহ আবেদন। আপন করে নেবার ঐ বুঝি সংকেত। লোককে মুগ্ধ করার অদ্ভুত শক্তি ওর স্বভাবে— লোকপ্রিয়তার এটাই গোড়ার কথা।

পুরো ছ-ফিট দু-ইঞ্চি ওর দৈর্ঘ্য। চমৎকার ঋজু দৈহিক গড়ন, একটুও মেদবাহুল্য নেই কোথাও। পোশাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য অদ্ভুত। সেদিনকার পার্টিতে আর কাউকেই দেখা যায়নি এমনি। পুরুষের এমনি স্মার্ট ভাবটাই পছন্দ করতো কিটী। স্বতই কিটীর দৃষ্টি পড়েছিল ওয়ালটারের উপর, কী আকাশ পাতাল প্রভেদ! টাউনসেণ্ডের কাফ-লিংকস আর ওয়েস্টকোটের বোতামগুলোও নজর এড়ায়নি কিটির।

চার্লসের মুখের রঙ কেমন একটু রোদে পোড়া তামাটে। তবু গালের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আভাটুকু বর্তমান। সুন্দর কোকড়ানো ছোট্ট-গোঁফের একটা রেখা ভালো লেগেছিল কিটীর। তারই ফাঁকে প্রকাশ তার রক্তিম ঠোঁট দুটো। মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুল, ছোট ছোট সুন্দর বিন্যস্ত। কিন্তু মোটা ভ্রূ-যুগলের আশ্রয়ে আয়ত চোখ-দুটোই ওর বৈশিষ্ট্য। নীলাভ চোখের মমতা মাখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবাইকে। এমনি নীল আয়ত চোখের চাউনি যার সে

পারে না কখনো কাউকে আঘাত করতে—এই তো ধারণা কিটীর। টাউনসেণ্ডের ভালো লেগেছিল কিটীকে, বুঝতে পেরেছিল কিটী। ওর চোখের সপ্রশংস দৃষ্টি নিজের মনকে কোন মতেই গোপন করতে পারেনি কিটীর কাছ থেকে। কিটী ওর মনের পরিচয় পেয়েছিল ওর চাউনিতেই। ঐটুকু মনের পরশই রাঙিয়ে দিয়েছিল সেদিনকার সন্ধেটা। আত্মচেতনা ছিল না তার, তাই বুঝি স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছিল কিটী সেই পরিবেশে।

বিদায়কালীন করমর্দন করতে মৃদু চাপ দিয়েছিল টাউনসেণ্ড কিটীর হাতে। কিটী বুঝলো সেই ইংগিত।

—আপনার সংগে নিশ্চয়ই দেখা হবে আবার শিগগির। বলেছিল টাউনসেণ্ড।

ওর চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছিল কিটী।

—হংকং সহরটা কিন্তু তেমন কিছু বড় নয়, কী বলেন ?

কিটী শুধু এইটুকুই বলেছিল চার্লিকে।

কিন্তু কে ভেবেছিল মাত্র তিন মাসের পরিচয়ই গড়ে তুলবে তাদের ভেতর এমনি একটা সম্পর্ক ! পরিচয়ের প্রথম দিনেই টাউনসেণ্ড পাগল হয়ে গিয়েছিল কিটীর জন্যে। কিটীও জানতো সেই কথা। বলেছিল টাউনসেণ্ড, এমনি সুন্দরী মেয়ে সে আর দেখেনি একটিও। সেদিনকার পোশাকের খুঁটি-নাটিও মনে ছিল তার। পাহাড়ের উপত্যকার গায়ে প্রস্ফুটিত লিলি ফুলের মতোই নাকি মনে হয়েছিল কিটীকে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতে।

মুখে প্রকাশ না করলেও চার্লির মনের ঐ দুর্বার আকাংক্ষা বুঝতে পেরেছিল কিটী। তাই একটু ভয়ে ভয়েই দূরে-দূরে রেখেছিল চার্লিকে অনেকদিন। ওর মনের ঐটুকু আগুনের পরিচয় পেয়েই

ভয়ে কখনো চুমু খেতে দেয়নি কিটী। শিউরে উঠতো কিটী। ওর নিবিড় বাহুবন্ধনের কথা কল্পনায় আনতেও যেন বুকের ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠতো কিটীর।

ভালোবাসেনি কিটী এর আগে। প্রেমের এই প্রথম অনুভূতি বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয় তাকে। ভালোবাসার সোনার কাঠির পরশে সহানুভূতি জাগে ওয়ালটারের জন্য। সেও তো ভালবেসেছিল তাকে এমনি। খেলাচ্ছলে কতবার বিরক্ত করেছে কিটী ওয়ালটারকে, কৌতুক করেছে তার সংগে, কিন্তু বিরক্ত হয়নি ওয়ালটার কোনদিন। তার সকল বিদ্রূপ আর কৌতুক সহজমনেই হজম করেছে ওয়ালটার। বিস্ময়ে অবাক হয়েছে কিন্তু অসন্তুষ্ট হয়নি। মনে হয়েছে কিটীর, হয়তো ফিরে আসবে ওয়ালটার স্বাভাবিক অবস্থায়। লালসার আমেজ পেয়েছে কিটী, সেই আমেজে কেমন এক হালকা সুরের স্পন্দন জেগেছে তার মনে। তাই ওয়ালটারের সংগে তার সম্পর্ক মিথ্যে হয়ে গেল, যেদিন জানলো কিটী চার্লি তার প্রেমিক। সহানুভূতি রইলো না আর একটুও, দয়াহীন নির্মম বিদ্রূপই রইলো অবশিষ্ট ওর জন্যে। তবু তার মন অস্বীকার করেনি কোনদিন যে ওয়ালটারের জন্যই পেয়েছে সে চার্লিকে।

তবুও চার্লির কাছে আত্মসমর্পন করার আগে অনেকবার ইতস্তত করেছে কিটী। এই ইতস্তত-ভাব চার্লির লালসার কাছে আত্মবিসর্জনের অনিচ্ছা থেকে নয়, কেননা লালসার আগুণ তার বুকেও জ্বলছিল তেমনি দুর্বার। সে ইতস্তত করেছে তার জন্মগত সংস্কার বশে, যে সংস্কার বাধা দিয়েছে তাকে। চার্লির কামবহ্নিতে তার প্রথম আত্মাহুতি একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র—কেননা পরস্পরকে সম্ভোগ করার সুযোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই তারা বুঝতে পেরেছিল সেই সুযোগের কথা। কিন্তু এর পর অনুভূতির কোনো ব্যতিক্রম তো বুঝতে পারলো না কিটী—কামনার নিবৃত্তির

পর কই কোন পরিতৃপ্তি তো এলো না অনুভূতিতে! বিস্মিত হয়েছিল কিটী। আশা ছিল এই পাওয়ার পর আসবে একটা বিপুল পরিবর্তন, হয়তো জাগবে অভূতপূর্ব এক অনুভূতির স্পন্দন; তাই আরশিতে নিজের প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল কিটী—কই, সে তো তুদিন আগে ছিল যা, তাই তো রয়ে গেল, সেই একই নারী। কোন পরিবর্তনই তো এলো না তার ভেতর!

—তুমি রাগ করলে আমার উপর? জিজ্ঞাসা করেছিল চার্লি।

—না, ভালোবাসি আমি তোমায়। ফিস ফিস করে জবার দিয়েছিল কিটী!

—এমনি এতটা সময় নষ্ট করেছো বলে তোমার বোধ হয় খুব খারাপ লাগছে না?

—যাঃ। কী বোকা তুমি!

তার খুশি মনের অসহনীয় পরিতৃপ্তিই যেন বাড়িয়ে দিলো কিটীর রূপের জৌলুস। ·বিয়ের ঠিক আগে, যৌবনের প্রথম জোয়ার কেটে যাওয়ার সংগে সংগে, কেমন ক্লান্ত নিঃশেষিত মনে হয়েছিল নিজেকে। অনেকেই বলেছে সব ফুরিয়ে গেছে কিটীর। কিন্তু স্বীকার করে সে, পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ে আর সেই বয়সেরই বিবাহিতা নারীর ভেতর পার্থক্য অনেক। সে যেন ছিল পীত-হয়ে-আসা গোলাপের একটা ছোট্ট কুঁড়ি, হঠাৎ যেন পূর্ণ বিকসিত হয়ে উঠেছে আজ সেই কুঁড়ি। আরো যেন সবাক হয়ে উঠেছে তার তরল চোখের দৃষ্টি। গায়ের চামড়া (যেটা খুবই গর্বের বস্তু ছিল তার কাছে) উজ্জ্বলতর হয়েছে আরো; ফুল বা পীচ ফলের সংগে তুলনা চলে না আর; ওরাই বুঝি উপমা খুঁজে

তার ভেতর। আবার যেন অষ্টাদশী হোল কিটী। যেন উপছে পড়ছে তার রূপ। তার এমনি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে অনেকেই। মেয়ে বন্ধুরা ইংগিত করেছে সন্তান-সম্ভবা কিটী। যারা বলতো কীই-বা সুন্দরী কিটী,তারাও স্বীকার করেছে তাদের ভুল। প্রথম দিন ঠিকই বলেছিল চার্লি—কিটীর রূপ আগ্নেয়-রূপ বহ্নিমান।

নির্বিঘ্নে চলছিল তাদের অভিসার। শুধু কিটীর কথা ভেবেই কোন বিপদের ঝক্কি নিতে চায়নি চার্লি। তাই নিভৃত মেলামেশা সম্ভব হোত না সব সময়। কখনো কিউরিও দোকানে, কখনো-বা লাঞ্চের পর কিটীর বাড়িতে দেখা করতো চার্লি কিটীর সংগে। তবে কিটী সুযোগ পেয়েছে অনেকবার। সবার ভেতর হাসি কৌতুকের মাঝে কেই-বা ভাবতে পেরেছে একটু আগেও কিটী কাটিয়ে এসেছে ওরই বাহুবন্ধনে।

কিটীকে মুগ্ধ করেছিল চার্লি। পলোর মাঠে সাদা ব্রীচেস আর টপ-বুটে বড় সুন্দর লাগতো দেখতে চার্লিকে। টেনিসের পোশাকে ওকে মনে হোত যেন ছোট্ট একটি বালক। নিজের শরীরের গর্ব ছিল চার্লির। এমনি দৈহিক গঠন আর চোখে পড়েনি কিটীর কখনো। যত্ন করতো চার্লি একে রক্ষা করার জন্য। চার্লি প্রতিষ্ঠাবান এথলেট। স্থানীয় টেনিসে চাম্পিয়ানশিপ পেয়েছে চার্লি। অনেকের সংগেই নেচেছে কিটী কিন্তু চার্লির মতো এমনি জুটি পায়নি সে কখনো। বিশ্বাস হয় না চার্লির বয়স চল্লিশ। বিশ্বাস করেনি কিটীও। সে বলেছিল চার্লিকে ঃ

—সত্যি, এ কিন্তু তোমার সব ফাঁকি। তোমার বয়স পঁচিশের বেশি কিছুতেই না।

শুধু হেসেছিল চার্লি। ভালোই লেগেছিল শুনতে।

—কী যে বলো। জানো আমার ছেলে আছে, তারই বয়স পনেরো। এই তো প্রৌঢ়ত্বে এসে পা দিয়েছি আমি। কয়েক বছরের ভেতরই বুড়োদের দলে ভিড়ে যেতে হবে আর কি!

—একশ বছরেও কোন পরিবর্তন আসবে না তোমার, বলে রাখছি আমি। তখনো ভালো লাগবে তোমায়।
বুক চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তারপর অজান্তেই। ওয়ালটারের স্ত্রী না হয়ে কিটী হতে পারতো যদি চার্লির স্ত্রী !

তাদের এই গোপন অভিসারের রহস্য ওয়ালটার উদ্ঘাটন করেছে কিনা বুঝতে পারেনি তারা। নাই যদি করে থাকে, থাকুক না গোপন ! আর যদি প্রকাশই পায়, সবারই মংগল। গোড়াতে লুকোচুরিটাই মেনে নিয়েছিল কিটী। কিন্তু সময়ের গতির সংগে কামনার আগুন জ্বলে উঠলো কিটীর বুকে, তারই লেলিহান শিখা পুড়িয়ে ছাই করে দিলো মনের সব দ্বিধা সব দ্বন্দ্ব। দুর্বার হয়ে উঠলো কিটীর মন, অধৈর্য করে তুললো তাকে। অসহ্য হয়ে উঠেছে তাদের নিজ নিজ বন্ধন। অনেক বারই বলেছে চার্লি এই কথা ; আজ উভয়েই তারা যদি থাকতো মুক্ত ! বুঝেছিল কিটী চার্লির মনের কথা। কেলেংকারি কেই-বা চায় ! জীবনের গতির মোড় ঘুরিয়ে দেবার আগে অনেক কিছুই যে ভাবতে হয় ! মুক্তি যদি আসে তাদের দোরে, কী সহজ সরল-না হয়ে যায় সব কিছু !
স্ত্রীর সংগে কতটুকু সম্পর্ক চার্লির জানতো কিটী। একেবারে নিষ্প্রাণ ভাবলেশহীন ঐ মহিলা। ভালোবাসা বলে কোন বস্তুই ছিল না তাদের ভেতর অনেক কাল। শুধু একটা অভ্যাসের বশেই যেন বেঁচে ছিল তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। বন্ধন শুধু তাদের সন্তানেরা। কিন্তু অপর দিকে, ওয়ালটার ভালোবাসে কিটীকে, যদিও নিজের কাজ নিয়েই বিভোর সে। তবু সম্ভব। একটু অস্থির হয়ে উঠবে হয়তো, কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারবে ওয়ালটার।

অবাক হয়ে যায় কিটী একটু আগেও কী ভয়ই-না পেয়েছিল সে ওয়ালটারের কাছে ধরা পড়বার আশংকায়। কিন্তু দরজার হাতলটা আপনিতে ঘুরে যাচ্ছে দেখলে কার-না ভয় আসে মনে! কিন্তু কিসের ভয়? তারা তো জানে কী করবে ওয়ালটার—সেজন্য প্রস্তুতও করেছে নিজেদের। গোপন রহস্য উদ্ঘাটনের সংগে সংগে ফলবতী হবে তাদের আকাংক্ষিত কামনা। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে কিটী।

কিটীর বিশ্বাস আছে রুচিসম্পন্ন লোক ওয়ালটার। আর তাকে ভালোবাসে ওয়ালটার, এও সত্যি। কাজেই কিটী ডাইভোর্স চাইলে নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না ওয়ালটার—অরাজি হবে না সে। তারা ভুল করেছিল; সৌভাগ্য, সময় এসেছে সংশোধনের। মন স্থির করে ফেলে কিটী। সংকল্পে অটুট থাকবে সে এই তার প্রতিজ্ঞা। বিবাদের প্রয়োজন নেই আর। ডাইভোর্সের পর এমনি স্বাভাবিকভাবে মিশবে সে ওয়ালটারের সংগে। তবু কিটী বিশ্বাস করে তাদের গত জীবনের দুটি বৎসরের ইতিহাস অমূল্য-স্মৃতি হয়ে সদা জাগরুক থাকবে ওয়ালটারের মনে।

ভাবছিল কিটী, ডাইভোর্স করতে ডরোথি টাউনসেণ্ড কি আপত্তি করবে? কেন করবে? তার ছোট ছেলেও ইংলণ্ড যাচ্ছে ডরোথিরও ইংলণ্ড যাওয়াই সুবিধা। হংকং-এ থাকবার আর কীই-বা প্রয়োজন তার। সবগুলো ছুটিই ছেলেদের সংগে কাটাতে পারবে, তারপর তার মা বাবাও সেখানে।

খুবই সহজ মনে হয় কিটীর কাছে। কোন কেলেংকারি বা মনো-মালিন্যের সৃষ্টি না-করেও সব বন্দোবস্ত সম্ভব হবে এই তো কিটীর ধারণা। তারপর তারা বিয়ে করবে নিশ্চিন্ত মনে। একটা টানা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কিটীর বুকের ভেতরটা হালকা করে। সুখী হবে তারা এরপর। ঐটুকু পাওয়ার জন্য কিছুটা অসুবিধা ভোগ হয়তো করতে হবে তাদের, কিন্তু কীই-বা আপত্তি তাতে।

এলোমেলো কত ছবিই ভেসে ওঠে এমনি তার মনের পর্দায়। তাদের মিলিত জীবনের কত কী খুঁটিনাটি, কত হাসি কত আনন্দ, কত প্রমোদ-ভ্রমণ দুজনায়—এমনি কত কী মধুর স্বপ্ন মনে আসে তার। মনে আসে তার তাদের মিলিত নীড়ের কথা! চার্লির উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠার কথা। আরো কত কী এমনি। তাকে নিয়ে গর্ব করবে চার্লি আর প্রতিদানে সে ঢেলে দেবে তার অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা চার্লির পরে।

কিন্তু এই দিবাস্বপ্নের অন্তরালে একটা অজানা আশংকার ক্ষীণ স্রোতও যেন বইছিল তার মনে ; তারের মিঠে সুরের অন্তরায় যেন ঢোলকের গুরু-গম্ভীর গমক।

ওয়ালটার বাড়ি ফিরবেই একবার—তার সংগে মুখোমুখি হবার কথা ভাবতেও বুকের ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠে কিটীর। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওয়ালটার একটা কথাও না-বলে চলে গেল! কিন্তু কিটীর কেন ভয় ওয়ালটারকে! কী সে করবে? তবু কিটীর মন যে শান্ত হয় না! নিজের মনে আওড়ে নেয় কথাগুলো কিটী, কী সে বলবে ওয়ালটারকে। একটা সিন তৈরি করে লাভ কী। এমনি একটা অঘটনের জন্য দুঃখ হয় কিটীর—ওয়ালটারকে কষ্ট দেওয়া আদৌ ইচ্ছা ছিল না কিটীর। কী দোষ তার! সে যে ওয়ালটারকে ভালোবাসতে পারেনি! ভাণ করে লাভ নেই, প্রকাশ করবে কিটী সত্য কথা। ওয়ালটার দুঃখিত হবে না হয়তো। তারা ভুল করেছে দুজনেই, এটা সত্যি। আর এ ভুল স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। কিটী নির্দয় হবে না ওয়ালটারের ওপর।

এমনি আপন মনে ভাবতে ভাবতে কেমন একটা আকস্মিক ভয়ের স্পন্দন খেলে গেল তার শিরা উপশিরায়। হাতের তেলো ঘেমে ওঠে তার। ভীতির পাশাপাশি একটা ক্রোধের জ্বালাও অনুভব করে কিটী। কেলেংকারি যদি ডেকেই আনে ওয়ালটার, করবে

সে নিজের দায়িত্বে! ফল্গুও পাবে তার! স্পষ্ট জানিয়ে দেবে কিটী তার মনে একবিন্দু ঠাঁইও ছিল না ওয়ালটারের জন্য। জানিয়ে দেবে সে, বিয়ের পর একটি দিনও তার কাটেনি কৃত-কর্মের জন্য অনুশোচনা না করে।

প্রাণহীন জড়পদার্থ ঐ ওয়ালটার—কিটীর বিবাহিত জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত নিষ্ফল করে দিয়েছে সে! হাস্যকর ওয়ালটারের অহমিকা, কোন রসবোধও নেই তার। ওর আত্মম্ভরিতাকে, ওর আত্মসংযমকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছে কিটী। ওর আত্মসংযম স্বার্থপরের আত্মসংযম, কোন মূল্য নেই তার! ঘৃণা করেছে কিটী ওকে। চুমু খেতে চাইলে ঘৃণায় সর্বাংগ রি-রি করে উঠেছে কিটীর। অত অহংকার কিসের? নাচতে জানে না ওয়ালটার, সমাজে স্থান নেই, সামাজিক পার্টিতে একেবারে অচল! খেলা গান, কোনটাই-বা পারে সে—পলো টেনিস কোনটাই জানে না ওয়ালটার। শুধু ব্রীজ! কিন্তু কী আছে ঐ ব্রীজ খেলায়?

নিজের মেজাজটা একটু চড়িয়ে নেয় কিটী। করুক না ওয়ালটার তাকে তিরস্কার? যা ঘটেছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ওয়ালটার। যাক, ওয়ালটার নিশ্চয়ই জেনেছে ব্যাপারটা! নিজেকে ধন্যবাদ দেয় কিটী। কিটী বাঁচলো এবার, সব কিছুর পরিসমাপ্তি এসেছে এতদিনে! এই তো চাইছিল সে অন্তর থেকে। মিথ্যার অবগুণ্ঠন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কিটী।

এইবার রেহাই দিক ওয়ালটার তাকে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কিটী।

—আর পারি না! একেবারে অতিষ্ঠ, অতিষ্ঠ! উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বার বার উচ্চারণ করে কথাটা। কিন্তু……

বাগানের ফটকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে যেন! ঐ তো, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে সে!

ঘরে আসে ওয়ালটার।

তুরু-তুরু করছিল কিটীর বুকের ভিতর। হাত-পাগুলো কেমন থর-থর কাঁপছিল আতংকে। ভাগ্যিস একটা সোফায় বসেছিল কিটী! মুখের সামনে খুলে রেখেছে একটা বই—ভাণ করছিল যেন পড়ছে।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো ওয়ালটার কিছুক্ষণ। চোখাচোখি হোল কিটীর সংগে। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো কিটীর। হিমেল একটা শিহরণ বয়ে গেল হাত-পা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে; সর্বাংগ যেন কেঁপে উঠলো তার।

ওয়ালটারের মুখ মড়ার মতো বিবর্ণ, পাংশু। পার্কে বসে যেদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল ওয়ালটার সেদিনও এমনি বিবর্ণ দেখেছিল কিটী ওর মুখের চেহারা। স্থির কালো চোখ দুটি বিস্ফারিত। সব জেনেছে ওয়ালটার!

—এত শিগগির ফিরলে যে…! জিজ্ঞাসা করে কিটী।

ঠোঁট কাঁপছিল কিটীর। মুখের কথাটাও শেষ করতে পারলো না সে। ভয়, বুঝি মূর্ছা যাবে সে।

—এমনি সময়েই তো রোজ আসি।

ওর কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত মনে হোল কিটীর। একটু হালকা ভাবেই বলতে চাইলো কথাটা ওয়ালটার। সর্বাংগ কাঁপছে কিটীর। কি জানি ওয়ালটার লক্ষ্য করছে কিনা! একটা চাপা আর্তনাদের বেগ রোধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিটী। চোখ নামিয়ে নিলো ওয়ালটার।

—পোশাক বদলে আসছি। বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে কিটী। নিথর নিশ্চল পড়ে রইলো কিছুক্ষণ। দুর্বল রোগীর মতো অতি কষ্টে টেনে তুললো নিজের শরীরটা সোফা থেকে। কি জানি, পাদুটোর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে তো সে? টেবিল আর চেয়ার ধরে ধরে অতিকষ্টে বাইরে

এসে দাঁড়ালো কিটী। দেয়াল হাতড়ে ধীরে ধীরে এক-এক পা এগিয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে। একটা টি-গাউন পরলো। বসার ঘরে গিয়ে দেখলো টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়ালটার 'স্কেচ' ম্যাগাজিনটার ছবি দেখছে। অতিকষ্টে ভেতরে ঢুকলো কিটী।

—নিচে যাবে এখন? খাবার তৈরি।

—আমার অপেক্ষায় বসে ছিলে বুঝি?

ঠোঁটের কাঁপুনি তখনো রোধ করতে পারছিল না কিটী। কিন্তু কখন কথাটা পারবে ওয়ালটার?

দুজনেই বসে তারা। দুজনেই নীরব।

ওয়ালটার কথা বলে প্রথম—অতি সাধারণ কথা, অপ্রাসংগিক, বিশ্রী লাগলো কিটীর কানে।

—'এমপ্রেস' জাহাজ আসেনি আজকে। বোধ হয় ঝড়ে কোথাও আটকে পড়েছে। বললো ওয়ালটার।

—আজকেই আসার কথা ছিল নাকি? অবান্তর প্রশ্ন!

উত্তর দেয় ওয়ালটার—হ্যাঁ।

ওর মুখের দিকে তাকায় কিটী। দৃষ্টি তখন ওর প্লেটের ওপর নিবদ্ধ। আবাব দু-একটা টুকরো টুকরো কথা বলে ওয়ালটার; অকেজো অর্থহীন। একটা টেনিস টুর্ণামেণ্টের গল্প—অনেক কিছু বলে যায় এই প্রসংগে। অস্বাভাবিক তার কণ্ঠস্বর। কিটীর মনে হয় যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কথার রেশ। ওয়ালটারের দৃষ্টি কখনো প্লেটের ওপব, কখনো টেবিলের এদিক-ওদিক, আবার কখনো-বা তাকিয়ে আছে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে। ইচ্ছে করেই কিটীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ওয়ালটার; তাকাতে পারে না সেদিকে।

খাওয়া শেষ হওয়ার সংগে সংগেই বলে ওয়ালটার—এবার উপরে যাবে?

—চলো।

উঠে দাঁড়ালো কিটী। দরজাটা খুলে ধরে ওয়ালটার। ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো কিটী, ওয়ালটারের দৃষ্টি তখন মাটির দিকে। বসার ঘরে ফিরে এসে আবার কাগজখানা তুলে নিলো ওয়ালটার।

—এটা কি নতুন 'স্কেচ' পত্রিকাটা নাকি ? বোধ হয় এটা আমার দেখা হয়নি।

—কী জানি, আমি লক্ষ্য করিনি।

গত পনেরো দিন পড়ে আছে কাগজটা টেবিলের ওপর, বহুবার দেখেছে ওয়ালটার, কিটী জানে। কাগজটা হাতে নিয়ে বসে ওয়ালটার। কিটীও বসে, বইটা তুলে নেয় ; একটা আর্ম-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে থাকে একটা ছবির দিকে। পড়তে চেষ্টা করে কিটী, কিন্তু চোখের সামনে সব-কটা হরফ যেন আবছা হয়ে আসে—অদৃশ্য হয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে। সবই যেন কেমন এলোমেলো—মাথাটাও যেন ধরে উঠেছে কিটীর।

কিন্তু কখন কথাটা বলবে ওয়ালটাব ?

একটি ঘণ্টা কেটে গেল এমনি নীরবে। পড়ার ভান ত্যাগ করে কিটী, খসে পড়ে বইটা হাত থেকে কোলের ওপর। তাকিয়ে থাকে বাইরে অসীম শূন্যে। ভয় হয় একটু নড়াচড়ায়, একটু আওয়াজে। ওয়ালটারও বসে রইলো তেমনি স্থির, নিষ্পলক দৃষ্টি তার ছবিটার ওপর কেমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তাদের নির্বাক অবস্থিতি। মনে হয় কিটীর, বুঝি-বা বন্য জন্তু ওত পেতে আছে শিকারের উপব লাফিয়ে পড়তে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ওয়ালটার। চমকে ওঠে কিটী ; দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে তার হাতের মুঠো। কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় সে। এইবার তাহলে……

অতি ধীর-কণ্ঠে বলে ওয়ালটার :

—আমার একটু কাজ আছে। তুমি যদি কিছু মনে না করো, আমি

এইবার পড়ার ঘরে যাবো একটু। আমার উঠতে হয়তো দেরি হবে। তুমি বরং শুয়ে পড়গে।

—সত্যি, আমি আজকে আমি বড় ক্লান্ত।

—বেশ, উঠি তাহলে। গুড-নাইট।

—গুড নাইট। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ওয়ালটার।

পরদিনই টাউনসেণ্ডকে অফিসে ফোন করলো কিটী।

—কী ব্যাপার ?

—তোমার সংগে দেখা করা দরকার।

—লক্ষ্মীটি, ভারি ব্যস্ত এখন। জানোতো আমি কাজের লোক !

—খুব জরুরি, তোমার আফিসে আসবো ?

—না-না-না, সে হয় না।

—বেশ, তাহলে তুমিই এখানে এসো।

—কিছুতেই বেরোতে পাচ্ছি না এখন। আজকে বিকেলে এলে চলে না ? আর তোমার বাড়িতে না যাওয়াটাইতো আমার উচিত।

—কিন্তু তোমার সংগে যে দেখা করা আমার একান্ত দরকার।

কিছুক্ষণ কোন আওয়াজ নেই ওদিক থেকে। ভয় হোল কিটীর, লাইনটা ছেড়ে দেয়নি তো।

—হ্যালো, লাইনটা ছেড়ে দিলে নাকি ? জিজ্ঞাসা করে কিটী অধীর ভাবে।

—না, একটু ভাবছিলাম ; কী ব্যাপার বলোতো ?

—টেলিফোনে সব কথা বলতে পারবো না।

আবার নীরব কিছুক্ষণ।

—হ্যালো, শোন। একটার সময় মিনিট দশেকের জন্য তোমার

সংগে দেখা করতে পারি। কু-চৌদের ওখানে যেয়ো। যত শিগগির সম্ভব আমিও যাচ্ছি।

অপর দিক থেকে আওয়াজ আসে।

—কোথায়, সেই কিউরিও শপে ? হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—দেখ, আমরা তো আর হংকং-হোটেলের লাউঞ্জে দেখা করতে পারি না।

জবাব আসে অপরদিক থেকে। একটা বিরক্তির আভাস লক্ষ্য করে কিটী।

—বেশ, আমি কু-চৌ-এর ওখানেই যাচ্ছি।

ভিক্টোরিয়া রোডে রিকশা থেকে নেমে একটা সরু গলি ধরে কিউরিও দোকানের দিকে এগিয়ে যায় কিটী। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ—শো-কেসের জিনিসগুলো যেন দেখছে দাঁড়িয়ে। দোকানের ছোট ছেলেটি ক্রেতার অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে। দেখেই চিনতে পারে কিটীকে। দোকানের ভেতর চীনা ভাষায় কাকে যেন কী বললো ছেলেটি। দোকানের মালিক—বেঁটে মানুষটি মস্তবড় হাঁ-মুখ, পরণে কালো রঙের পোশাক। বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায় কিটীকে। দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ে কিটী।

—মিঃ টাউনসেণ্ড এখনো আসেননি। আপনি উপরে চলে যান।

দোকানের পেছন দিকটায় অন্ধকার নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল কিটী। তার পেছন পেছন এসে চীনা দোকান-দার বেডরুমের তালা খুলে দিলো। ঘরের ভেতরটা কেমন গুমোট, আফিমের উৎকট গন্ধ চারদিকে। একটা চন্দনকাঠের বাক্সের ওপর বসে কিটী।

একটু পরেই নড়বড়ে সিঁড়িতে আবার শোনা যায় ভারি পায়ের আওয়াজ। ভেতরে আসে টাউনসেণ্ড দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। মুখের ভাব কেমন গম্ভীর। সে ভাবটা মিলিয়ে গেল কিটীকে দেখেই। একটা সুন্দর হাসির ঝলক খেলে গেল ওর সারা মুখে। নিবিড় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে চুমু খেলো কিটীর ঠোঁটে।

—তারপর, ব্যাপার কী বলোতো?

—তেমন কিছু না, তোমাকে কাছে পেয়ে সব ভাবনা আমার কেটে গেছে। একটু মুচকি হাসে কিটী।

বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো টাউনসেণ্ড।

—আজকে যেন কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তোমাকে। বলে সে।

—আশ্চর্য হবাব কিছু নেই; সাবারাত কি চোখের পাতা পড়েছে আমার?

চোখ তুলে তাকায় কিটী ওর দিকে। চোখে মুখে তখনো সেই হাসিব বেশ, কিন্তু কেমন একটু অস্বাভাবিক। একটা উদ্বেগের চিহ্নও যেন নেই, লক্ষ্য কবে কিটী।

—ওয়ালটাব জানতে পেবেছে। বলে কিটী।

কিছুক্ষণ নীবব, কোন উত্তব নেই।—কী বলেছে সে?

—বলেনি কিছুই।

চকিত দৃষ্টিতে তাকায় টাউনসেণ্ড।—তবে? কী কবে বুঝলে জানতে পেরেছে ও?

—ওর চাউনি, ওর কথা বলার ধরন, আর ওর হাবভাব থেকে।

—তোমার ওপর দুর্ব্যবহার করেছে নাকি?

—না, ঠিক তার উলটো। অতিরিক্ত শিষ্টাচার দেখিয়েছে ওয়ালটার। কিন্তু, বিয়ের পর এই প্রথম—শুতে যাওয়ার সময় আমায় চুমু খায়নি ও।

চোখ নামিয়ে নেয় কিটী। কি জানি চার্লি বুঝতে পেরেছে কিনা তার কথা! নিবিড় বাহুবন্ধনে টেনে নিয়ে দুর্বার কামনার

উচ্ছ্বলিত ঢেউ আছড়ে পড়ে কিটীর অধর সংগমে, চুম্বনের আবেগে ওয়ালটারের মদালস দেহটা যেন বিলীন হয়ে যায় কিটীর সত্তায়—এই তো প্রতি রাত্রের ইতিহাস। ঐ দিনই শুধু হোল প্রথম ব্যতিক্রম।

—কিন্তু, সে কিছুই তো বলেনি, তবু একথা মনে করছো কেন?

—জানি না। আবার দুজনই নীরব।

চন্দন কাঠের বাক্সটার ওপর নিশ্চল বসে থাকে কিটী। তার উদ্বেগ-দৃষ্টি নিবদ্ধ চার্লির মুখের ওপর। আবার ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে ওঠে চার্লির মুখের ভাব, ভ্রূকুটি খেলে যায় ভ্রূ-রেখার মাঝখানে। চকিতে সে তাকায় মুখ তুলে, কেমন একটা ঈর্ষাকাতর চাউনি তার চোখে।

—আমি ভাবছি আদৌ সে কিছু বলবে কিনা।

কোন জবাব দিলো না কিটী। বুঝতে পারলো না কী বলতে চাইছে টাউনসেণ্ড।

—এ সব ব্যাপারে মুখ বন্ধ করে রাখার নজির এই প্রথম নয়। হৈ-চৈ করে কীই-বা তার লাভ? আর হৈ-চৈ করার ইচ্ছাই যদি তার থাকবে তবে সে-সময়ই তোমার ঘরে প্রবেশ করতো সে।

মিট-মিট করে ওর চোখ, একটা হাসির স্ফুরণ ঠোঁটের কোণে।

—বেশ দেখাতো কিন্তু তখন, না? বলে টাউনসেণ্ড।

—গত রাত্রে ওর মুখের চেহারা যদি তুমি দেখতে!

—বুঝতে পারছি, খুবই চঞ্চল হয়েছিল ওয়ালটার। সত্যিই তো, এ তার কাছে একটা নিদারুণ আঘাত। এর চেয়ে অপমান পুরুষের আর কী হতে পারে! কিন্তু ওকে কেমন নির্বোধ মনে হয় আমার। আর প্রকাশ্যে হৈ-চৈ করার রুচি নেই ওর, এও আমার বদ্ধমূল ধারণা।

—আমারও তাই বিশ্বাস। তবে ও বড় স্পর্শকাতর।

—এই জন্যেই অবস্থা আমাদের আরো অনুকূলে। তবে কি জানো,

অন্যের স্থলে নিজেকে দাঁড় করিয়ে তার অবস্থায় তুমি পড়লে কী করতে, এটা ভেবে নেওয়া খুবই সহজ। তাই এমনি অবস্থায় জেনেও না-জানার ভান করাটাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। বোধ হয় ওয়াল্টারও ঠিক এরকমই ভাবছে।

যতই কথা বলছে ততই যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠছে টাউনসেণ্ড। ঝিক মিক করে উঠছে তার নীল চোখ, ফিরে এসেছে তার নিজের সত্তায়। একটা আত্মবিশ্বাস আর প্রত্যয়ের ভাব যেন বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে তার ভেতর থেকে।

—ওয়ালটারের সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা আমি বলতে চাই না; তবে সাদা কথায় বললে ব্যাকট্রিওলজিস্টদের এমন কিছু গুরুত্ব নেই। সাইমন রিটায়ার করলে সেক্রেটারি হওয়ার সম্ভাবনা আমারই। তাই নিজের স্বার্থের খাতিরেও ওয়ালটারকে আমার স্বপক্ষে থাকতে হবে। কটির ভাবনা তাকেও তো ভাবতে হবে! কাজেই কেলেংকারি বেরিয়ে গেলে উপনিবেশ অফিস থেকে কিছু পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। বিশ্বাস করো, চুপ করে যাওয়াটাই তার লাভ; কোন গোলযোগ সৃষ্টি করাই মানে ষোলআনা লোকসান।

কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল কিটী। সে জানতো ওয়ালটার লাজুক, লোকলজ্জার ভয় সে করে; কিন্তু জাগতিক সুখ সুবিধার চিন্তার প্রভাব যে তার ওপর আদৌ নেই এই কথাটা ভালো ভাবেই জানতো কিটী। সে হয়তো ওয়ালটারকে ভালো বুঝতে পারেনি, তবে চার্লি যে কিছুই বুঝেনি ওয়ালটারের চরিত্র, এও সত্যি।

—ওয়ালটার আমাকে ভয়ংকর ভালোবাসে, এটা তুমি বুঝতে পেরেছো?

কোন উত্তর দেয় না চার্লি। ওর চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি। ঐ হাসি আর চাউনি বড় ভালো লাগে কিটীর।

—কী, উত্তর দিচ্ছ না যে! তবে বুঝতে পাচ্ছি অদ্ভুত কিছু একটা বলবে। কিটী বলে।

—জানো, অনেক সময়ে মেয়েরা পুরুষদের যতটা প্রেমপাগল মনে করে, আসলে কিন্তু তারা তত হয় না!

এই প্রথম হাসি পেলো কিটীর, চার্লির আত্মবিশ্বাস তাকেও প্রভাবান্বিত করেছে।

—এ কিন্তু খুব একটা উদ্ভট কথা।

—ইদানিং তোমায় স্বামী সম্বন্ধে তুমি খুবই উদাসীন; এই আমার ধারণা। বোধ হয় আগের মতো সেও আর ভালোবাসে না তোমাকে।

—তা বলে তুমি আমার প্রেমে পাগল এই কথা মনে করে নিজেকে প্রতারিত করবো না জেনো কখনো। জবাব দেয় কিটী।

—আমি বলবো, এইখানেই তুমি ভুল করছো।

কী যে ভালো লাগলো কথাটা! কিটী জানতো এমনি কথাই সে বলবে! উপলব্ধির আবেগে ভরে ওঠে কিটীর মন। কথা বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় চার্লি। চন্দন কাঠের বাক্সটায় এসে বসে কিটীর পাশে। কিটীর কোমর জড়িয়ে ধরে বাহুবন্ধনে। বলে:

—তোমায় ঐ দুষ্টুমি ভরা ছোট্ট মাথাটা আর ঘামিয়ো না লক্ষ্মীটি। ভয়ের কোন কারণ নেই আর। কিছুই জানে না এমনি ভান করবে ওয়ালটার, এ নিশ্চিত। তাছাড়া জানো তো, এ সব ব্যাপার প্রমাণ করাও খুব কঠিন। তুমি বলছিলে তোমার প্রেমে অন্ধ ওয়ালটার, কাজেই তোমাকে হারানোর কথা কিছুতেই ভাবতে পারে না সে। আমি হলে এমনি অবস্থায় সব কিছু মেনে নিতাম নির্বিবাদে।

ওর গায়ের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে কিটী। দেহটা যেন স্থির নিথর হয়ে যায় চার্লির গায়ে হেলান দিয়ে। তার মনের এই তীব্র ভালোবাসার অনুভূতিটা কেমন যেন পীড়া দেয় কিটীকে।

চার্লির শেষ কটি কথা সচকিত করে দেয় কিটীকে। ওয়ালটার এত ভালোবাসে তাকে যে, এই ভালোবাসার বিনিময়ে যে কোন অপমান হয়তো মেনে নিতে প্রস্তুত সে। এইটুকু অনুভূতি বোধ আছে কিটীর, চার্লির সম্বন্ধে তার মনোভাবও যে এমনি। কেমন একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে কিটীর—কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রেমের এমনি দাসত্বপনার কথা ভেবেও ঘৃণায় ভরে ওঠে তার মন। চার্লির কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কিটী।

—সত্যি, তুমি কী চমৎকার! এখানে আসাব সময় একটা পাতার মতো থর-থর কাঁপছিলাম—সব ঠিক হয়ে গেছে এখন।

কিটীব মুখটা নিজের হাতের ওপর তুলে নেয় চার্লি, চুমু খায় ওর ঠোঁটে।

—ডার্লিং।

—তুমিই আমার শান্তি! বলে কিটী।

—নার্ভাস হয়ো না, ডার্লিং। তোমাব পাশে আছি আমি, কোন ভয় নেই তোমার। তোমাকে ছেড়ে যাবো না কখনো।

সব শংকা দূবে সরিয়ে দিলো কিটী। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য যেন একটু বেদনাবোধ জাগলো মনে, তাব এবং ওয়ালটাবের বিবাহিত জীবনেব ভবিষ্যৎ সব পবিকল্পনা সব কিছু চুরমার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায়। বিপদের আশংকা কেটে যাওয়াব সংগে সংগে মনে হয় কিটীর, হয়তো ওয়ালটার ডাইভোর্স চাইবে নিশ্চয়।

—আমি জানতাম তোমাব উপর নির্ভব কবতে পারবো আমি। কিটী বলে।

—আমিও তো সেই আশাই করি।

—এইবারে টিফিনে যাবে না তুমি?

—চুলোয় যাক টিফিন এখন। বললো টাউনসেণ্ড।

আরো কাছে টেনে নিলো সে কিটীকে। দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ তখন কিটী। তার লুব্ধ ঠোঁটে চাইলো কিটীর অধর স্পর্শ।

—চার্লি, লক্ষ্মীটি, এবার আমার যেতে দাও।

—না, যেতে তোমায় দেবো না এখন।

একটু মৃদু হাসে কিটী, পূর্ণ প্রেমের পরিতৃপ্তির হাসি, বিজয়িনীর হাসি। তীব্র কামনার লোভে লুব্ধ-দৃষ্টি তখন চার্লির চোখ দুটোতে। দুই হাত দিয়ে উঠিয়ে নেয় কিটীকে সে বিছানার ওপর বুকের সংগে নিবিড় করে জড়িয়ে।

দরজাটা বন্ধ করে দেয় তারপর।

ওয়ালটার সম্বন্ধে চার্লির কথাগুলোই সারা বিকেল ভেবেছে কিটী। সেদিন তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা বাইরে। ওয়ালটার যখন ক্লাব থেকে ফিরলো সে-সময় ড্রেস করছিল কিটী বাইরে যাবার জন্য। দোরে নক করে ওয়ালটার।

—এসো।

—আমিও পোশাকটা বদলে নিই। তোমার কতক্ষণ দেরি হবে?

—বেশি না, দশ মিনিট।

আর কোন কথা না বলে চলে যায় ওয়ালটার নিজের ঘরে।

গত রাত্রের মতো আজও যেন তার কণ্ঠে একটা জোরালো সুরের রেশ। কোন দ্বিধা নেই আর কিটীর মনে।

কিটীর আগেই হয়ে গিয়েছিল। ওয়ালটার নিচে নেমে দেখলো গাড়িতে বসে আছে কিটী।

—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি না?

—কী আর হয়েছে! কিটী বলে একটু মৃদু হেসে।

পাহাড়ের উৎরাই পথে গাড়িতে বসে দু-একটা মন্তব্য করে শুধু কিটী। সংক্ষেপে উত্তর দেয় ওয়ালটার। অধৈর্য হয়ে ওঠে

কিটী ; ওয়ালটার গম্ভীর থাকতে চায়, থাকুক না। গন্তব্য স্থলে পৌঁছনো পর্যন্ত নীরব থাকে তুজনাই।

বড় ডিনার পার্টি। নিমন্ত্রিত অনেক, খাবারের কোর্স একাধিক। পাশের লোকের সংগে গল্প-গুজবে ব্যস্ত থাকলেও লক্ষ্য ছিল কিটীর ওয়ালটারের ওপর। কেমন মড়ার মতো ফ্যাকাশে, একটা তীব্র যন্ত্রণার কুঞ্চন সারা মুখে।

—আপনার স্বামীকে কিন্তু খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমাদের ধারণা ছিল গরমটা উনি সহ্য করতে পারেন। খুব কাজের চাপ পড়েছে বোধ হয়, না?

—উনি বড্ড খাটেন কিনা!

—আপনারা বাইরে যাচ্ছেন বোধ হয়!

—হ্যাঁ, বোধ হয় জাপান যাবো এবার। ডাক্তার বলেছেন এই অসহ্য গরমে বাইরে না গেলে শরীর টিকবে না

বাইরের পার্টিতে কিটীর সংগে মাঝে মাঝে একটু সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় ওয়ালটারের স্বভাব বিরুদ্ধ ; কখনো সে তাকায় না কিটীর দিকে। কিটী লক্ষ্য করেছে, গাড়িতে তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওয়ালটার। গাড়ি থেকে নামবার সময় অভ্যাস-মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কিটীর দিকে, দৃষ্টি তখনো অন্যদিকে। ডিনার টেবিলে পাশের মেয়েদের সংগে আলাপ করেছে, কিন্তু মুখে তার হাসি নেই একটুও। কেমন একটা নিষ্প্রাণ অপলক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েছে ওয়ালটার। তার ঐ বিরাট ফ্যাকাশে মুখটার ওপর চোখ তুটো বড় বড় তুই টুকরো নিষ্প্রভ কয়লার মতোই মনে হচ্ছিল যেন।

—সংগী বটে! ভেবেছে কিটী মনে মনে।

ঐ নিষ্প্রাণ লোকটার সংগে পাশের মহিলাদের আলাপ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কিটীর মনোযোগ আকর্ষণ করে না একটুও।

সবই জানতে পেরেছে ওয়ালটার, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আর! এ-তো ঠিক, ক্রুদ্ধ হয়েছে সে কিটীর ওপর। কিন্তু কোন কথা

জিজ্ঞাসা করেনি কেন? তবে কি, তার প্রেমে অন্ধ ওয়ালটার আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও, পাছে কিটী তাকে ছেড়ে যায়, এই ভয়েই কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছে না আর? কথাটা ভাবতেও ওর প্রতি ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে ওঠে কিটীয়। তবু সে তার স্বামী। ভরণ-পোষণ করছে তার। যতক্ষণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করছে ওয়ালটার আর নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারছে সে, ততক্ষণ তার সংগে সদ্ব্যবহার করতে দোষ কী! ওয়ালটারের এই নীরবতা তার ভীরুতার জন্যও হয়তো। চার্লির অনুমান সত্যি, কেলেংকারি ভয় করে ওয়ালটার। লাজুক-স্বভাব ওর একটা রোগ।

শুধু কি তাই। জানাজানি না-হলে সব কিছু হজম করে নেবে হয়তো ওয়ালটার! তাছাড়া চার্লির ঐ ধারণাটাও সত্যি বলে মনে হয় কিটীর—ওয়ালটার জানে রুটির কোন দিকটায় মাখন! চার্লি কলোনিতে সুপরিচিত; কলোনির সেক্রেটারি হবে অদূর ভবিষ্যতে। তাকে কাজে লাগবে ওয়ালটারের—ওর বিরুদ্ধে গিয়ে লাভ হবে না কিছু! তার প্রেমিকের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কিটী। পুরুষ-জাতটা বড় অদ্ভুত! ওয়ালটার এতটা ছোট, ভাবতেও পারে না কিটী! অথচ মজা এই, জানবার উপায় নেই একটুও। ওর গাম্ভীর্য শুধু ওর নীচ প্রবৃত্তি ঢেকে রাখবার একটা মুখোশ মাত্র। যতই চিন্তা করে কিটী মনে হয় চার্লির কথাই ঠিক। স্বামীর দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার তাকায় কিটী। সে দৃষ্টিতে নেই কোন আহ্বান। সেইদিনই প্রথম লক্ষ্য করে কিটী, তার স্বামী যেন বড় একা। তার পাশেই সবাই আলাপে ব্যস্ত। ওয়ালটারের অপলক দৃষ্টি বাইরের দিকে, নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, যেন বাহ্যজ্ঞানহীন—বেদনার উচ্ছ্বাসে ভরা তার চোখ দুটো।

মনে বড় আঘাত পায় কিটী।

পরদিন। লাঞ্চের পর শুয়েছিল কিটী—একটু তন্দ্রার আবেশ। কে যেন দোরে আঘাত দেয় অতি ধীরে। ভেঙে গেল কিটীর ঘুম।

—কে? বিরক্তিতে চিৎকার করে ওঠে সে। এমনি অসময়ে কেউ তো বিরক্ত করে না তাকে!

—আমি। স্বামীর কণ্ঠস্বর! ধড়মড়িয়ে উঠে বসে কিটী।

—এসো...

—ঘুম ভেঙে দিলাম বোধ হয়। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে ওয়ালটার।

—সত্যি কথা বললে, তাই। খুব সহজ সুরেই জবাব দিলো কিটী। গত কয়েক দিনে এই সহজ ভাবটা আয়ত্ব করেছে সে।

—পাশের ঘরে একটু আসবে? তোমার সংগে আমার কয়েকটা কথা আছে।

বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে কিটীর।

—একটা ড্রেসিং গাউন পরে নিই।

ওয়ালটার বেরিয়ে গেল।

একটা কিমনো জড়িয়ে নিলো কিটী। আরসিটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হোল বড় বিবর্ণ হয়ে গেছে সে—একটু রুজ মেখে নিলো গালে। একটু দাঁড়ালো দোর-গোড়ায় শক্তি সঞ্চয় করতে। দৃপ্ত ভঙিতে গিয়ে দাঁড়ালো স্বামীর সামনে তারপর।

—লেবরেটরি থেকে এমনি অসময়ে চলে এলে যে। এমন তো কখনো দেখিনি? বলে কিটী।

—বসো। কিটীর দিকে তাকালো না ওয়ালটার। কেমন একটা গম্ভীর সুর তার কণ্ঠে। আদেশ পালন করে কিটী সানন্দে, তার হাঁটু কাঁপছিল। মনের সেই সহজ ভাবটা কেটে যাওয়ায় চুপ করেই

রইলো সে। একটা সিগারেট ধরালো ওয়ালটার। ঘরময় ঘুরে বেড়ায় তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। সুরু করতে পারে না যেন তার বক্তব্য। সহসা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সে কিটীর দিকে। এমনি আকস্মিক দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে গেল কিটী। একটা চকিত আর্তনাদ গুমরে উঠলো তার কণ্ঠে।

—মী-তান-ফুর নাম শুনেছো কখনো; কাগজে খুব সোরগোল হচ্ছে কদিন। জিজ্ঞাসা করে ওয়ালটার।

অবাক বিস্ময়ে তাকায় কিটী। ইতস্তত করে একটু।

—ওখানেই খুব কলেরা হচ্ছে, না? কালকে রাত্রে মিঃ আরবুথনট বলছিলেন।

—হ্যাঁ, এপিডেমিক দেখা দিয়েছে। আমার বিশ্বাস এমনি ভীষণ এপিডেমিক তার দেখা যায়নি এ অঞ্চলে। একজন মেডিকেল মিশনারি ওখানে কাজ করছিলেন। দিন-কয়েক আগে তাঁরও কলেরায় মৃত্যু হয়েছে। একটা ফরাসী কনভেণ্ট আছে; আর আছে কাস্টমসের লোকেরা। আর সবাই পালিয়েছে। বলে ওয়ালটার।

তার দৃষ্টি কিটীর মুখের ওপর তখনো নিবদ্ধ—চোখ নামাতে পারলো না কিটী; তার চোখের ভাষা বুঝতে চাইলো—কিন্তু নিজেকে বড় নার্ভাস মনে হয় কিটীর। ঐ চোখ দুটোতে দেখতে পায় কিটী শুধু একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসা, একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু ওর দৃষ্টি এতটা স্থির কেন? চোখের যেন পলক পড়ে না!

—ফরাসী ভিক্ষুনীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। অনাথ-আলয়টাকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু মানুষগুলো মরছে মশামাছির মতো। ওখানকার কাজের ভার নিতে সম্মতি দিয়েছি, আমি যাবো ওখানে।

—তুমি যাবে……… ?

চমকে ওঠে কিটী। একটা ঝলক খেলে যায় তার মনের কোনে।

ওয়ালটার চলে গেলে মুক্তি পাবে কিটী, বিনা বাধায় মেলামেশা করতে পারবে চার্লির সংগে। কিন্তু সংগে সংগেই আবার আঁতকে ওঠে কিটী। রক্তিম হয়ে ওঠে সে। তার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন ওয়ালটার? অপ্রস্তুত চোখ ঘুরিয়ে নেয় কিটী।

—কিন্তু তোমার যাবার কি খুবই দরকার?

একটু ইতস্তত করে কিটী বলতে।

—আর কোন বিদেশী ডাক্তার সেখানে নেই।

—কিন্তু তুমি তো ডাক্তার নও?

—নিশ্চয়ই জানো আমি এম-ডি। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ হবার আগে কিছুকাল হাসপাতালেও কাজ করেছি। বিশেষ করে এখন ব্যাকটিওলজিস্ট হিসেবেই আমার প্রয়োজন বেশি। গবেষণার অদ্ভুত সুযোগ ঘটবে সেখানে।

হালকা ভাবেই বলে কথাগুলো। কিটীও বিস্মিত হয়, দেখে ওর চোখে কেমন কৌতুকের আভাস। বুঝতে পারে না কিটী এর অর্থ!

—কিন্তু এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে তো?

—খু-উ-ব।

একটু মুচকি হাসে ওয়ালটার। কেমন একটা বিদ্রূপের কটাক্ষ চোখের কোনে। মাথাটা নুয়ে আসে কিটীর, হাত দিয়ে টিপে ধরে নিজের কপালের রগ দুটো। আত্মহত্যা করতে চাইছে ওয়ালটার? তাছাড়া আর কী? কী ভীষণ! ওয়ালটার এমনি করে নেবে ব্যাপারটাকে কল্পনাও করতে পারেনি কিটী কোনদিন। কী নির্মম পদক্ষেপ! ওয়ালটারকে ভালবাসতে পারেনি কিটী, এ কি তার অপরাধ! কিন্তু তারই জন্যে আত্মহত্যা করবে ওয়ালটার—এও যে ভাবতে পারে না কিটী। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

—তুমি কাঁদছো যে! কণ্ঠস্বর আবেগহীন।

—তুমি যেতে বাধ্য হচ্ছ না ওয়ালটার?

—না, আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি।

—তোমায় মিনতি করছি ওয়ালটার, তুমি যেয়ো না। যদি একটা কিছু হয়? তুমি যদি মারা যাও? মিনতি ভরা কিটীর কণ্ঠস্বর। কোনো পরিবর্তন হোল না মুখ-ভাবের, শুধু একটা মৃদু হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল ওয়ালটারের চোখে। জবাব দিলো না সে।

—ও জায়গাটা কোথায়? একটু হাসতে চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—কী, মী-তান-ফু? ওয়েস্টার্ণ রিভারের একটা শাখার ধারে। নৌকোয় অনেকটা উজান গিয়ে পালকিতে যেতে হবে আমাদের।

—আমাদের মানে?

—কেন, তুমি আর আমি।

তড়িতে তাকালো কিটী ওয়ালটারের দিকে। ভাবলো, ভুল শোনেনি তো? ওয়ালটারের চোখের হাসিটা ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে ঠোঁটের ওপর। চোখের কালো মণিদুটো কিটীর মুখের ওপর নিবদ্ধ।

—আমিও সংগে-যাবো এই ভেবে রেখেছো নাকি?

—তাই তো আমার ধারণা।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল কিটীর। কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল তার শিরায় উপশিরায়।

—কিন্তু ওটা মেয়েদের যাবার জায়গা নয় নিশ্চয়ই। মিশনারি ভদ্রলোক কয়েক হপ্তা আগেই তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—আর এ-পি-সির লোকও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। ওঁর সংগে এক চায়ের আসরে দেখা হয়েছে আমার। আমার এখন মনে পড়েছে, ঐ ভদ্রমহিলা বলছিলেন কোত্থেকে যেন কলেরার ভয়ে চলে এসেছেন।

—পাঁচজন ফরাসী ভিক্ষুনী এখনো তো সেখানে আছে!

ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে কিটী। বলে সে:

—বুঝতে পাচ্ছিনা কী বলতে চাইছো তুমি! তোমার সংগে যাওয়া একটা নিছক পাগলামি নয় কি? তুমি জানো আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা। গরমের জন্য ডাঃ হেওয়ার্ড আমাকে হংকং ছেড়ে যেতে বলছেন। ওখানকার গরম তো আমি আরো সহ্য করতে পারবো না। তারপর কলেরা—আমি যে পাগল হয়ে যাবো! এমনি বিপদ ডেকে আনা কেন? আমাকে তোমার সংগে যাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমি কী করবো সেখানে গিয়ে?

কোন উত্তর দিলো না ওয়ালটার।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিটী। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ রোধ করতে পারলো না সে। ওয়ালটারের সারা মুখে ঘনিয়ে এলো কেমন একটা ঘন-কৃষ্ণ ছায়া—ভয় পেয়ে গেল কিটী। তবে কি তারও মৃত্যু কামনা করছে ওয়ালটার? এ ভীষণ প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলো সে:

—এ অসম্ভব। তোমার যাওয়াটা যদি নিতান্ত কর্তব্য বলে মনে করো তুমি, তবে সে তোমার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছ থেকেও সেটুকু প্রত্যাশা করো কী করে! অসুখ-বিসুখকেই আমার ভয়—তারপর আবার কলেরা মহামারি! খুব সাহসী বলে জাহির করতে চাই না নিজেকে। আর তোমাকে বলতে বাধা নেই, তেমন ভান করার ইচ্ছাও নেই আমার। জাপান রওনা হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবো আমি।

—আমার কিন্তু ধারণা ছিল এইরকম বিপদ-সংকুল অভিযানে তুমিও আমার সাথী হবে স্বেচ্ছায়।

এতক্ষণে বেরিয়ে এলো বিদ্রূপের কশাঘাত প্রকাশ্যে। কেমন গুলিয়ে গেল কিটীর সব। বুঝতে পারছিল না কিটী এই কি তবে ওয়ালটারের মনের কথা। নাকি ভয় দেখিয়েছে তাকে শুধু।

—যেখানে আমার করবার কিছু নেই বা যেখানে কোন কাজে আসবো না আমি, সেখানে বিপদের মুখে না যেতে চাইলে কেউ অপরাধী করবে না নিশ্চয়ই—এই আমার বিশ্বাস।

—কাজ ছিল তোমারও। অন্তত আমাকে উৎসাহ এবং আরাম দিতে পারতে তো।

আরো বিবর্ণ হয়ে গেল কিটী।

—তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

—এই কথাটা বুঝতে সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে বেশি বুদ্ধির দরকার এও বিশ্বাস করতে বলো আমায়!

—আমি যাবো না। তুমি আমায় যেতে বলো না ওয়ালটার। এ তোমায় অন্যায়, এ তোমার অসম্ভব দাবি।

—বেশ, তাহলে আমিও যাবো না। এক্ষুনি তাই জানিয়ে দিয়ে আসছি।

শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিটী তার দিকে। এমনি অপ্রত্যাশিত কথার কী যে তাৎপর্য, উপলব্ধি করাই কেমন কঠিন মনে হোল প্রথমে।

—তুমি কী সব বলছো? থতমত খেয়ে বলে কিটী।

নিজের কানেই যেন মিথ্যা শুনায় প্রশ্নটা। ওয়ালটারের মুখের কাঠিন্যের ভেতরও ফুটে ওঠে ঘৃণার একটা অভিব্যক্তি; লক্ষ্য করে কিটী।

—তুমি যতটা ভাবছো তত বোকা আমি নই কিন্তু।

কোন জবাব খুঁজে পেলো না কিটী। তাচ্ছিল্যভরে নিজের অজ্ঞতার ভানই করবে, নাকি ক্রুদ্ধ তিরস্কারে ফেটে পড়বে স্থির করতে পারছিল না সে। ওয়ালটার বুঝি তার মনের সংশয় বুঝতে পেরেছে।

—সব প্রমাণ আমি পেয়েছি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে কিটী। অশ্রুর বন্যা নেমে আসে তার দুচোখ বেয়ে, রোধ করতে চেষ্টা করে না সে স্রোতধারা। কান্নার বেগে সময় পেলো কিটী নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করতে। কিন্তু তার মনের ভেতরটা কেমন শূন্য! নির্বিকার লক্ষ্য করছিল তাকে ওয়ালটার। ওয়ালটারের এমনি নির্বাক প্রশান্তি কেমন আরো সন্ত্রস্ত করে তুলছিল কিটীকে।

অধৈর্য হয়ে ওঠে ওয়ালটার।

—কেঁদে কোন লাভ হবে না কিটী।

তার এই কঠোর আবেগহীন কণ্ঠস্বর ঘৃণায় আচ্ছন্ন করে দেয় কিটীর মন। ধীরে ধীরে ফিরে আসে কিটী নিজ সত্তায়। বলে:

—শোন, কোন পরোয়া করি না আমি আর। ডাইভোর্স করতে চাইলে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি হবে না তোমার? আমি জানি কিছু এসে যায় না পুরুষের এতে।

—আচ্ছা বলতে পারো, তোমারই জন্যে নিজেকে এতটুকু অসুবিধায়ও ফেলবো কেন আমি?

—কারণ কোন ক্ষতি নেই এতে তোমার! তোমার কাছ থেকে এইটুকু ভদ্রতার প্রত্যাশা খুবই বেশি চাওয়া হবে না নিশ্চয়ই, ওয়ালটার।

—জানো, তোমার কল্যাণই কামনা করি এখনো—এতটুকু শ্রদ্ধা এখনো আছে তোমার জন্যে।

চোখের জল মুছে সোজা হয়ে উঠে বসে কিটী।

—কী বলতে চাইছো তুমি? জিজ্ঞাসা করে তাকে।

—শুধু কো-রেসপনডেন্ট হলেই টাউনসেণ্ড তোমায় বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনি লজ্জাকর যে তার স্ত্রীও হয়তো তাকে ডাইভোর্স করতে বাধ্য হবে না।

—তুমি জানো না কী তুমি বলছো! আর্তনাদ করে ওঠে কিটী।

—জানি, তুমি একটা আস্ত নির্বোধ।

একটি বিজাতীয় ঘৃণা ফেটে পড়লো ওয়ালটারের কণ্ঠে। রাগে রক্তিম হয়ে উঠলো কিটী। ওয়ালটারের মুখে মিষ্টি কথা ছাড়া এমনি রূঢ় ভাষা তো আর সে শোনেনি কোনদিন—তাই বুঝি রাগ হোল তার আরো বেশি। এতকাল তার সমস্ত খামখেয়ালিই তো মেনে এসেছে ওয়ালটার।

—বেশ, সত্যি কথা যদি জানতেই চাও তবে বলছি শোন। সে আমায় বিয়ে করতে প্রস্তুত। ডরোথি টাউনসেণ্ডও ডাইভোর্স করতে রাজি। আর মুক্তি পাওয়ার সংগে সংগে আমরা বিয়ে করবো এও ঠিক।

—এ সব কথা সে তোমায় বলেছে, নাকি তার হাবভাব থেকে এই ধারণাই হয়েছে তোমার?

বিদ্রূপের ঝলকে ঝলমলিয়ে ওঠে ওয়ালটারের ছুটো চোখ। অসোয়াস্তি বোধ করে কিটী সে দৃষ্টিতে। মনের ভেতর সায় পায় না তো কিটী। নিশ্চিত হতেই-বা পারছে কই!

—সে বার-বারই তো বলেছে এই কথা।

—মিথ্যে কথা! আর তুমিও জানো এ মিথ্যে।

—সে মনে প্রাণে ভালোবাসে আমায়। আমি যেমনি ভালোবাসি তেমনি সেও বাসে আমায়। তুমিও তো তা বুঝতে পারছো। আজকে আর কিছুই গোপন করবো না আমি। কেন করবো? আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি আজ এক বছর, সেজন্য গর্ব অনুভব করি আমি। পৃথিবীতে আমায় ছাড়া কিছুই জানে না টাউনসেণ্ড, তুমি জানো সে কথা। এই সব গোপন আর লুকোচুরি অসহ্য হয়ে উঠেছে আমাদের। মস্ত একটা ভুল করেছি তোমায় বিয়ে করে—আমার নির্বুদ্ধিতাই বলবো, নইলে কোন মতেই বিয়ে করা উচিত হয়নি তোমাকে। আমি ভালোবাসিনি তোমায় কোনদিন। কোন-কিছুতেই মিল হয়নি আমাদের। তুমি যাদের পছন্দ করো তাদের ছায়াও মাড়াতে চাইনি আমি।

যা তোমার ভালো লাগে, বিরক্তি আসে আমার তাতে। ধন্যবাদ দেবো এই বলে, এতদিনে হয়েছে এ সবের পরিসমাপ্তি।

হাঁফিয়ে উঠছিল কিটী দুরন্ত উত্তেজনায়। স্থির অচঞ্চল নির্বিকার ভাবে শুনছিল ওয়ালটার ওর প্রতিটি কথা। ভাবের কোন প্রকাশ নেই তার মুখে তার দৃষ্টিতে। কোন প্রতিক্রিয়াই বুঝি হয়নি তার মনে এমনি ভাবলেশহীন তার দৃষ্টি!

—জানো, ওয়ালটার, কেন আমি বিয়ে করেছিলাম তোমায়?

—কারণ তোমার বোন ডরিসের আগে তোমার বিয়ে তুমি চাইছিলে।

কথাটা সত্যি। কিন্তু ওয়ালটারও জানে কথাটা, কেমন কৌতুক জাগে কিটীর মনে। কিন্তু কী আশ্চর্য, মনের এই ক্রোধ আর শংকার ভেতরও করুণা হয় ওয়ালটারের জন্য। শুধু একটু মৃদু ফিকে হাসি হাসে ওয়ালটার। আবার বলে:

—কোন মোহই ছিল না আমার তোমার জন্যে। আমি জানতাম, তুমি নিরেট মস্তিষ্কহীন, আর তোমার স্বভাব চটুল। তবু তোমায় ভালোবেসেছিলাম। এও জানতাম আদর্শ তোমার খুব ছোট, তুমি অতি সাধারণ স্তরের। তবু ভালোবেসেছিলাম। তুমি অতি সাধারণ জেনেও ভালোবেসেছিলাম তোমাকে। আজকে ভাবতেও কৌতুক বোধ করছি, কী কঠিন চেষ্টাই করেছি তোমার আনন্দে পুলকিত হতে। আমি যে অজ্ঞ, নীচ এবং নির্বোধ নই এই কথাটা তোমার কাছে গোপন করতে কী উৎকণ্ঠায়ই কেটেছে আমার। আমি জানতাম বুদ্ধির প্রাখর্য তুমি সইতে পারতে না, তাই নিজেকে আরো অনেকের মতোই নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন করার সব চেষ্টাই করতাম। নিজের সুবিধা এবং স্বার্থের খাতিরেই বিয়ে করেছো আমায়, এও জানা ছিল আমার। কিন্তু তোমায় এত ভালো আমি বাসতাম যে এ গ্রাহ্যই করিনি কখনো। আমি যতটুকু জানি, ভালোবেসে প্রতিদান না পেলে অভিযোগে মন

ভরে ওঠে অনেকেরই—ক্রোধ আর তিক্ততায় বিষিয়ে ওঠে তারা। কিন্তু আমি তা নই। তোমার ভালোবাসা প্রত্যাশা করিনি কখনো আমি, প্রয়োজনই দেখিনি, কারণ নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ ছিল আমার। তোমাকে ভালোবাসার সুযোগ পেয়েছিলাম এইটুকুই আমি যথেষ্ট মনে করতাম। কখনো তোমার কাছ থেকে প্রীতির একটুখানি ছোঁয়াচ, তোমার চোখে প্রেমের দীপশিখার একটু আলো, এই পেলেও আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতাম আমি। আমার ভালোবাসায় কখনো ক্লান্তি না আনে তোমার, সে দিকেও লক্ষ্য ছিল আমার—লক্ষ্য রেখেছি কখনো অধৈর্য হয়ে ওঠো কিনা। স্বামীর যেটা অধিকার আমি সেটা গ্রহণ করেছি দয়া বলে।

তোষামোদ-প্রীতি স্বভাবজাত কিটীর, কিন্তু কখনো তো কেউ এমনি কথা বলেনি তাকে! কেমন তীব্র একটা আবেগ সব ভয় সরিয়ে দিয়ে উদ্বেল করে তুললো তাকে, কেমন যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো তার। কপালের শিরা উপশিরা, প্রতিটা রক্তকণিকা যেন দপ-দপ সুরু করেছিল দারুণ উত্তেজনায়। নিজের আত্মম্ভরিতায় আঘাত পেলে হৃতশাবক সিংহীর মতো হিংস্র হয়ে ওঠে মেয়েরা। একটা কুৎসিৎ বীভৎসতায় স্ফীত হয়ে উঠছিল কিটীর চোয়াল ছুটো—কালো হয়ে উঠলো সুন্দর চোখ ছুটো তার, একটা জিঘাংসা বৃত্তিতে। কিন্তু সংযত করে নেয় কিটী নিজেকে।

—মেয়েদের ভালোবাসা পাবার মতো কোন কিছু যদি না থাকে পুরুষের, সে অপরাধ পুরুষের, মেয়েদের নয়।

—অস্বীকার করি না।

শ্লেষের তীক্ষ্ণতা অনুভব করে কিটী। নিজেকে সংযত রেখে আরো নির্মম আঘাত দেবে সে ওয়ালটারকে।

—আমার শিক্ষাও নেই, চাতুরিও জানি না আমি। অতি সাধারণ

মানুষ আমি। যাদের ভেতর জীবন কাটিয়েছি এতকাল তাদের যা ভালো লাগে আমিও তাই পছন্দ করি। নাচ, টেনিস, থিয়েটার এ-সবই ভালোবাসি। যে সব পুরুষ খেলাধুলো করে তাদের আমি পছন্দ করি। এটা সত্যি, তুমি এবং তোমার যা কিছু ভালো লাগে—কিছুই সহ্য করতে পারিনি আমি। আমি জানতে চাইনি কী তোমার ভালো লাগে, প্রয়োজনও মনে করিনি জানবার। ভেনিসের আর্ট গ্যালারিতে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তার চেয়ে স্যানডুইচে গলফ খেলতে ভালো লাগতো আমার বেশি।

—সে আমি জানি।

তুমি যা চাও তা হতে পারিনি বলে খুবই দুঃখিত আমি। এটাও আমার দুর্ভাগ্য যে তোমাকে ঘৃণাই করেছি শুধু। কিন্তু সে জন্য দোষ আমায় দিতে পারো না তুমি।

—দোষ আমি দিই না।

ওয়ালটার যদি ফেটে পড়তো উত্তেজনায়, কিটী হয়তো আয়ত্তে আনতে পারতো তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা। হিংসার মুখোমুখি হিংসা দিয়েই করতে পারতো সে। ওয়ালটারের আত্মসংযম অমানুষিক—ঘৃণায় ভরে ওঠে কিটীর মন, এমন ঘৃণা বুঝি সে আর করেনি কোনদিন স্বামীকে।

—তুমি পুরুষ, না কী? কেন তুমি দোর ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়োনি যখন জানলে চার্লি আমার ঘরে? তাকে আঘাত করবার চেষ্টাও তো করতে পারতে তুমি? কী ভয় ছিল তোমার?

বলার সংগে সংগে লজ্জায় কেমন আরক্তিম হয়ে উঠলো কিটী। কোন জবাব দিলো না ওয়ালটার। তার দৃষ্টিতে শুধু কঠোর তিরস্কার। ঠোঁটের কোনে শুধু এক-ফালি হাসির রেখা।

—হতেও তো পারে কোন এক ঐতিহাসিক নায়কের মতো আমিও চাই না প্রতিপক্ষের সংগে সংগ্রাম করতে!

কোন জবাব খুঁজে পেলো না কিটী। স্থির দৃষ্টিতে ধরে রাখে ওয়ালটার কিটীকে।

—আমার যা বলার সবই বলেছি তোমায়; ভেবে দেখো, মী-তান-ফু যেতে রাজি যদি না হও আমি স্বীকৃতিপত্র উঠিয়ে নিই। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিই আমি যাবো না।

—কিন্তু তোমাকে ডাইভোর্স করার অনুমতি কেন দিচ্ছ না আমায়?

অবশেষে তার দৃষ্টি অপসৃত করে নিলো ওয়ালটার। চেয়ারে গা এলিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। সিগারেট শেষ হয়ে গেল একটি কথাও না বলে। তারপর টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু মুচকি হাসলো শুধু। আরো একবার তাকালো কিটীর দিকে।

—মিসেস টাউনসেণ্ড তাঁর স্বামীকে ডাইভোর্স করবেন এ আশ্বাস যদি তাঁর কাছ থেকে পাই, আর উভয় ডিক্রি পাকা হবার এক হপ্তার ভেতরেই সে তোমায় বিয়ে করবে এই অংগীকার-পত্র যদি লিখে দেয় টাউনসেণ্ড, তাহলে আমিও প্রস্তুত, কথা দিচ্ছি তোমায়।

কথার ভঙিতে এমন কিছু একটা ছিল যা দমিয়ে দিলো কিটীর মন। তবু তার আত্মসম্মানবোধই এ প্রস্তাব হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে বাধ্য করলো তাকে।

—এ তোমার মহানুভবতার পরিচয় ওয়ালটার।

হঠাৎ একটা বিকট অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো ওয়ালটার কিটীকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কিটী রাগে।—এমন করে হাসছো যে? হাসবার তো কিছুই দেখছি না আমি।

—মাপ করো, কিটী। সত্যি বলছি আমার হিউমার জ্ঞান একটু অদ্ভুত।

ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে তাকায় কিটী। তিক্ত ভাষায় আঘাত দিলে

সুখী হোত কিটী, কিন্তু কোন উত্তরই জোগালো না তার মুখে।
ঘড়ি দেখে ওয়াল্টার।
—টাউনসেণ্ডকে অফিসে পেতে হলে তোমার বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। কারণ, মী-তান-ফু যাওয়াই যদি স্থির হয়, পরশুদিনই রওনা হতে হবে।
—টাউনসেণ্ডকে কথাটা আজকেই বলি এই কি তোমার ইচ্ছা?
—তাইতো মনে হয়। শুভস্য শীঘ্রম্।
বুকের ভেতরটা কেমন দুরু দুরু করে ওঠে কিটীর। অনুভূতিটা ঠিক অসোয়াস্তির নয়, কেমন যেন একটা—ঠিক বুঝতে পারছিল না কিটী, কী সেই অনুভূতি! আর কদিন সময় পেলে ভালো হোত বোধ হয়—চার্লিকে আরো একটু প্রস্তুত করে নিতে পারতো! কিন্তু বিশ্বাস ছিল কিটীর; কিটীকে ভালোবাসে টাউনসেণ্ড, যতটুকু সেও বাসে তাকে। এমনি প্রয়োজনের তাগিদ স্বীকার করবে না চার্লি? এমনি চিন্তা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর! আশ্বস্ত হয় কিটী।
—আমার বিশ্বাস ভালোবাসা কী জিনিস জানো না তুমি ওয়ালটার। একটুও ধারণা নেই তোমার, কতটুকু গভীর আমার আর চার্লির ভালোবাসা। ভালোবাসাটাই মুখ্য, এর দাবিতে যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকার অতি সহজ, যত সহজ গাছ কেটে মাটিতে ফেলা।
কিটীর কথায় শুধু একবার মাথা নোয়ালো ওয়ালটার, কোনো কথা বললো না সে। ধীর পদক্ষেপে অপস্রিয়মান কিটীর চলার পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শুধু।

ছোট্ট একটা স্লিপ ভেতরে পাঠিয়ে দিলো কিটী।

'তোমার সংগে দেখা করা দরকার। খুব জরুরি।'

চাইনিজ বেয়ারা অপেক্ষা করতে বললো তাকে। উত্তর নিয়ে এলো, মিঃ টাউনসেণ্ড পাঁচ মিনিটের ভেতরই দেখা করছেন। অসম্ভব রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছিল কিটী। তাকে ঘরে ডেকে নেওয়ার সংগে সংগেই চার্লি এগিয়ে এলো হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করতে। চাইনিজ বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পরই কোথায় রইলো তার ফরম্যালিটি।

—এমনি অফিসের সময় তোমার কিন্তু আসা মোটেই উচিত হয়নি, কিটী। ভীষণ কাজ রয়েছে হাতে। আর তাছাড়া কানাঘুসোর সুযোগ দেওয়াও কি ভালো হবে?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালো সে তার সুন্দর দুটো চোখ নিয়ে। হাসতে চাইলো, কিন্তু কঠিন ঠোঁটে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল সে চেষ্টা।

—দরকার না থাকলে আমি আসতাম না।

একটু হেসে কিটীর হাতদুটো তুলে নিলো চার্লি।

—যাকগে, যখন এসেছো, বসবে চলো।

ঘরটা ফাঁকা, অপরিসর, সিলিংটা বেশ উঁচু। দেয়ালে টেরা-কোটা পেন্টিং। ফারনিচার বলতে ঘর জুড়ে বড় একটা ডেস্ক, একটি রিভলভিং চেয়ার—ওটাতেই টাউনসেণ্ড বসে। ভিজিটারদের চামড়ায় গদি-আটা আর্ম-চেয়ার। কিটীর যেন ভয় হয় ওখানে বসতে। ডেস্কের ধারে বসে টাউনসেণ্ড। তাকে চশমা পরতে দেখেনি কখনো কিটী, জানতোও না। কিটীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে টাউনসেণ্ড খুলে নেয় চশমাটা।

—শুধু পড়ার জন্যই চশমা ব্যবহার করি। বলে টাউনসেণ্ড।

চোখে জল ভরে এলো কিটীর। বুঝলো না সে কেন এই চোখের জল—কিন্তু কেঁদে ফেললো কিটী। ঠিক প্রতারণা করার ইচ্ছা থেকে নয় কিন্তু; চার্লির আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ

করার একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত ইচ্ছা থেকেই বোধ হয় কান্না এলো কিটীর।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চার্লি।

—কী হয়েছে? বলো লক্ষ্মীটি, কাঁদে না।

রুমাল বের করে কান্নার বেগ রোধ করতে চেষ্টা করে কিটী।

কলিং বেলটা টেপে চার্লি। বেয়ারাকে বলে:

—কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে বাইরে গিয়েছি।

—আজ্ঞে, আচ্ছা। বেয়ারা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়।

চেয়ারের হাতলের ওপর বসে কিটীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে চার্লি।

—কিটী, ডিয়ার, বলো কী হয়েছে?

—ওয়ালটার ডাইভোর্স চাইছে।

চার্লির বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে আসে বুঝতে পারে কিটী। দেহ কঠিন হয়ে আসছে ক্রমশ। ক্ষনিকের জন্য সব নিশ্চুপ। তারপর চেয়ারের হাতল থেকে ওঠে দাঁড়ায় টাউনসেণ্ড। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে।

—ঠিক বুঝিয়ে বলতো কথাটা!

চকিতে ফিরে তাকালো কিটী ওর দিকে। কেমন কর্কশ যেন চার্লির কণ্ঠস্বর। মুখের রঙ যেন কেমন ফ্যাকাশে লাল!

—ওয়ালটারের সংগে কথা হয়েছে আমার। বাড়ি থেকেই সোজা আসছি এখন। সব প্রমাণ নাকি সে পেয়েছে।

—স্বীকার করোনি নিশ্চয়ই কিছু।

ভেঙে পড়ে কিটী।

—না। জবাব দেয় কিটী।

—সত্যি তো! তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে চার্লি।

—নিশ্চয়ই। আবার মিথ্যা কথা বলে কিটী।

চেয়ারে গা এলিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চার্লি তার সামনে দেয়ালে টাঙানো চীনের মানচিত্রের দিকে। অধীর-ভাবে লক্ষ্য করছিল কিটী তাকে। যেমনি ভেবেছিল কিটী, তেমন ভাবে যেন

খবরটা গ্রহণ করেনি চার্লি। দমে যায় কিটী। আশা ছিল এই সুসংবাদে চার্লি বাহুবন্ধনে টেনে নেবে তাকে। তাকে ধন্যবাদ জানাবে মুক্তির সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে। কিন্তু সত্যি, পুরুষ জাতটা খুবই অদ্ভুত! কেঁদে ফেললো কিটী আবার—সহানুভূতি আকর্ষণের প্রচেষ্টায় নয়, এ তার স্বাভাবিক কান্না।

অবশেষে কথা বলে চার্লি।

—কী একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে দেখছি। যাক, মাথা খারাপ করে লাভ নেই। কেঁদেও কোন ফল হবে না কিটী।

একটু বিরক্তির আভাস লক্ষ্য করে চোখ মুছে কিটী।

—আমার দোষ নয় চার্লি, এ ছাড়া তো উপায় ছিল না কিছু।

—তা সত্যি। দুর্ভাগ্যই বলবো। দায়ী শুধু তুমি নয়, আমিও। কিন্তু এ থেকে উদ্ধার কিসে সেইটাই বড় প্রশ্ন। আসলে ডাইভোর্স তুমিও চাও না, আমিও না।

একটা তীব্র আর্তনাদের বেগ রোধ করে কিটী। অনুসন্ধানী-দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় চার্লির মুখের ওপর। চার্লি তার কথা ভাবছে না মোটেই।

—বুঝতে পারছি না, কী প্রমাণ ওয়ালটার সংগ্রহ করেছে। জানিনা আমরা দুজন সেইদিন একই ঘরে ছিলাম এই কথা প্রমাণ করবে সে কী দিয়ে। সতর্কতা নিয়েছিলাম আমরা। আর ঐ কিউরিও দোকানের বুড়োটাই সব প্রকাশ করে দেয়নি তো! তাছাড়া আমাদের এক সংগে সেখানে যেতে দেখলেও প্রমাণ হয় না। কিউরিও দেখতে যেতে পারি আমরা এক সংগে।

স্বগতোক্তির মতোই শুনায় কথাগুলো।

—অভিযোগ আনা খুবই সহজ, কিন্তু সেগুলো প্রমাণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। যে কোন উকিলের কাছে গেলেই জানতে পারবে তুমি। সব অস্বীকার করবো আমরা, কিছু করতে সে যদি চায়ই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা যাবে তখন।

—আমি কোর্টে যাবো না, চার্লি।

—কিন্তু, কেন ? তোমাকে তো যেতেই হবে। সত্যি বলতে কি বাদ-বিসম্বাদ আমিও চাই না, কিন্তু তাই বলে বিনা প্রতিবাদে চুপ করে থাকাও চলতে পারে না, যখন বিপদ সত্যি সত্যিই এসে পড়বে ঘাড়ে।

—কিন্তু ডিফেণ্ড করার দরকার কী ?

—কী বলছো তুমি ! ব্যাপারটা শুধু তোমাকে নিয়েই নয়, আমি জড়িত আছি এতে। তাহলেও মনে হয় ভয় করার নেই কিছু। তোমার স্বামীর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে ভাবছি কোন্ ব্যবস্থা শোভন হবে।

যেন একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। ফিরে তাকায় সে কিটীর দিকে। মুখে হাসির মৃদু রেখা।

—দুষ্টু মেয়ে, বড় অধীর হয়ে পড়েছো দেখছি।

কিটীর দুটো হাত তুলে নিলো নিজের হাতে।

—একটুখানি ঝঞ্ঝাটে আমরা পড়েছি বটে। ভেবো না, সব ঠিক করে নেবো। এই তো…

বলতে বলতে থামলো সে। কিটীর সন্দেহ এলো মনে, হয়তো সে বলতে চেয়েছিল এই রকম বিপদের অভিজ্ঞতা এই তো প্রথম নয় !

—বড় কথা হোল, বুদ্ধি ঠিক রাখা, বিশ্বাস করো তোমায় বিপদে ফেলবো না কখনো।

—আমি আর ভয় করি না। কী করবে ওয়ালটার !

তবু হাসলো চার্লি—কিন্তু কেমন যেন নিষ্প্রাণ সেই হাসি।

—তবে প্রয়োজন হলে গভর্নরকেও বলবো। যাচ্ছেতাই বলবে আমাকে, তবে মানুষ হিসেবে তিনি চমৎকার ; যে করেই হোক মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা সম্ভব হবে নিশ্চয়ই। একটা কিছু কেলেংকারি ঘটলে তাঁকেও যে পোয়াতে হবে কিছুটা।

—গভর্নর কী করবে ? প্রশ্ন করে কিটী।

—কেন, ওয়ালটারের ওপর চাপ দেবে। উচ্চাশার লোভ দেখিয়ে কিছু করতে না পারলেও কর্তব্যের নজিরে কিন্তু অনেক কিছু সম্ভব।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় কিটী। কেমন একটা হিম শীতল শিহবণ অনুভব করে সে সর্বাংগে। মনে হয় কিটীর, ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি চার্লি। তার মুখের এমনি হালকা কথা অধৈর্য করে তুলে কিটীকে। অনুতাপ আসে তার মনে, অফিসে চার্লির সংগে সাক্ষাৎ করতে না আসলেই ভালো হোত বোধ হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝি তার প্রতিকূলে। চার্লির বাহুবন্ধনে কণ্ঠলগ্ন হয়ে হয়তো আরো সহজে সরলভাবে বলতে পারতো তার মনের কথা।

—তুমি চেনো না ওয়ালটারকে। বলে কিটী।

—হবে, তবে এ আমি জানি প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা মূল্য আছে। অন্তর দিয়ে ভালোবাসে কিটী চার্লিকে। কিন্তু চার্লির এমনি হালকা কথা হতাশায় ভরে তুলে তাকে। এ কী কথা তার মতো চতুর লোকের মুখে!

—ওয়ালটার যে কতটুকু ক্রুদ্ধ হয়েছে বুঝতে পারোনি তুমি। তুমি দেখোনি তার মুখের চেহারা, তার চোখের দৃষ্টি।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না চার্লি—শুধু সহাস্যে তাকায় কিটীর দিকে। কী সে ভাবছে বুঝতে পেরেছে কিটী। ওয়ালটার ব্যাকট্রিওলজিস্ট, নিম্নপদস্থ কর্মচারী; কলোনির উপরালাদের বিরাগভাজন হবার মতো অবিবেচনার কাজ করবে না হয়তো ওয়ালটার।

—মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চনা করছো চার্লি। কোন লাভ নেই। যদি ওয়ালটার কিছু করবে মনস্থির করে থাকে তাহলে তুমি বা অন্য কারো কোন কথার কোন প্রভাবই বিচ্যুত করতে পারবে না তাকে।

চার্লির মুখের চেহারা আবার কঠিন গম্ভীর হয়ে যায় যেন।

—আমাকে কো-রেসপনডেন্ট করাই তার ইচ্ছা!

—প্রথমে তাই ছিল। পরে অবশ্যি ডাইভোর্স করার স্বীকৃতি আদায় করেছি।

—ও, তাই নাকি! সত্যি……

একটু সহজ হয়ে আসে চার্লি, দৃষ্টিতে একটুখানি নিরুদ্বেগের চিহ্ন।

—মুক্তি পাবার ঐ একটা সহজ উপায় বটে। সত্যিইতো, কমসে-কম অতটুকু তো করবেই—এর চেয়ে শোভন আর কী আছে বলো!

—কিন্তু একটা সর্ত আছে তার।

সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালো চার্লি—একটু চিন্তার ভাব চোখে মুখে।

—খুব বড় লোক নই আমি, তবে আমার ক্ষমতানুযায়ী করবার চেষ্টা করবো আমি।

কিটী নীরব। এমনি কথা প্রত্যাশা করেনি কিটী। বাকরোধ হয়ে আসে তার। কথাটা উড়িয়ে দেবে চার্লি, নিবিড় করে টেনে নেবে কিটীকে তার বুকের উত্তপ্ত আশ্রয়ে, এই প্রত্যাশাই যে করেছিল কিটী!

—তোমার স্ত্রীও তোমাকে ডাইভোর্স করবে এই প্রতিশ্রুতি যদি দেয় তবেই ওয়ালটার আমার ডাইভোর্স মেনে নেবে।

—আরো কিছু?

বুঝি নিঃশেষ হয়ে আসছিল কিটীর বাকশক্তি—

আর…বলতে পারছি না চার্লি, বড় ভীষণ শুনাবে কথাটা…। দ্বিতীয় সর্ত, তোমাকে অংগীকার করতে হবে ডিক্রি পাকা হবার এক সপ্তাহের ভেতরেই বিয়ে করবে আমাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো টাউনসেণ্ড। কিটীর হাতটা তুলে নিলো আবার, মৃদু চাপ দিলো ওর হাতে।

—শোন ডার্লিং, যাই কিছু হোক না, ডরোথিকে আর জড়াতে চাই না এর ভেতর।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিটী।—আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না, সে কী করে সম্ভব!

—দুনিয়ায় শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলে না কিটী। তুমি জানো, সব দিক বজায় রেখে তোমাকে বিয়ে করতে পারলে খুবই খুশি হবো আমি। যাক, সে কথা। ডরোথিকে জানি কিছুতেই সে আমাকে ডাইভোর্স করতে রাজি হবে না।

ভীত হয়ে পড়ে কিটী। আবার কেঁদে ফেললো সে। ওর পাশে এসে বসলো চার্লি—কোমর জড়িয়ে ধরে ওর দুই হাতে।

—এতটা অধীর হয়ো না ডার্লিং। এ অবস্থায় মাথা ঠিক না রাখলে চলবে কেন?

—আমি জানতাম তুমি আমায় ভলোবাসো ......

কোমল সুরে বলে চার্লি—সত্যিই তো, সত্যি তোমায় এখনো ভালোবাসি কিটী। সন্দেহ করার কোন কারণ নেই তোমার।

—তোমার স্ত্রী ডাইভোর্স না করলে তোমাকে কো-রেসপনডেন্ট হতেই হবে।

অনেকটা সময় কেটে গেল উত্তর দিতে। কণ্ঠ তার কেমন শুষ্ক।

—আমার কেরিয়ার নষ্ট হবে এতে; কিন্তু আমার ভয় তোমারও উপকার হবে না কিছু। যদি তেমন বিপদই আসে ডরোথিকে সব কথাই খুলে বলতে হবে আমাকে; জানি মর্মান্তিক আঘাত পাবে সে, কিন্তু ক্ষমা সে করবেই আমাকে।

কী একটা আইডিয়া যেন মাথায় এলো তার। আবার বললো সে কিটীকে:

—সব কথা খুলে বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পাচ্ছি না। তবে আমার বিশ্বাস ডরোথি তোমার স্বামীকে বলে তার মুখ বন্ধ করতে পারে।

—এর অর্থ, সে তোমাকে ডাইভোর্স করে, এ তুমি চাওনা? ইচ্ছেও নয়?

—ছেলেদের কথাও যে আমাকে ভাবতে হবে কিটী! সুতরাং আমি তাকে অসুখী করতে চাই না। তাছাড়া এতকাল মতের অমিল আমাদের হয়নি তো কোনদিন। আদর্শ স্ত্রীর মতো ব্যবহারই আমি পেয়েছি ডরোথির কাছে।

—তাহলে এতকাল কেন বলতে—কোন প্রয়োজনেই সে আসে না আর?

—এ আমি বলিনি কখনো। আমি বলেছি ওকে আর ভালোবাসি না আমি। গত ক-বছর এক বিছানায় পর্যন্ত ঘুমুইনি আমরা, দু-এক সময় ছাড়া—এই ধরো খ্রীস্টমাসের দিন, কিংবা যেদিন দেশ থেকে ফিরেছে সেইদিন। ওসবে এখন আর মন নেই ওর। আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু বজায় আছে তবু। বলতে বাধা নেই, তার ওপর যে কতটা নির্ভর করি ধারণাই করতে পারবে না কেউ।

—তাহলে আমার সংস্পর্শে না আসাই কি উচিত ছিল না তোমার? বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল কিটী, আতংকে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসলেও বেশ সহজেই বলছিল কথাগুলো।

—তোমার মতো এমনি অপূর্ব জিনিসের প্রতি লোভ যে সংযত করতে পারলাম না কিটী। এজন্যে দোষারোপ করে কী লাভ বলো?

—কিন্তু সব সময়ই তুমি বলেছো কোনদিন বিপদে ফেলবে না আমায়।

—বিপদে তোমায় সত্যি ফেলবো না কোনদিন। দেখছো না কেমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির ভেতর জড়িয়ে গেছি আমরা! এ থেকে তোমায় উদ্ধার করতে আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়ই করবো আমি!

—হ্যাঁ, যা স্বাভাবিক এবং সহজ সেইটে বাদে।

ঠোঁটের কোণে একটু ফিকে হাসি। দাঁড়িয়ে পড়ে চার্লি, ফিরে যায় তার নিজের চেয়ারে।

—শোন লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। ব্যাপারটা আরো একটু খোলাখুলি বিচার করা ভালো। তোমাকে আঘাত দিতে চাই না, তবে সবটুকু তোমাকে খুলে বলা দরকার। জানো, নিজের কেরিয়ার সম্বন্ধে খুবই সচেতন আমি। একদিন এই কলোনির গভর্নর হওয়ার সম্ভাবনাও আছে আমার, তবে পথটা একটু পিছল। কিন্তু এই ব্যাপারটাকে চাপা না দিলে ক্ষীণতম আশাও দেখি না আর। চাকুরি হয়তো ছাড়তে হবে না, কিন্তু চিরদিনের জন্য একটা কালো দাগ থেকে যাবে আমার নামের আগে। আর চাকুরি যদি ছাড়তেই হয় এই চীনেই কোথাও ব্যবসায় নামতে হবে হয়তো। উভয় ক্ষেত্রেই আমার একমাত্র ভরসা ডরোথি।

—তুমি দুনিয়ায় আমাকে ছাড়া আর কিছু চাও না এ কথা বলারও কি প্রয়োজন ছিল কিছু?

কেমন বিরক্তি চার্লির মুখে চোখে।

—প্রেমমুগ্ধ পুরুষ যখন যা বলে সে-সব কথার সোজা সরল অর্থ করা সব সময় ঠিক নয়, লক্ষ্মীটি।

—কিন্তু ওগুলো কি মনের কথা নয়?

—নিশ্চয়ই, তখনকার মতো।

—আর আমার কী হবে, ওয়ালটার যদি ডাইভোর্স করে?

—যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য না থাকে আমাদের ডিফেণ্ড করবো না তাহলে। বেশি প্রচার না হলেই হোল, সাধারণ লোকের মন আজকাল বেশ উদার হয়েছে এ-সব ব্যাপারে।

এই প্রথম মনে পড়ে কিটীর মায়ের কথা। কেঁপে ওঠে কিটী। টাউনসেণ্ডের দিকে ফিরে তাকায় আবার। বেদনার মাঝেও বিতৃষ্ণার মিশ্রণ।

—আমার কষ্টে একটুও দুঃখ হবে না তোমার নিশ্চয়ই, কেমন? বলে কিটী।

—এ সব অপ্রিয় কথা বাড়িয়ে লাভ কী, কিটী?

একটা হতাশার আর্তনাদ বেরিয়ে আসে কিটীর বুক চিড়ে। এত গভীর ভালোবাসার ভেতরও কেমন তিক্ততায় যেন বিষিয়ে ওঠে কিটী। কিটীর কাছে তার কতটুকু মূল্য বুঝতে পারেনি টাউনসেণ্ড।

—চালি, সত্যিই কি তুমি বুঝতে পারো না কতটুকু ভালোবাসি আমি তোমায়?

—কিন্তু ডিয়ার, আমিও তো বাসি তোমায় তেমনি। তবে পার্থক্য এই, মরুভূমির কোন দ্বীপে বাস করছি না আমরা। যাই করবো, ঘটনাস্রোতের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে আমাদের। অবুঝ হবে না নিশ্চয়ই।

—না হয়ে উপায় কী? আমার কাছে ভালোবাসাই ছিল সব, তুমি ছিলে আমার জীবনের পূর্ণতা। কাজেই তোমার কাছে এ ছিল শুধু একটা ঘটনা মাত্র, এই যে উপলব্ধি এটা যে মনের সংগে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছি না কোন মতেই।

—ঘটনা মাত্র ছিল আমার কাছে এ কথা ঠিক নয়, কিটী। কিন্তু, তুমি যখন চাও আমার স্ত্রীকে—যার প্রতি আমার অনুরাগের কিছুমাত্রও অভাব নেই—বিবাহ বিচ্ছেদে বাধ্য করতে, আর তোমাকে বিয়ে করে আমার সমস্ত কেরিয়ারটা ধ্বংস করে দিতে, তখন সে চাওয়া কি খুব বেশি চাওয়া নয়, কিটী?

—তোমার জন্য যতটুকু করতে প্রস্তুত আমি তার চেয়ে বেশি নয় নিশ্চয়ই।

—পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ।

—হ্যাঁ, তফাত এইটুকু যে তুমি আর ভালোবাসো না আমায় আদৌ।

—জানো, জীবনের সব কটা দিন তার সংগে কাটাবার ইচ্ছা না করেও পুরুষ ভালোবাসতে পারে নারীকে।

বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায় কিটী চার্লির দিকে—পরক্ষণেই হতাশা মুহ্যমান করে দেয় তার মন। বড় বড় অশ্রু-বিন্দু গড়িয়ে পড়তে থাকে গাল বেয়ে।

—উঃ, কী নিষ্ঠুর! এত নির্মম তুমি!

উদ্বেলিত হয়ে ওঠে কিটী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকায় চার্লি দোরের দিকে।

—কিটী, লক্ষ্মীটি, সংযত কবো নিজেকে।

—তুমি জানো না কত ভালোবেসেছিলাম তোমায় আমি! হাঁফিয়ে ওঠে বলতে বলতে।

—তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না চার্লি। আমার জন্য কি একটুও দয়া নেই তোমার?

আর কোন কথা বলতে পারে না কিটী। ফেটে পড়ে দুবার কান্নায়।

—নির্দয় আমি হতে চাই না। তোমার মনে ব্যথা দেওয়াও ইচ্ছা নয় আমার; কিন্তু আসল কথা আমায় বলতেই হবে যে কিটী।

—সমস্তটা জীবন আমার নষ্ট হয়ে গেল। আমাকে কেন তুমি একা থাকতে দাও নি? কী ক্ষতি আমি করেছিলাম তোমাব।

—সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে শান্তি আসে যদি মনে, বেশ দিতে পারো।

আকস্মিক রাগে দপ করে জ্বলে ওঠে কিটী।

—আমিই বুঝি তোমার ঘাড়ে এসে চেপে বসেছিলাম, না? আমার উপরোধে বশ না হওয়া পর্যন্ত আমিই বুঝি তোমাকে শান্তি দিইনি, কেমন?

—তাতো বলছি না আমি। তবে এটা সত্যি, তোমার কাছ থেকে যদি একটুও ইংগিত একটুও আভাস না পেতাম, নিশ্চয়ই আমি যেতাম না অযাচিত প্রেম নিবেদন করতে।

উঃ, কী লজ্জা! সত্যি কথাই বলেছে চার্লি। গম্ভীর, উদ্বেগের ছাপ ওর চোখে মুখে—কেমন অসোয়াস্তিভাবে হাত পা নাড়ছিল চার্লি। ক্ষণে ক্ষণে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়ছিল কিটীর ওপর।

—তোমার স্বামী তোমায় ক্ষমা করবে?

একটু বাদে জিজ্ঞাসা করে টাউনসেণ্ড।

—আমি চাইনি কখনো।

স্বত-প্রণোদিত ভাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে চার্লির হাত। একটা ক্রুদ্ধ চিৎকারের ঢেউ ঠোঁটের কিনারায় এসেও যেন মিলিয়ে যায়—লক্ষ্য করে কিটী।

—তার কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করো না কেন? সে যদি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসে থাকে ক্ষমা করবে নিশ্চয়ই।

—তুমি কতটুকু জানো তাকে? চোখ মোছে কিটী। শান্ত করতে চেষ্টা করে নিজেকে!

—এমনি যদি পরিত্যাগ করো আমায় আমি যে মরে যাবো চার্লি! ইচ্ছা হয় তার অনুকম্পা ভিক্ষা করে এবার। তাকে তক্ষুনি বললেই হয়তো ভালো ছিল। কঠিনতম বিকল্প ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে তার মহানুভবতা, তার বিচারবুদ্ধি, তার পুরুষত্ব এমনি তীব্র আন্দোলিত হোত যে হয়তো-বা তখন শুধু কিটীর বিপদের কথা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারতো না টাউনসেণ্ড। উঃ, ঐ বলিষ্ঠ বাহু দুটোর কঠিন পেষণ কী তীব্রভাবেই না কামনা করছিল কিটী!

—ওয়ালটার চাইছে আমিও মী-তান-ফু যাই।

—সে কী! ওখানে যে কলেরা হচ্ছে! গত পঞ্চাশ বছরে এমনি ভীষণ এপিডেমিক দেখেনি কেউ! মেয়েদের যাবার স্থান ওটা নয়! তুমি কেমন করে যাবে সেখানে?

—তুমি যদি পরিত্যাগ করো আমায়, আমাকে যেতেই হবে।

—কী বলছো? আমি তো কিছুই বুঝছি না।

—মিশনারি ডাক্তারটি মারা গিয়েছে, তার জায়গায় ওয়ালটার যাচ্ছে। তার ইচ্ছা আমিও তার সংগে যাই।

—কবে ?

—সম্ভব হলে আজই।

চেয়ারটা একটু পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে হতবুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে টাউনসেণ্ড।

—তুমি কী বলছো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি সে যদি তোমাকেও সংগে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে আবার ডাইভোর্সের কথা আসে কী করে ?

—সে আমাকে তুটো ব্যবস্থার মধ্যে একটা বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে মাত্র। হয় আমি মী-তান-ফু যেতে স্বীকার করবো,—নয় তার ব্যবস্থা সে করবে।

—ও, বুঝেছি। টাউনসেণ্ডের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হোল একটু। বললো,—আমার মনে হয় এটা খুবই শোভন প্রস্তাব।

—কী বলছো ? শোভন !

—হ্যাঁ। তার এই যেতে চাওয়াটা খুবই স্পোর্টিং, প্রশংসার যোগ্য। আমি হলে হয়তো কল্পনাও করতে পারতাম না। তার এই মহানুভবতার জন্য সরকারি খেতাব পাবে হয়তো।

—কিন্তু, আমার কী হবে চার্লি ? আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো কিটী, কণ্ঠে তীব্র বেদনা।

—শোন, সে যখন তোমায় যেতে বলছে, আমার মনে হয়, অস্বীকার করা উচিত হবে না তোমার।

—জানো, এর অর্থ মৃত্যু, অবধারিত মৃত্যু !

—এ তোমার বাড়াবাড়ি। তাই যদি, সে নিশ্চয়ই তোমায় সংগে নিয়ে যেতে চাইতো না। তার বিপদের চেয়ে তোমার বিপদ বেশি হবার কোন কারণ দেখি না। সত্যি বলতে কি, একটু সতর্ক থাকলে আদৌ কোন বিপদ নেই। আমি যখন আসি তখন

এখানেও ভীষণ কলেরা, কিছু হয়নি তো আমার! সেদ্ধ না-করে কিছু খেতে নেই। কাঁচা ফল, স্যালাড এ জাতীয় কিছু না খাওয়াই উচিত। আর খাবার জল ফুটিয়ে নিতে হয়। তাহলেই আর ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।

আত্মবিশ্বাস আর নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসছিল চার্লির মনে। সে দ্রুত বলে গেল কথাগুলো—বাহ্যিক গাম্ভীর্যও কেটে গেল একটু একটু করে। বেশ হালকা হয়ে এলো চার্লি।

—ওখানেই তার কর্মক্ষেত্র! পোকা-মাকড় নিয়েই তো তার কাজ! এ তার একটা অপূর্ব সুযোগ।

—কিন্তু আমার কী হবে চার্লি?

পুনরুক্তি করে কিটী, দুঃখে নয় এবার—বিরক্তিতে।

—দেখো, কাউকে ভালো করে বুঝতে হলে তার কথামতো চলতে হয়। তার মতে অন্যায় তুমি করেছো, তাই সে চাইছে আর কোন অনিষ্ট যাতে না হয় তোমার। আমার বিশ্বাস সে কখনো ডাইভোর্স করতে চায়নি তোমায়—তাকে ঐরকম প্রকৃতির বলে মনে হয়নি তো কখনো। তার বিবেক বুদ্ধি মতো সুপ্রস্তাবই সে দিয়েছিল তোমাকে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মুখ বন্ধ করে দিয়েছো তুমি! তোমাকে দোষ দিই না, কিন্তু সবার কথা এবং সব দিক চিন্তা করে আরো একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল তোমার!

—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না, এতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। দেখতে পারছো না নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই সে আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে চাইছে?

—ছিঃ কিটী, ওরকম বলতে নেই! একটা বিশ্রী অবস্থার ভেতর পড়েছি আমরা, এ সময় নাটুকে-পনা করা সাজে?

—তুমি বুঝবে না, কী করে তোমায় বোঝাবো আমি!

উঃ, কিটীর অন্তরে কী তীব্র জ্বালা! শিরায় শিরায় আতংকের কী শিহরণ! আর্তনাদ করে ওঠে কিটী।

—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এমন করে তুমি আমায় পাঠিয়ে দিয়ো না চার্লি। আমার প্রতি একটু প্রেম একটু অনুকম্পা যদি নাও থাকে, মানুষের একটুখানি সাধারণ অনুভূতিও কি নেই তোমার?
—সমস্ত ব্যাপারটাকে এ রকম করে চিন্তা করা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে আমার পক্ষে। আমার বুদ্ধিতে যতটুকু আসছে, তোমার স্বামী তোমার সংগে সদয় ব্যবহারই করেছে। সে তোমাকে ক্ষমা করতেও প্রস্তুত যদি তাকে শুধু একটু সুযোগ দাও। সে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। আর কোন অনিষ্ট যাতে স্পর্শ না করে সেজন্যই কয়েক মাস দূরে সরিয়ে রাখার এ অপূর্ব সুযোগ সে গ্রহণ করতে চায়! মী-তান-ফু একটা স্বাস্থ্যনিবাস, বলছি না আমি—চীনদেশে সত্যিকার এমনি স্বাস্থ্যকর সহর কোথাও আছে বলেও জানা নেই আমার। তাহলেও সেখানে না যাওয়ার কোন যুক্তিই আমি দেখি না বর্তমান অবস্থায়। এপিডেমিকের সময় সংক্রমণের চেয়ে ভয়েই মরে বেশি লোক।
—কিন্তু আমারও যে ভীষণ ভয় করছে এখন। ওয়ালটারের প্রস্তাব শুনে প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলাম।
—প্রথমেই একটা শক লাগা স্বাভাবিক স্বীকার করি, কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করলে দেখবে ও-কিছু না। সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না—এ রকম একটা অভিজ্ঞতা হবে তোমার।
—আমি ভেবেছিলাম······ভেবেছিলাম······

কেমন অসহনীয় এক যন্ত্রণায় যেন এপাশ-ওপাশ করছিল কিটী। কোন কথা বলে না টাউনসেণ্ড। তার সারা মুখের ওপর আবার সেই কাঠিন্যের ছাপ। অনেকক্ষণ দেখেনি কিটী এ রকম। আর কাঁদে না কিটী। শুকিয়ে গেছে তার অশ্রুর উৎস। কেমন যেন একটা প্রশান্তি ফিরে এসেছে স্নায়ু-কোষে, কণ্ঠ তার ক্ষীণ কিন্তু সচল।
—তুমি চাও আমি যাই সেখানে?

—প্রশ্নটা খুবই কঠিন……

—তাই কি ?

—তোমার স্বামী যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় জয়লাভ করে, তবে আমার পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়—তোমার মংগলের জন্যই এ কথাটা বলে রাখা দরকার তোমাকে।

যেন এক যুগ কেটে যায় কিটীর জবাব দিতে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে।

—বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করার ইচ্ছা আমার স্বামীর আদৌ আছে, মনে হয় না আমার।

—তাহলে এমন করে আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলে কেন বলোতো ? প্রশ্ন করে টাউনসেণ্ড।

নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিটী।

—সে জানতো, এমনি করেই তুমি আমায় পরিত্যাগ করবে।

আবার নির্বাক কিটী।

বিদেশী ভাষায় একটা পৃষ্ঠা পড়েও কোন অর্থবোধ হয় না প্রথম, পরে ধীরে ধীরে একটা অক্ষর বা একটা ছত্র যেন অর্থের ইংগিত দেয় একটু, অবশেষে হঠাৎ-আলোর-ঝলকানির মতো চমক দিয়ে ওঠে অর্থবোধ—তেমনি অস্পষ্টভাবে কিটীর কাছেও যেন ওয়ালটারের মনের গোপন রহস্যের একটু সন্ধান মিলছিল এক ঝলকে। এ যেন বিদ্যুতের ঝলকানিতে ক্ষণিকের দেখা অন্ধকারের একটা ভীতিবিহ্বল নিসর্গ-চিত্র, রাতের আঁধারে ওর অবলুপ্তি। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে কিটী।

—শোন চার্লি, ভয়ে তুমি কুঁকড়ে যাবে জেনেই এ ভয় দেখিয়েছিল সে। কিন্তু কী অদ্ভুত ! সে ঠিক আঁচ করতে পেরেছিল তোমাকে। এমনি নির্মম হতাশার বিভীষিকা আমার চোখের সামনে প্রকাশ করে দিয়ে সত্যি যোগ্যতম কাজ করেছে ওয়ালটার।

সামনে ব্লটিংপ্যাডের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ চার্লির। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূ

কুঞ্চন—মুখের ভাব অদ্ভুত গম্ভীর। কিন্তু কোন জবাব দিলো না সে।

—সে জানতো, তুমি দাম্ভিক, ভীরু আর স্বার্থপর। সে আমার সামনে তোমার মনের এ কুৎসিত রূপের প্রকাশ চেয়েছিল। বিপদেব মুখে তুমি শশকের মতো পালিয়ে যাবে এও সে বুঝেছিল। তোমার ভালোবাসায় বিশ্বাস করে কতটুকু প্রতারিত হয়েছি আমি সেটুকুও বুঝতে পেরেছিল ওয়ালটার। সে চিনেছিল নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসার কোন ক্ষমতাই নেই তোমার। নিজেকে বাঁচাবার জন্য অম্লানবদনে তুমি আমায় বলি দিতে পারবে এও বুঝতে পেরেছিল সে।

—এ রকম জঘন্য আর মিথ্যা দোষারোপ করে তোমার মন যদি সন্তুষ্ট হয় কিটী, তবে সত্যি আমার বলার কিছু নেই। মেয়ে জাতটাই এমনি, সময় বুঝে এবা পুরুষের মাথায় সমস্ত দোষের বোঝা চাপিয়ে দিতে সংকোচ করে না একটুও। কিন্তু তারা ভুলে যায় অপর পক্ষেরও কিছু-না-কিছু বলার থাকে।

আমল দিলো না কিটী তার এসব কথায়।

—ওয়ালটার যা জানতো, আমিও বুঝতে পেরেছি তা এতদিনে। আমি বুঝেছি তুমি প্রাণহীন, নির্মম ; আমি বুঝেছি তুমি স্বার্থপর। তোমার স্বার্থপরতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একটা শশকের মতো মনের জোরও নেই তোমার—তুমি মিথ্যাবাদী, কপট, তুমি ঘৃণার যোগ্য।

কেমন একটা তীব্র বিষের জ্বালায় যেন সারাটা মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় কিটীর।

—আর সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এটাই, তবু আমি অন্তর থেকে ভালোবাসি তোমায়।

—কিটী!

একটা তিক্ত হাসি কিটীর ঠোঁটের কোণে। কিটীর নাম উচ্চারণ

করে টাউনসেণ্ড তার অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে—মনে হয় বুঝি দরদ ঢেলে দিলো সে। কিন্তু মনে হয় কিটীর, এ কিছুই না, সব ফাঁকি!

—তুমি একটি মূর্খ……! বলে কিটী।

কেমন একটু হকচকিয়ে পিছু হঠে গেল চার্লি। বুঝতে পারছিল না কিটীর মনোভাব। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিটী তার দিকে—সে দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুতের চমক।

—তুমি আমাকে অপছন্দ করতে সুরু করেছো, না? বেশ তাই করো। এখন আর এতে আমার যায় আসে না কিছু। এই বলে কিটী দস্তানা হাতে উঠিয়ে নিলো।

—তুমি তাহলে কী করবে? জিজ্ঞাসা করে টাউনসেণ্ড।

—না-না, ভয় পেয়ো না। তোমার কোন অনিষ্ট করবো না আমি; সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে নিরাপদে থাকতে পারবে তুমি।

—দোহাই তোমার কিটী, এবকম ভাবে আর কথা বলো না। জবাব দেয় চার্লি; তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

—বিশ্বাস করো, তোমার যা আমারও তা। আমি জানবার জন্য খুবই উৎকণ্ঠায় থাকবো। বলো, তোমার স্বামীকে তুমি কী বলবে?

—তাকে বলবো তার সংগে মী-তান-ফু যেতে প্রস্তুত।

—তুমি যেতে চাইলে বোধ হয় আর জোর করবে না।

কিটীর দিকে তাকিয়ে দেখলো অদ্ভুত বিস্ময় তার চোখে।

—সত্যি, তুমি ভয় পাওনি?

—না। বলে কিটী।—তুমিই আমায় দুর্বার শক্তির প্রেরণা জুগিয়েছো। কলেরা এপিডেমিকের ভেতর দিয়ে দুরন্ত একটা অভিজ্ঞতা লাভ করবো আমি; আর, আর, আর যদি……হাঁা, আমি যদি মরেই যাই সেখানে……ক্ষতি কী? ভালোই হবে…!

—নির্দয় ব্যবহার তোমার সংগে করতে চাইনি কিটী!

আবার তাকায় তার দিকে কিটী। জলে ভরে ওঠে তার দুটো চোখ; বুকের ভেতরটা তার শূন্য। একটা দুর্বার শক্তি তাকে

ঠেলে দিচ্ছিল চার্লির বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে, তার উত্তপ্ত অধরের জ্বালা ভেঙে খান খান করে দিতে চার্লির ঠোঁটের ওপর। কিন্তু, না, কোন লাভ নেই আর!

—জানতেই যদি চাও তবে শোন, অন্তরে ভয় আর মৃত্যু কামনা নিয়েই যাচ্ছি আমি। কণ্ঠ সংযত রাখতে চেষ্টা করে সে।

—জানিনা, ওয়ালটার তার মনের ঐ অন্ধকার গহ্বরে কী কথা লুকিয়ে রেখেছে—কিন্তু নিদারুণ ভীতিতে আমার স্নায়ু কাঁপছে থর-থরিয়ে। বুঝতে পারছি একমাত্র মৃত্যুই দিতে পারবে আমাকে পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ।

অনুভব করছিল কিটী আর বুঝি এক মুহূর্তও তার আত্মসংযমের বাঁধ রক্ষা করতে পারবে না সে! দ্রুতপদে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। চার্লি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবার আগেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল কিটী ঘর থেকে।

একটা মুক্তির নিশ্বাস বুঝি বেরিয়ে এলো টাউনসেণ্ডের বুক খালি করে।

এক্ষুণি তার কিছুটা ব্র্যাণ্ডি আর সোডার দরকার।

বাড়িতেই ছিল ওয়ালটার।

সোজা নিজের ঘরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিটীর, কিন্তু ওয়ালটার তখন নিচে হল ঘরে—বেয়ারাদের কী বলছিল। কিটীর মনের অবস্থা এমনি যে, যে কোন হেনস্তার জন্য প্রস্তুত সে। ওয়ালটারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কিটী।

—আমি যাবো তোমার সংগে।

—ও,……বেশ!

—কখন রওনা হতে হবে?

—কালকে রাত্রে।

কেমন একটা অসমসাহসিক অনুভূতি পেয়ে বসেছিল কিটীকে বুঝতে পারছিল না কিটী। ওয়ালটারের নির্লিপ্তভাব তীরের ফলার মতোই যেন তীক্ষ্ণ। নিজেকে বিস্ময়াভিভূত করেই বলে ফেলে কিটী :

—দু একটা সুতির জামা-কাপড় আর একটা শব আচ্ছাদন নিলেই চলবে বোধ হয়, কেমন ?

লক্ষ্য করছিল কিটী ওয়ালটারের মুখের ভাব। বুঝলো ক্রুদ্ধ হয়েছে ওয়ালটার তার তামাসায়।

—তোমার যা যা দরকার ঠিক করে দিতে আয়াকে বলে দিয়েছি।

শুধু একটু মাথা নেড়ে নিজের ঘরে চলে যায় কিটী। পাণ্ডুর হয়ে ওঠে সে।

* *

*

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছলো তারা।

দিনের পর দিন তারা চলছিল চেয়ারে, দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেতের সরু আলি-বাঁধের ওপর দিয়ে। ভোরে যাত্রা সুরু করে দুপুরের উত্তপ্ত রোদে পথে কোন সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে তারা। তারপর দিনান্তে পৌঁছেছে কোন সহরে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে। যাত্রীবাহিনীর প্রথমে কিটীর চেয়ার, তারপর ওয়ালটার, তারপর সর্বশেষে তাদের মালবাহী পরিশ্রান্ত কুলিদের সারি। পেছনে পড়ে রইল গ্রামের পর গ্রাম। কিটীর নজরে পড়েনি কিছুই। সুদীর্ঘ যাত্রাপথের নীববতা ভাঙছিল শুধু বেহারাদের দুটো একটা কথায়, ওদের কণ্ঠের দু এক টুকরো অবোধ্য সংগীতের কলিতে। কিটীর বিক্ষুব্ধ মন সারাপথ শুধু তোলপাড় করছিল চার্লির অফিসের সেই বেদনাময় দৃশ্যের খুঁটিনাটি স্মৃতি। যতই মনে পড়ছিল তাদের সেদিনকার কথাগুলো ততই যেন তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিল এই ভেবে—শেষ পর্যন্ত কেমন নিরর্থক আর অতি সাধারণ স্তরে নেমে এসেছিল তাদের আলোচনা। মন যা চাইছিল সে কথাতো বলতে পারেনি কিটী। যে সুরে বলবে সে কথা, সে সুর যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তখন। সে যদি দেখাতে পারতো কতটুকু সীমাহীন তার প্রেম, কী দুর্বার কামনা তার অন্তরে, আর কতটা নিঃসহায় সে, পারতো যদি বোঝাতে, পারতো কি চার্লি এতটা অমানুষ হতে, পারতো কি তাকে ছেড়ে দিতে এমনি ভাগ্যের স্রোতের টানে। বুঝতে পারেনি কিটী; প্রস্তুত ছিল না সে। তাই নিজের কানকেও বুঝি সে বিশ্বাস করতে পারেনি যখন সে শুনলো সত্যিই তাকে চায় না চার্লি। তাই বুঝি কাঁদতেও পারেনি কিটী প্রাণ খুলে

কেমন এক হতবুদ্ধিতে অসাড় হয়ে পড়েছিল তখন। এরপর সে কেঁদেছে— নির্মমভাবে কেঁদেছে।

রাত্তিরে পান্থশালায় স্বামীর সংগে একই ঘরে বালিশে মুখগুঁজে পড়ে রয়েছে কিটী কান্নার বেগ রোধ করতে—কয়েক ফুট দূরে পাশের বিছানায় জাগ্রত ওয়ালটার পাছে বুঝতে পারে কিছু! কিন্তু দিনের বেলায় পালকির ভেতর পর্দার আড়ালে ভেঙে পড়েছে কিটী। অসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠতে চেয়েছে সে মাঝে মাঝে; কী সে যন্ত্রণা বোঝেনি সে তো আগে। হতাশায় বুক চিড়ে প্রশ্ন জেগেছে মনে—কী অপরাধে এ শাস্তি তার! বুঝে পেলো না, কেন চার্লি ভালোবাসতে পারল না তাকে। মনে হোল কিটীর, বুঝি তারই দোষ; কিন্তু তাকে ভালো লাগার জন্য সবই তো করেছে কিটী। কী সুন্দর কেটেছে হাসির উচ্ছ্বাসে ভরা তাদের দুজনার মিলিত দিনগুলো—তারা তো শুধু প্রেমিকই নয়, বন্ধুও ছিল তারা পরস্পরের। কিছুই বুঝতে পারছিল না কিটী; বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সে। মনকে বোঝালো কিটী, সত্যি সত্যি সে ঘৃণা করে চার্লিকে। কিন্তু আর কোনদিন যদি ওর সংগে দেখা না হয় তার—কী করে সে বাঁচবে, সে তো জানে না। তাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে যদি নিয়ে এসে থাকে ওয়ালটার, ভুল করেছে সে। যা কিছু হোক না, ভয়ে করে না আর কিটী পরিণামে। বেঁচে থাকার কোন অভিলাষই তো নেই আর তার। কিন্তু মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সেই এই জীবনের পরিসমাপ্তি, কেমন যেন কঠিন লাগে ভাবতেও।

ওয়েস্টার্ন রিভারের বুকে স্টিমারে সারাক্ষণ কাটিয়েছে ওয়ালটার বই পড়ে; শুধু খাবার টেবিলেই কখনো বলেছে দু'একটা কথা।

কথা বলেছে এমনি যেন কিটী তার হঠাৎ দেখা অপরিচিতা এক সহযাত্রিনী—সৌজন্যের খাতিরেই শুধু দু একটা এলোমেলো অবান্তর কথা। দুজনার ব্যবধান আরো প্রকট করে তোলার উদ্দেশ্যেই যেন ঐ দুটো একটি কথা।

একটা অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণাতেই বুঝি কিটী বলেছিল চার্লিকে যে, মহামারির দেশে যাওয়ার পরিবর্তে বিবাহ-বিচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে তাকে ওয়ালটার পাঠিয়েছিল শুধু এই কথাই প্রমাণ করতে যে, কত ভীরু কত স্বার্থপর এই চার্লি। কিন্তু কথাটা খুবই সত্যি। নির্মম ব্যঙ্গোক্তির মতোই এই ছলটুকুর আশ্রয় নিয়েছিল কিটী! কী ঘটবে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিল ওয়ালটার আগে থেকেই, তাই কিটী ফিরে আসার আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল আয়াকে। ফিরে এসে ওয়ালটারের দৃষ্টিতে তাই কিটী দেখলো একটা ঘৃণার ইংগিত—লক্ষ্য সে এবং তার প্রেমিক উভয়েই। হয়তো-বা ওয়ালটার নিজের মনেই ভেবেছে যে, সে যদি টাউনসেণ্ড হোত হয়তো কিটীর একটুখানি খেয়াল চরিতার্থ করতে যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হোত না আদৌ। এও সত্যি জানতো কিটী। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরেও কেন কিটীকে এমনি বিপদের মুখে—আতংকে সে কুঁকড়ে উঠেছে জেনেও, ঠেলে নিয়ে চলেছে ওয়ালটার? প্রথমে ছলনা বলেই ধরে নিয়েছিল কিটী। ঠিক রওনা হবার আগে পর্যন্ত—না, আরো পরে যখন স্টিমার ছেড়ে পালকি চড়ে এগিয়ে চলেছিল তারা—ভাবছিল কিটী, হয়তো-বা এইবার তার স্বভাবসুলভ মধুর হাসি হেসে বলবে ওয়ালটার, কাজ নেই আর তার গিয়ে। কী ছিল ওয়ালটারের মনে কোন ইংগিত পায়নি কিটী। নিশ্চয়ই তার মৃত্যু কামনা করেনি ওয়ালটার। সত্যিই যে সে ভালোবাসে তাকে। প্রেম কী জিনিস এতদিনে বুঝেছে কিটীও, তাই মনে পড়ে তার ওয়ালটারের প্রতিদিনকার সেই আকুতি ভরা টুকরো

টুকরো কথা। ফরাসীদের ভাষায়, ওয়ালটারের জীবনের ব্যারো-মিটার হোল কিটী। ওয়ালটার আর তাকে ভালোবাসে না এও কি সম্ভব! নির্দয় ব্যবহার পেয়েছে বলে কি ভালোবাসাও দূর হয়ে গেছে? চার্লির কাছ থেকে যতটুকু নির্মম ব্যবহার কিটী পেয়েছে ততটুকু কষ্টও তো ওয়ালটারকে দেয়নি সে। তবুও কিটী, তার স্বরূপ জেনেও, সামান্য ইংগিতে সব কিছু পরিত্যাগ করে চার্লির বাহুবন্ধনে ঝাঁপিয়ে পড়তে এখনো প্রস্তুত। কিটীকে ত্যাগ করেছে চার্লি, কোন মমতা হয়তো নেই তার জন্য আর; নির্মম ব্যবহার সে পেয়েছে চার্লির কাছে। তবুও কিটী ভালোবাসে তাকে।

কিটীর মনে হয় হয়তো একটু সময়ের অপেক্ষা, তারপর আগে হোক, পরে হোক ক্ষমা তাকে করবেই ওয়ালটার। ওয়ালটারের ওপর কিটীর যতটুকু প্রভাব এখনো আছে তা থেকে এ আত্ম-বিশ্বাস আছে তার যে, ওয়ালটারের মন থেকে এখনো মুছে যায়নি সে। তাকে ভালোবাসা যে ওয়ালটারের একটা বড় দুর্বলতা। অন্তরে অন্তরে কিটী অনুভব করে,তাকে ভালো না বেসে পারবে না ওয়ালটার। কিন্তু এই মুহূর্তে নিশ্চিত হতে পারছে না কেন কিটী? সেই চটিতে সন্ধ্যাবেলায় ব্ল্যাকউডের উঁচু-পিঠ চেয়ারে বসে হারিকেনের আলোতে যখন বই পড়ছিল ওয়ালটার, কিটী লক্ষ্য করছিল তাকে নির্নিমেষ নয়নে। তক্তপোষে শুয়ে ছিল কিটী, বিছানাটা পাতা হয়নি তখনো, হারিকেনের আলোর ছায়াটা পড়েছিল ওয়ালটারের ওপর: সোজা হয়ে বসার দরুন ওয়ালটারের মুখের চেহারা কেমন যেন কঠিন দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু ভাবতেও কেমন অবাক বিস্ময় লাগে, কী করেই-বা ঐ কাঠিন্যটুকু মিলিয়ে যায় একটুখানি মিষ্টি হাসির ছোঁয়ায়! গভীরভাবে নিমগ্ন ছিল সে বইয়ের পাতায়—কিটীর সাহচর্যবোধটুকুও বুঝি ছিল না তার, যেন সহস্র যোজন দূরে তখন কিটী। কিটী লক্ষ্য করছিল, পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছিল ওয়ালটার, লাইনের পর লাইনের ওপর দিয়ে

ছুটে চলেছিল তার দৃষ্টি। নিশ্চয়ই কিটীর কথা ভাবছিল না ওয়ালটার। টেবিলে খাবার দিয়ে যাবার পর বই সরিয়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সে কিটীর দিকে। বুঝতে পারেনি সেই আলোতে কী করে তার মুখের ভাব এতটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল,—কেমন একটা বিতৃষ্ণার প্রকাশ যেন ঐ চোখে। হ্যাঁ, ওয়ালটারের ঐ দৃষ্টি চমকে দিয়েছিল কিটীকে। কিটীর মনে হয়েছিল তখন, তবে কি ওয়ালটারের অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে গেছে একেবারে। তবে কি সত্যি ওয়ালটার কিটীর মৃত্যু কামনা নিয়েই এসেছে এখানে! অসম্ভব, এ হতে পারে ভাবতেও পারে না কিটী! ও তো পাগলের কাজ! তবে কি……। কিটীর প্রতিটা ধমনিতে কেমন একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায় সংগে সংগে—প্রকৃতিস্থ নয় ওয়ালটার?

চলতে চলতে নির্বাক বেহারাগুলো সবাক হয়ে ওঠে হঠাৎ। তাদেরই একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে অবোধ্য ভাষায় কী যেন বলে কিটীকে—ইসারায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিটীর। ফিরে তাকায় কিটী সেদিকে, দেখে দূরে পাহাড়ের চূড়ায় একটা তোরণ। এ কদিনে কিটী বুঝতে পেরেছে এগুলো কোন সৌভাগ্যবান পণ্ডিত অথবা পুণ্যশীলা বিধবার সম্মানার্থে স্মৃতিচিহ্ন; এ রকম অনেকগুলো সে দেখে এসেছে রাস্তায়। কিন্তু এটা তখন পশ্চিমদিগন্তে অস্তমুখী সূর্যের আলোতে সিলহুট, দেখতে অপূর্ব সুন্দর। এমনটি চোখে পড়েনি আর। তবু কী জানি কেন একটা অসোয়াস্তিবোধ আসে কিটীর মনে। নিগূঢ় কিসের যেন আবছা একটা ইংগিত লুকিয়ে আছে এর পেছনে; অন্তরে উপলব্ধি করতে পারে কিটী, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না এ অনুভূতি। তবে কি ভাবী

অমংগলের একটা অস্পষ্ট ইংগিত অথবা শুধু একটা দৃষ্টিভ্রম! একটা বাঁশ বনের পাশ দিয়ে পথ চলে তারা—বাঁশগুলো মাটি ছুঁয়ে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সরু পথটা তাদের গতিরোধ করে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় যদিও হাওয়া নেই একটুও, তবু যেন বাঁশবনের সবুজ সরু সরু পাতাগুলো কেঁপে ওঠে মৃদু মৃদু। কিটী অনুভব করে কে যেন লুকিয়ে আছে এদের পেছনে, যেন লক্ষ্য করছে তাকে। পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছয় তারা. ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেছে তখন। দুলতে দুলতে দুলকি তালে এগিয়ে চলেছে বেহারাগুলো। পাহাড়ের ওপরটা ছেয়ে আছে ছোট ছোট সবুজ ঢিপিতে; একটার গায়ে যেন আর একটা, খুবই কাছাকাছি ভাটার পর বেলাভূমির মতোই যেন ছিড়ে পড়েছে মাটির ওপর। চিনতে পারে কিটী এগুলো। প্রতিটি জনবহুল সহরের কাছে এসে এমনি সে দেখেছে আরো অনেকবার—কবরখানা। এতক্ষণে যেন অনুভব করে কিটী, কেন বেহারাগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল পাহাড়ের মাথায় ঐ তোরণটার দিকে। তাদের যাত্রা পথের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তারা।

সেই তোরণের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায় তারা, বেহারাগুলোও ঘাড় বদলে নেয় একটু থেমে। তাদেরই একজন একটুকরো নোংরা কাপড় দিয়ে মোছে তার মুখের ঘাম। সরু রাস্তাটা এঁকে বেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে। দুই ধারেই গায় গায় আঁটা বাড়ির সারি। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ কেমন উত্তেজনায় যেন কিচির মিচির করে ওঠে বেহারাগুলো—এক লাফে রাস্তায় দেয়ালের গা ঘেঁসে ছিটকে দাঁড়ায় তারা। মুহূর্তেই উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারে কিটী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিচির মিচির চলছে ওদের; সেই সময় তাদের পাশ কেটে দ্রুত বেরিয়ে গেল জনাকয়েক কৃষাণ; তাদের কাঁধে একটা আনকোরা নূতন অরঞ্জিত শবাধার, ঘনায়মান অন্ধকারেও চিক চিক করছে শবাধারের

সাদা কাঁচা কাঠ। ভয়ে তুরু তুরু কম্পন অনুভব করে কিটী তার বক্ষপিঞ্জরে। শবাধার এগিয়ে যায়, কিন্তু বেহারাগুলো তখনো নিশ্চল। এগিয়ে যাবার ইচ্ছাকে ধরে আনতে পারছে না তারা। পেছন থেকে আসে কিসের একটা চিৎকার—এগিয়ে চলে তারা আবার। কোন কথা বলে না আর। আরো মিনিট কয়েক এগিয়ে মোড় ঘুরে ঢুকে যায় একটা ফটকেব ভেতর। বেহারাগুলো চেয়ার নামিয়ে নেয় ঘাড় থেকে।

পৌঁছে গেছে কিটী এবার।

বাংলো বাড়ি। বসবার ঘরে গিয়ে বসে কিটী। মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে আসে কুলিরা এক এক করে। বাইরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেয় ওয়ালটাব কোনটা বাখবে কোথায়। বড় ক্লান্ত আজ কিটী। চমকে ওঠে হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠে:

—ভেতরে আসতে পারি?

আরক্তিম হয়ে ওঠে কিটী। পবক্ষণেই আবার কেমন নিস্প্রভ হয়ে যায় যেন। অবসন্ন চিত্তে অচেনা লোকেব সংগে আলাপ করতে উৎসাহ বোধ করে না কিটী। লম্বা নিচু ঘবটায় শুধু একটা ঢাকা ল্যাম্পেব আলো, তারই আবছা অন্ধকারেব ভেতর থেকে কে যেন বেরিয়ে আসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে।

—আমার নাম ওয়াডিংটন। আমি এখানকার ডেপুটি কমিসনাব।

—ও, কাস্টমসের তো। আমি জানি। আপনার কথা শুনেছি।

আবছা অন্ধকারে কিটীর মনে হয় ভদ্রলোক দেখতে রোগা, লম্বায় কতকটা তারই মতো, মাথায় টাক, ছোট মুখ।

—পাহাড়ের ঐ নিচে আমার বাসা। আপনি ওদিক দিয়ে আসবার সময় আমার বাড়ির পাশ দিয়েই এসেছেন। খুব ক্লান্ত

হয়ে পড়েছেন বোধ হয়। ভাবলুম আমার বাড়িতে খেতে যাওয়া কষ্টকর হবে হয়তো, তাই এখানেই ব্যবস্থা করেছি আপনাদের—আমিও অবশ্যি আপনাদের সংগেই ভাগ বসাবো আজকের রাত্তিরটায়।

—সত্যি, ভাবি খুশি হলুম কিন্তু।

—দেখবেন, বাবুর্চিটা হয়তো খুব খারাপ হবে না। ওয়াটসনের বেয়ারাগুলোকেও আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছি।

—এখানে যে মিশনারি ডাক্তার ছিলেন তিনিই বোধ হয় ওয়াটসন ?

—হ্যাঁ। ভারি ভালো লোক ছিল ঐ ওয়াটসন। কালকে ওর সমাধিতে নিয়ে যাবোখন আপনাদের।

—খুবই খুশি হবো তাহলে। একটু মৃদু হেসে বলে কিটী।

ওয়ালটার আসে সেই সময়। কিটীর ঘরে আসবার আগেই তার সংগে পরিচয় করে এসেছিল ওয়াডিংটন।

—মিসেসকে বলছিলুম আজকে আপনাদের নিমন্ত্রিত আমি। ওয়াটসনের মৃত্যুর পর কথা বলবার লোকই পাচ্ছিলুম না ঐ কনভেন্টের ভিক্ষুনীদের ছাড়া – আর আমি আবার ফরাসী ভাষায় তেমনি ওস্তাদ ! তাছাড়া নির্দিষ্ট দু একটা বিষয় ছাড়া কথা বলার কিছুই নেইও ওদের সংগে।

—বেয়ারাকে ড্রিংক নিয়ে আসতে বলে এলুম। বলে ওয়ালটার।

সোডা আর হুইস্কি নিয়ে আসে বেয়ারা। বেশ কিছুটা ঢেলে নেয় ওয়াডিংটন, কিটী লক্ষ্য করে। কথা-বলার ধরন আর মনের হালকা-ভাব থেকেই ওকে কিছুটা বেসামাল বলেই মনে হোল কিটীর।

—একেই বলে বরাত। যাক, ডাঃ ফেন, আপনার কাজের ব্যবস্থা সব ঠিক করাই আছে। লোকগুলো সব মরছে মশামাছির মতো। ম্যাজিস্ট্রেটের মাথা খারাপ হবার জোগাড় ; আর বেচারা কর্নেল ইয়ু লুটতরাজ বন্ধ করতেই একেবারে নাজেহাল। শিগগির

একটা ব্যবস্থা না করলে ঘরে বসেই মরতে হবে সবাইকে এই আমি বলে রাখলুম। ভিক্ষুনীদের পাঠিয়ে দেবার জন্য খুব চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু কিছুতেই যাবে না ওরা। সবাই চায় মরে শহীদ হবে। মরুকগে সব, আমি আর কী করবো বলুন।

হালকা ভাবে কথাগুলো বলে ওয়াডিংটন। তার কথাগুলোর প্রচ্ছন্ন কৌতুকে কেমন হাসি পায় কিটীর।

—কিন্তু আপনি যান নি কেন? জিজ্ঞাসা করে ওয়ালটার।

—তা কী আর বলি বলুন, আমার লোকদের আধাআধিই প্রায় এর মধ্যে সাবাড়; বাকিগুলোও পড়া আর মরার অপেক্ষায়। সব কিছু বিলি-ব্যবস্থার জন্যও তো কাউকে থাকা দরকার।

—টিকা নিয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, তা আর বাকি রাখিনি। ওয়াটসনই দিয়েছিল। নিজেও তো নিয়েছিল, কিন্তু ওতে আর লাভ হোল কই? বেচারা!

ফিরে তাকায় ওয়াডিংটন কিটীর দিকে। খুশির রেখা ওর সারা মুখে। আবার বলে:

—একটু সাবধান থাকলে কিন্তু ভয় নেই কিছু। দুধ আর জল ফুটিয়ে নেবেন। কাঁচা ফল আর অসিদ্ধ সবজি, খবরদার, খাবেন না কখনো। কিছু গ্রামাফোন রেকর্ড সংগে এনেছেন তো?

—না। উত্তর দেয় কিটী।

—খুবই দুঃখের কথা। আমি আশায় ছিলুম নিশ্চয়ই আপনি নিয়ে আসবেন। অনেকদিন আনাতে পারিনি, পুরনোগুলো আর শুনতে ভালো লাগে না।

বেয়ারা খবর দিয়ে যায় তাদের খাবার তৈরি।

—পোশাক-টোশাক আর বদলাবেন না এ রাত্তিরে নিশ্চয়ই। আমার চাকরটাও মারা গেছে গেল হপ্তায়। এবার যেটাকে নিয়েছি সে আবার এক নিরেট বোকা। কাজেই এ সবের বালাই আর রাখিনি। বলে ওয়াডিংটন।

—আমি শুধু টুপিটা রেখে আসছি। কিটী বলে।

পাশেই কিটীর ঘর। ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। একটা ঝি কিটীর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখছে। ঘরে ছোট একটা ল্যাম্পের আলো।

ডাইনিং রুমটা খুবই ছোট। সারা ঘর জুড়ে একটা বড় টেবিল। দেয়ালের গায়ে খোদাই করা বাইবেলের নানা কাহিনীর ছবি ও বাণী।

ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট মোমবাতি ঝুলছে সিলিং থেকে। সেই আলোতেই ওয়াডিংটনকে ভালো করে লক্ষ্য করে কিটী। মাথায় টাক দেখে বেশ বয়স্ক বলেই মনে হচ্ছিল ওয়াডিংটনকে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করে কিটীর মনে হোল বয়স চল্লিশও পার হয়নি এখনো। উঁচু প্রশস্ত ললাটের নিচে ছোট্ট চকচকে মুখটি; কোন রেখার চিহ্নও নেই ওতে। বাঁদরের মুখাকৃতির মতোই কুৎসিৎ ওর মুখের চেহারা, কিন্তু কুৎসিৎ হলেও কেমন একটা কান্তি আছে চোখে মুখে। ছোট ছোট উজ্জ্বল নীলাভ ওর দুটি চোখ। ভ্রূ দুটো খুব সুন্দর, বেশ হালকা আমুদে।

একটু পর পর মদের গ্লাস তুলে নেয় ওয়াডিংটন। ডিনার শেষ হবার আগেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সে। একটু বেসামালই যেন হয়ে পড়ে ওয়াডিংটন। মাতাল হলেও ভদ্রতার সীমা লজ্ঘন করেনি। ঘুমন্ত মেষপালকের সুরাধার অপহরণকারী বনদেবতা স্যাটার-এর মতোই উল্লসিত হয়ে ওঠে সে।

হংকং এর কথা জিজ্ঞাসা করে ওয়াডিংটন। অনেক বন্ধু আছে তার সেখানে—তাদের সবার কথা জিজ্ঞাসা করে সে। এক বছর আগে রেস খেলতে হংকং গিয়েছিল। রেসের ঘোড়া আর ঘোড়ার মালিকের কথাও আলোচনা করে ওয়াডিংটন।

—ভালো কথা, টাউনসেণ্ডের খবর কী? কলোনির সেক্রেটারি হচ্ছে নাকি সে? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ওয়াডিংটন।

একটু রক্তিম হয়ে ওঠে কিটী। ওয়ালটার লক্ষ্য করেনি।

—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বলে ওয়ালটার।

--বেশ চালু লোক কিন্তু ও।

—আপনি তাঁকে চেনেন নাকি? ওয়ালটার জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ, বেশ ভালোই চিনি। একবার দেশ থেকে একই জাহাজে ফিরেছিলুম আমরা।

নদীর ওপার থেকে ভেসে আসে কাঁসরের আওয়াজ আর পটকার ফটফটানি। ঐ একটু দূরেই তো সহরটা একটা ত্রাসের কবলে নিমজ্জিত। নিষ্ঠুর আর আকস্মিক মৃত্যুর হিমেল পদক্ষেপ ছুটে চলেছে সহরের আঁকা বাঁকা রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে। ওয়াডিংটন তখন বলছে লণ্ডনের কথা। থিয়েটারের গল্প। অধুনা কোথায় কী বই চলছে সে খবরও সে রাখে। সেবার দেশে গিয়ে কী কী বই দেখেছিল তারও বিস্তারিত বর্ণনা দেয় সে। হাস্যরসিক অভিনেতার কথা মনে করে হেসে ওঠে, আবার পরমুহূর্তেই কোন সুন্দরী অভিনেত্রীর রূপের কথা স্মৃতিপটে আসার সংগে সংগেই বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিশ্বাস। তার কোন এক নিকট আত্মীয় এক বিশিষ্ট অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছে—এটা তার কাছে একটা গর্বের বস্তু। সেই বিশিষ্ট আত্মীয়ার সংগে সে লাঞ্চ খেয়েছে; ওঁর একটা ছবিও নাকি আছে তার ঘরে। তার বাড়িতে গেলে কিটীকে দেখাবে সেই ছবিটা।

নিস্পৃহ কৌতুক দৃষ্টি নিয়ে ওয়ালটার তাকিয়ে থাকে অতিথির দিকে। তাকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি ওয়াডিংটন। সৌজন্য আর ভদ্রতা বজায় রাখার খাতিরেই ওয়ালটার এই আলোচনায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে যে তার কোন জ্ঞান নেই এ-কথাটা কিটী জানে। ওয়ালটারের ঠোঁটের কোণে মৃদু

হাসির রেখা। একটা অজানা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে কিটী। এই সন্ত্রস্ত সহরের বুকে মৃত মিশনারির বাড়িটায় তারা সারা দুনিয়া থেকে যেন বহুদূরে বিচ্ছিন্ন। তিনটি নিঃসংগ প্রাণী, অপরিচিত অচেনা।

ডিনার শেষ হওয়ার সংগে টেবিল ছেড়ে দাঁড়ায় কিটী।

—আমি উঠলুম, কিছু মনে করবেন না। শুতে যাবো, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

—আমিও উঠছি। ডাক্তারও এবার শুতে যাবেন নিশ্চয়ই। কালকে কিন্তু খুব ভোরেই বেরুতে হবে। বলে ওয়াডিংটন।

কিটীর সংগে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে ওয়াডিংটন। নেশায় তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আরো।

—আমি এসে আপনাকে ডেকে নেবো। ম্যাজিস্ট্রেট আর কর্নেল ইয়ু-এর ওখানে আমিই নিয়ে যাবোখন আপনাকে—সেখান থেকে কনভেণ্ট। আপনার সব কিছু ব্যবস্থাই করা আছে।

বলে বেরিয়ে যায় ওয়াডিংটন।

দুঃস্বপ্নে জর্জরিত হয়ে সারাটা রাত্রি কাটালো কিটী। সে যেন চলেছে সেই চেয়ারে, দুলছে তার সর্ব শরীর বেহারাদের দ্রুত পদক্ষেপের তালে তালে। সহরের পর সহর পেছনে পড়ে থাকে তার—সব যেন কেমন আবছা আবছা। জনতা আসে তাকে ঘিরে, দৃষ্টিতে তাদের অপূর্ব বিস্ময়। অপরিসর আঁকা বাঁকা রাস্তাগুলোর ধারে ধারে নানারকম পণ্যে ভরা খোলা দোকানের সারি। সমস্ত চলাচল যেন স্তব্ধ হয়ে যায় তাকে দেখে, ভুলে যায় ক্রেতা বিক্রেতা নিজ নিজ কাজ। তারপর সে পৌঁছয় সেই স্মৃতি তোরণের কাছে। তোরণের বিরাট বহিরংগনে যেন

আসে একটা দানবিক প্রাণ স্পন্দন ; প্রতিটা এলোমেলো রেখা বুঝি রূপান্তরিত হয়ে যায় হিন্দু দেবমূর্তির আন্দোলিত বাহুর মতো। সেই তোরণের নিচ দিয়ে অগ্রসর হতেই ভেসে আসে একটা অট্টহাসি। তখনই চার্লি টাউনসেণ্ড ছুটে এলো তার কাছে, বাহুবন্ধনে তুলে নিলো তাকে চেয়ার থেকে। টাউনসেণ্ড বললে,যা করেছে সব ভুল, সে কিটীকে কষ্ট দিতে চায়নি একটুও, ভালোবাসে কিটীকে এখনো, বাঁচবে না সে কিটীকে ছাড়া। তারপর চুম্বনের মধুর স্পর্শ অনুভব করে কিটী তার ঠোঁটের ওপর--আনন্দের উচ্ছ্বাসে কেঁদে ওঠে কিটী। কেন চার্লি তার ওপর এত নিষ্ঠুর হয়েছে জিজ্ঞাসা করল ; যদিও জানে কোন অর্থ হয় না একথার। তারপর আচমকা একটা কর্কশ চিৎকার—ছিটকে পড়ল দুজন দুদিকে। তাদের মাঝখান দিয়ে দ্রুতগতিতে নীরবে বেরিয়ে গেল ছিন্নবস্ত্র পরিহিত কয়েকটি কুলি ; কাঁধে একটি শবাধার।

সচকিতে জেগে ওঠে কিটী।

খাড়া পাহাড়ের একটা টিলার মাঝামাঝি তাদের বাংলো। জানলার ধারে বসে তাকিয়ে থাকে কিটী. নিচে ক্ষুদ্র অপরিসর নদীটি, আর সামনে নদী পেরিয়ে ঘুমন্ত ঐ সহর। সবে ভোর হয়ে এসেছে ; নদীর বুক থেকে একটা ঘন কুয়াশা উঠে জড়িয়ে রয়েছে সিমের ভেতরকার দানাগুলোর মতোই অতি কাছাকাছি নোঙর করা নৌকোগুলো। ভৌতিক আবছায়ায় রহস্যময় ঠেকছে শত শত নৌকোর নিস্তব্ধ অবস্থিতি। নৌকোর মাঝিগুলোও বুঝি কোন এক মায়ায় সম্মোহিত—ঘুমে নয়, স্তব্ধ মূক হয়ে আছে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভীষণ কিছুর আবেশে।

প্রভাত হয়ে এলো। সূর্য কিরণের ছোঁয়াচ লেগে ঝলমলিয়ে ওঠে ঐ কুয়াশা ; নির্বাপিত নক্ষত্রের ওপর প্রেত-শুভ্র তুষারেরই মতো। নিচে নদীর বুকে তখন ছড়িয়ে পড়েছে আলো, তারই আভায় অস্পষ্ট দেখা যায় অসংখ্য ডিঙির ক্ষীণ রেখা আর

মাস্তুলের ঘন অরণ্য। অরণ্য পেরিয়ে সামনে ভেসে ওঠে একটা আলোর অচলায়তন; দৃষ্টি ফিরে আসে প্রতিহত হয়ে। কিন্তু হঠাৎ যেন ঐ শুভ্র কুহেলির বুক চিড়ে ভেসে ওঠে একটা রহস্যময় প্রেতপুরী। সর্ব-প্রকাশক সূর্যের আলোতেই শুধু প্রতিভাত নয়, ও যেন বেরিয়ে এসেছে কোন অসীম মহাশূন্য থেকে এক যাদুদণ্ডের স্পর্শে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নদীর অপর পারে যেন একটা নিষ্ঠুর বর্বর জাতির প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু যাদুকরেরই দণ্ডের দ্রুত স্পর্শে একটুকরো রঙিন প্রাচীব মুকুটের মতো উঠে বসলো প্রেতপুরীর চূড়ায় -পর মুহূর্তেই দিগন্ত বিস্তৃত কুয়াশার বুক চিড়ে সূর্যের পীতাভ কিরণ স্পর্শে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্তবকে স্তবকে সবুজ আব হলুদ রঙের কতগুলো ছাদের সমষ্টি। ভেসে ওঠে ওদের বিরাটত্ব -কিন্তু আকার কিছুই মেলে না, শৃঙ্খলা যদি-বা কিছু থাকে নজরে পড়ে না একটুও; সবই খাপছাড়া অসংযত কিন্তু অকল্পনীয় প্রাচুর্যে প্রখর। দুর্গ নয় এটা, মন্দিরও নয়; এটা বুঝি কোন দেবাধিপতির মায়া প্রাসাদ, মানুষের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। সমস্তই কাল্পনিক, বিদকুটে, বাস্তব মানুষের ছোঁয়া নেই কোথাও—স্বপ্নে বোনা মায়াজাল।

অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে কিটীব গাল বেয়ে। তাকিয়ে থাকে সে অপলক চোখে—হাত দুটো বুকের ওপর ন্যস্ত, রুদ্ধ নিশ্বাসে মুখটাও একটু খোলা। এত হালকা মনে হয়নি নিজেকে কোনদিন; তার দেহটা বুঝি শুধু একটা খোলসের মতো পড়ে আছে তারই পায়ের তলায়; বিদেহী মনে হোল নিজেকে। এই তো পরম রূপ—সুন্দরের আবির্ভাব। এই চরম অনুভূতিটুকু মেনে নেয় কিটী, যেমনি মুখে তুলে নেয় বিশ্বাসীরা রুটির টুকরো ঈশ্বরেরই অংশ বলে।

অতি প্রত্যুষে বেরিয়ে ওয়ালটার টিফিনের সময় আসতো শুধু আধঘণ্টার জন্যে ; ডিনারের আগে আর ফিরতো না বাংলোয়। কিটীর বড় একলা মনে হোত। দিন কতক বাংলো থেকে নড়েই নি। বড় গরম, দিনের অধিকাংশ সময় লম্বা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বই হাতে বসে থাকতো কিটী জানলার ধারে। তুপুরের খর রৌদ্রে মিলিয়ে যেতো সেই মায়া প্রাসাদের রহস্যটুকু। সহরের প্রাচীরের গায় একটা ভগ্ন জীর্ণ মন্দির ছাড়া আব কিছু দেখা যেতো না তখন। তবু তুচ্ছ মনে হোত না তার কাছে—অপরূপের অনুভূতিতে দেখেছিল যে সে একবার! কখনো সূর্যোদয়ে, কখনো সূর্যাস্তে, আবার কখনো-বা গভীর নিশীথে কিটী ফিরে পেতো সেই পরম রূপের দর্শন। যা মনে হোত তার কাছে একটা বিরাট প্রেতপুরী সে আর কিছু নয়– নগব প্রাচীর ; আর তারই পুঞ্জীভূত অন্ধকার গাত্রের ওপর অবিরত ন্যস্ত থাকতো কিটীর বিস্ফারিত দৃষ্টি। সেই প্রাচীরেরই পেছনে মহামারির করাল কবলে সহরটি। ·

এলোমেলো খবরে জানতো কিটী কী ভীষণ ব্যাপার চলেছে ঐ সহরের বুকে। ওয়ালটার তাকে বলেনি কিছু। জিজ্ঞাসা করলে—(তা না হলে তার সংগে কদাচিত কথা বলতো ওয়ালটার) নিস্পৃহ পরিহাস্যে যে জবাব দিয়েছে, শুনে কিটীর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে ভয়ে শির শির করে কী যেন নেমে গেছে। কিটী শুনেছে ওয়াডিং-টনের কাছে, আর খবর দিয়েছে তার আয়া। শত শত লোক মরছে প্রতিদিন ; রোগের কবলে যে পড়েছে কেউ উদ্ধার পায় নি। পরিত্যক্ত মন্দিরগুলো থেকে দেবতাদের নামিয়ে এনেছে তারা রাস্তার ওপর। পূজা বলি সবই চলছে দেব দেবীর কাছে, কিন্তু

মহামারি অপ্রতিরোধ্য তবুও। মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে -- কবর দেবার লোক নেই। কোন কোন পরিবার হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শেষ-কৃত্য সাধনের জন্যও হয়তো কেউ নেই আর। সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কর্মনিষ্ঠাই এখনো রোধ করে রেখেছে দাঙা হাঙামা ও লংকাকাণ্ড। কবর দেবার লোকের অভাব যেখানে সেখানেই তিনি পাঠিয়েছেন তার সৈন্যদের। রোগাক্রান্ত একটি বাড়িতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করায় নিজহাতে গুলি করে হত্যা করেছেন সৈন্যবাহিনীর এক অফিসারকে।

ভয়ে সন্ত্রস্ত কিটী --ভেঙে পড়েছে কখনো, সারা অংগ তার কেঁপে উঠেছে হয়তো। সাবধানে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা কম, কথাটা বলা সহজ; কিন্তু কিটী যে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পালিয়ে যাবার উদ্ভট পরিকল্পনা কখনো মাথায় আসে তার। পালিয়ে যাবে, পালিয়ে যাবে সে নিরাপদ স্থানে কোথাও। যে ভাবে আছে কোন কিছু সংগে না নিয়ে, এমন কি সম্পূর্ণ একা পালিয়ে যেতেও প্রস্তুত কিটী ওয়াডিংটনের কথাও ভাবে সে। সব কথা খুলে বলবে কিটী ওয়াডিংটনকে, অনুরোধ করবে তাকে হংকং পৌঁছে দিতে। স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে স্বীকার করবে ভয় পেয়েছে সে। ঘৃণা করলেও অনুকম্পা দেখাবার মতো এতটুকু মনুষ্যত্ব আছে ওয়ালটারের নিশ্চয়ই।

কিন্তু সে হয় না। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? মার কাছে সে যাবে না। তার মা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবেন বিয়ে হয়ে যাবার পর আর কোন দায়িত্বই নেই তাঁর। তাছাড়া মার কাছে যাবার ইচ্ছেও নেই কিটীর। চার্লির কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু চার্লিও যে তাকে চায় না! চার্লির সামনে হঠাৎ গিয়ে দাঁড়ালে কী বলে ফিরিয়ে দেবে কল্পনা করতে পারে কিটী। কল্পনায় দেখতে পায় চার্লির মুখে বিরক্তির ছাপ,

সুন্দর চোখের দৃষ্টির পেছনে একটা কাঠিন্যের আভাস; বলবার মতো কোন ভাষাই খুঁজে পাবে না চার্লি। ভাবতে ভাবতে হাতের মুষ্টি দৃঢ় হয়ে আসে কিটীর। যে অপমান তাকে করেছে চার্লি ততটুকু অপমান তাকেও করতে পারলে বুঝি খুশি হোত কিটী। কখনো আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিটী। ওয়ালটার ডাইভোর্স করলেই হয়তো মংগল হোত কিটীর; চার্লির সর্বনাশ করবার সুযোগ পেলে নিজের সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত সে। আবার চার্লির কোন কোন কথা মনে করে লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে কিটী।

ওয়াডিংটনকে একদিন একা পেয়ে চার্লি প্রসংগে কিটী আলাপ তোলে। তাদের এখানে পৌঁছবার দিনই চার্লির কথা উত্থাপন করেছিল ওয়াডিংটন। স্বামীর পরিচিত বলেই ওকে জানে কিটী, এইটুকু ভাণ সে করেছিল সেদিন।

—ঐ চার্লিকে আমি কিন্তু আমল দিইনি কোন দিন। সব সময় ওকে বড় অসহ্য মনে হয়েছে আমার। বলে ওয়াডিংটন।

স্বভাবসিদ্ধ সহজহাসি তামাশায় উত্তর দেয় কিটী—

—আপনাকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন দেখছি। সবাই তো বলে ওঁর চেয়ে জনপ্রিয় লোক আর হংকংএ নেই।

—সে আমি জানি। ঐটাই যে ওর বড় পুঁজি। পপুলারিটির একটা নিজস্ব শাস্ত্র তৈরি করেছে টাউনসেণ্ড। ওর একটা বড় গুণ যখনই যার সংগে মেশে তাকে বুঝিয়ে দেয় তুনিয়ায় তাকে ছাড়া আর কাউকেই সে চায় না। নিজের ক্ষতি না করে অন্যের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত সে সব সময়। কারো জন্য যদি কিছু না-ও করে তবু বুঝিয়ে দেয় নিতান্ত অসম্ভব বলেই কিছু করতে পারেনি।

—তাহলে এটা তাঁর চরিত্রের একটা মস্ত গুণ বলবো।

—হ্যাঁ, গুণ। আমার বিশ্বাস এই গুণই শেষ পর্যন্ত বড্ড ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। কী জানেন, স্বভাবে মাধুর্যের অভাব ঘটলেও নিষ্ঠার প্রাচুর্যের পরিচয় যদি কোথাও মেলে, তার সংস্পর্শে স্বস্তি পাওয়া যায় বেশি। অনেক বছর থেকে চার্লস টাউনসেণ্ডকে আমি জানি, দু একবার তার আসল রূপও ধরা পড়েছে আমার কাছে। শুল্ক বিভাগের একজন সামান্য কর্মচারী হিসেবে আমি ধর্তব্যের ভেতর ছিলাম না অবশ্যি, তবু আমি ভালোই জানি মনে প্রাণে টাউনসেণ্ড নিজেকে ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কাউকে পরোয়া করে না।

কিটী চেয়ারে গা এলিয়ে সহাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। বিয়ের আংটিটা আঙুলে ঘুরপাক খাওয়ায় বারবার।

—তবে এমনি চালিয়ে যাবে টাউনসেণ্ড। অফিসের কায়দা-কানুন আনাচ-কানাচ সবই জানা আছে তার। আমার বদ্ধমূল ধারণা মরবার আগে ওকে 'ইওর-একসেলেন্সি' বলে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেই হবে, এ অবধারিত।

—অনেকেরই কিন্তু ধারণা এটা তাঁর প্রাপ্য। তাঁর কর্মক্ষমতা আছে এও সবার বিশ্বাস।

—কর্মক্ষমতা! একদম বাজে কথা। চার্লি একটি এক-নম্বরের অপদার্থ। যেন সব কিছুই নিজের প্রতিভা বলেই করছে সে, এইটাই বুঝাতে চায়। কিন্তু মোটেই তা নয়। তবে সে একজন ইউরেশিয়ান কেরানির মতো পরিশ্রমী, একথা অস্বীকার করবো না।

—কিন্তু টাউনসেণ্ড বুদ্ধিমান বলে সুনাম অর্জন করলেন কী করে!

—জানেন, এমন অনেক গর্দভ আছে এই দুনিয়ায় যাদের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যদি একটুখানিও পিঠ চাপড়ে শুধু বলে অনেক কিছু করবে তাদের জন্য, তাহলেই তাকে ধরে নেবে খুব বুদ্ধিমান বলে। তারপর টাউনসেণ্ড-এর আর এক সুবিধা তার

স্ত্রী, বেশ কাজের লোক মহিলা। বেশ পরিষ্কার তাঁর মাথা, আর ওঁর উপদেশও গ্রহণ করবার মতো। চার্লি টাউনসেণ্ড যতদিন ওঁর ওপর নির্ভর করবে ততদিনই সে নিরাপদ—আর সরকারি চাকরিতে প্রতিষ্ঠার জন্য এইটাই সবার আগে দরকার। গভর্নমেণ্ট কখনো চতুর লোক চায় না; বুদ্ধিমান লোকের মাথায় আইডিয়া আছে, আর আইডিয়া থাকলেই গোলযোগের আশংকা বেশি; ওদের চাই ও-রকম লোক যার আছে আকর্ষন ও গোছাবার ক্ষমতা। আরো একটা দরকার; সেটা হোল, যার উপর নির্ভর করবে ভুল করবেনা সে কখনো। তবে এটা খুবই সত্যি চার্লি গাছের ডগায় উঠবেই উঠবে একদিন।

—আমি কিন্তু খুবই অবাক হচ্ছি, আপনি ওকে এতটা অপছন্দ করেন কেন?

—কই, আমি তো তাকে অপছন্দ করি না!

—তবে তাঁর স্ত্রীকে আপনি বেশি পছন্দ করেন বোধ হয়? একটু মুচকি হাসে কিটী।

—আমি প্রাচীনপন্থী অতি নগণ্য লোক, একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে অবশ্যিই আমি সম্মান করে থাকি।

—বংশের যতটুকু কৌলিন্য আছে মিসেস টাউনসেণ্ডের, পোশাক পরিচ্ছদে ততটুকু থাকলে বোধহয় ভালো হোত আরো, কী বলেন?

—কেন, ভালো পোশাক পরেন না নাকি? আমি অবশ্যি কোন দিন লক্ষ্য করিনি!

—শুনেছি ওরা নাকি বেশ সুখী পরিবার। কথাটা বলে খুব ভালো করে ওয়াডিংটনকে লক্ষ্য করে কিটী।

—সত্যি স্ত্রীকে ও খুবই ভালোবাসে! ঐটুকু মর্যাদা ওকে আমি নিশ্চয়ই দেবো। আমার মনে হয় ওর চরিত্রের ঐটাই শুধু একটা ভালো দিক।

—এ কিন্তু খুবই নীরস স্তুতি।

—ওর ছুটো একটা ফ্লারটেশনের কেচ্ছা শুনা যায়, তবে তেমন মারাত্মক কিছু না। এত ধূর্ত যে বাড়াবাড়ি করে কোনো রকম অসুবিধার সৃষ্টি করতে সে নারাজ। আর খুব প্যাশানেটও নয়। আত্মম্ভরিতা প্রচুর। স্তুতিবাদ পছন্দ করে খুব। একটু স্থূলকায়, বয়স চল্লিশের মতো। কলোনিতে আসবার সময় সুদর্শনই ছিল ও। শুনেছি ওর ঐ সব কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো ওর স্ত্রী।

—মিসেস টাউনসেণ্ড বোধ হয় এ সব ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না?

—মোটেই না, কারণ তিনি জানেন এসব বেশিদূর গড়ায় না। এই সব হতভাগা মেয়েগুলোর সংগে বন্ধুত্ব করতেও তিনি প্রস্তুত। তবে তাঁর মতে এরা অতি সাধারণ স্তরের। তাঁর স্বামী এ রকম কতগুলো অপদার্থ মেয়ে নিয়ে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েন এটা তাঁর খুব গর্বের জিনিস নয়। এমনি বলেন মিসেস টাউনসেণ্ড।

ওয়াডিংটন চলে যাওয়ার পর ওর অসতর্ক উক্তিগুলোর কথাই ভাবছিল কিটী। শ্রুতিমধুর নয় কথাগুলো এবং এগুলো কতটুকু স্পর্শ করেছে সে ভাবটা গোপন করতে রীতিমতো চেষ্টা করতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু কথাগুলো যে সত্যি সে কথা ভাবতেও তিক্ততায় মন বিষিয়ে ওঠে তার। চার্লি দাম্ভিক এবং নির্বোধ; তোষামোদ প্রিয় সে—জানে কিটী। নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে কত ছোট ছোট কাহিনী সে বলেছে কিটীকে, সেও মনে পড়ে তার। নিজের হীন চাতুর্য সম্বন্ধে গর্ব ছিল চার্লির। কী অপদার্থ কিটী! শুধু ওর সুন্দর ছুটো চোখ আর স্বাস্থ্যবান

দেহটার মোহেই লোকটার প্রেমে অন্ধ হয়ে গেল! চার্লিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলেই বুঝি খুশি হয় সে। এদ্দিন জানতো, চার্লির প্রতি তার ঘৃণাটা ভালোবাসারই একটা অভিব্যক্তি। যে ব্যবহার পেয়েছে চার্লির কাছে, তা থেকেই শিক্ষা নেওয়া উচিত কিটীর। ওয়ালটার সব সময়েই ঘৃণার চোখে দেখেছে চার্লিকে। উঃ, সে যদি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারতো চার্লিকে! চার্লির প্রতি তার এই আসক্তির জন্য তার স্ত্রী যদি তাকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করতো! ডারোথি তাকে অতি সাধারণের স্তরের মনে করবে, করুণা করে বন্ধুত্ব করতে চাইবে, কিটীর মা এ-খবর পেলে কেমন ক্ষেপে যাবেন—ভেবে হাসি পেলো কিটির।

কিন্তু রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখে চার্লিকে। তার নিবিড় বাহুবন্ধন আর ঠোঁটের ওপর কামার্ত-চুম্বনের উত্তাপ অনুভব করে কিটী। স্থূলকায় হোক না চার্লি, কী-ই-বা ক্ষতি! কেমন যেন মমতায় হাসি ফুটে ওঠে কিটীর চোখে মুখে; ওর শিশুসুলভ অহমিকার জন্য যেন ওকে আরো বেশি ভালো লাগে তার। স্বপ্নের আবেশে চার্লির জন্য একটুখানি দুঃখ বোধ, একটুখানি মমতায় যেন ভরে ওঠে কিটীর মন। যখন ঘুম ভাঙলো, চোখের জলের ধারা বইছিল তার গাল বেয়ে।

ঘুমের ঘোরে এই কান্না এতটা বিষাদময় কেন, বুঝতে পারে না কিটী।

রোজই দেখা হয় ওয়াডিংটনের সংগে। প্রতিদিনই কাজের শেষে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে আসে সে ফেনদের বাংলোয়। এক সপ্তাহের ভেতরই এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে তারা, অবস্থান্তরে

এক বছরেও সম্ভব হোত কিনা সন্দেহ। কিটী একদিন ওয়াডিং-টনকে বলেছিল সে না থাকলে কী করে যে তার দিনগুলো কাটতো ভাবতেই পারে না। কথাটা শুনে হেসে উত্তর দিয়েছিল ওয়াডিংটন :

—দেখুন, এখানে শুধু আপনি আর আমিই বোধ হয় আছি বাস্তবের কঠিন জমিতে। ঐ ভিক্ষুনীরা বিচরণ করছেন স্বর্গে, আর আপনার স্বামী—অন্ধকারে!

যদিও একটু খাপছাড়া হাসি আসে কিটীর, ভেবে পায় না কী বলতে চায় ওয়াডিংটন। ওয়াডিংটনের উজ্জ্বল ছোট ছোট নীলাভ চোখ দুটো স্নিগ্ধ সন্ধানী দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজে বেড়ায় তার মুখের ওপর; অসোয়াস্তি বোধ করে কিটী। সে যে বুদ্ধিমান, এর মধ্যেই পরিচয় পেয়েছে কিটী। তার এবং ওয়াল-টারের ভেতরকার সম্পর্ক ওর মনে একটা নির্লিপ্ত কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে এও অনুভব করে কিটী। ওকে বিভ্রান্ত করতে কেমন যেন মজা পায় কিটী। ভালো লাগে ওকে, তার প্রতি ওয়াডিংটন একটু সদয় এটাও বুঝতে পারে কিটী। চৌখোশ বা চালাক না হলেও এমনি নীরস ও কাটখোট্টা কথা বলার ধরণ যে, খুব সহজেই চিত্ত আকর্ষণ করে ও। বিরাট টাকের নিচে আমুদে শিশুসুলভ ছোট্ট মুখটি হাসিতে কুঁচকে গিয়ে হাস্যময় ও হালকা রসে ভরপুর হয়ে ওঠে তার প্রতিটি কথায়। বহুকাল কাটিয়েছে সে বিভিন্ন ফাঁড়িতে, একেবারে শ্বেত সমাজের বাইরে—তাই তার ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠেছে কেমন একটা খেয়ালি একরোখা-স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে। নিজস্ব কতকগুলো খেয়াল আর মুদ্রাদোষও আছে তার। দিলখোলা-ভাব তার স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য। জীবনটাকে দেখতো সে কেমন একটা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে, হংকং উপনিবেশ সম্বন্ধে তার বিদ্রূপ কটাক্ষে ছিল একটা তীব্র ঝাঁজ। মী-তান-ফুর দেশীয় কর্মচারী আর কলেরা মহামারি কোনটাই রেহাই

পেতো না তার ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে। একটু অবাস্তবতার রঙ না চড়িয়ে কোন বীরত্বের অথবা দুঃখের কাহিনী বলা কঠিন তার পক্ষে। চীনদেশে গত কুড়ি বছরের বহু অভিযানের কাহিনী ছিল তার নিজের। তার এ সব কাহিনী শুনে মনে হোত দুনিয়াটা বুঝি একটা অদ্ভুত-বিভৎস কিছু।

চীনা ভাষার পাণ্ডিত্যের দাবি না করলেও ঐ ভাষায় কথা বলতে পারতো সে অতি সহজে। পড়াশুনো তার খুবই কম, যা কিছু শিখেছে সবই কথাবার্তা থেকে। চীনা উপন্যাস বা ইতিহাসের বহু গল্প সে শুনিয়েছে কিটীকে। যদিও তার স্বভাবজাত বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনায়, তবু হাস্যরস আর কোমলরসের অভাব থাকেনি কখনো। কিটীর মনে হয়েছে হয়তো নিজের অজান্তেই ওয়াডিংটন চীনাদের মতোই এই মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছে যে, ইউরোপীয়রা বর্বর আর তাদের জীবনযাত্রা মিথ্যায় ভরা; শুধু চীনদেশের জীবনযাত্রার ভেতরই সত্য এবং বাস্তবতার প্রকাশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এতেই পেয়েছিল সে চিন্তার খোরাক। বরাবরই কিটী শুনে এসেছে জাতি হিসাবে চীনারা অকথ্য অসভ্য আর নোংরা। হঠাৎ যেন ক্ষণিকের জন্য একটা যবনিকা উঠে গেল তার চোখের সামনে থেকে, যেন একটা অপরূপ জগত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, যা রূপে বর্ণে মহিমায় স্বপ্নেরও কল্পনাতীত।

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বসেছিল ওয়াডিংটন। মুখে কথার ফুলঝুরি ও হাসির উচ্ছ্বাস।

—আচ্ছা, আপনি এত মদ খান কেন? সাহসভরে জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—আমার জীবনের এইটাই বড় আনন্দ। তাছাড়া, জানেন, এতে কিন্তু কলেরাও হয় না! উত্তর দেয় ওয়াডিংটন।

ওঠবার সময় পরিপূর্ণ মাতাল। কিন্তু মদ সে হজম করে নেয়।

মদ তাকে আমেজে উচ্ছ্বল করে তোলে, কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ করে না কখনো।

সেদিন ওয়ালটার একটু সকাল সকাল ফিরে এসে ডিনারে উপস্থিত থাকতে নিমন্ত্রণ জানালো ওয়াডিংটনকে। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো সেদিন। স্যুপ আর মাছ খাওয়ার পর চিকেনের সংগে কিটীকে কিছুটা কাঁচা স্যালাড দিলো বেয়ারা।

—ও কী, ওগুলো আপনি খাবেন না নিশ্চয়ই? কিটীকে স্যালাড নিতে দেখে চিৎকার করে ওঠে ওয়াডিংটন—

—হ্যাঁ, রোজই তো রাত্রে খাই!

—আমার স্ত্রী ওগুলো খুব পছন্দ করেন। বলে ওয়ালটার।

ওয়াডিংটনের দিকেও থালাটা একটু এগিয়ে দিতেই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো সে।

—অশেষ ধন্যবাদ। এত শিগগির আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা কিন্তু আমার নেই।

একটু শুধু হাসলো ওয়ালটার। নিজের জন্য তুলে নিলো কিছুটা। আর কোন কথা বলেনি ওয়াডিংটন। কেমন অদ্ভুত নির্বাক হয়ে যায় সে। ডিনারের পর নীরবেই বেরিয়ে যায় বাংলো থেকে।

রোজ রাত্রেই স্যালাড খেতো কিটী ও ওয়ালটার। তাদের আসবার দিন-দুই পরেই বাবুর্চি চীনাদের সহজাত অনাসক্ত-ভাব নিয়েই কিটীর টেবিলে পাঠিয়েছিল খানিকটা স্যালাড—কোন চিন্তা না করেই কিটীও খেয়েছিল কিছুটা! ওয়ালটার বলেছিল:

—ওগুলো তোমার খাওয়া উচিত হয়নি। চাকরগুলোরও মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি।

—খাবো না কেন? জিজ্ঞাসা করলো কিটী ওয়ালটারের মুখের দিকে তাকিয়ে।

—এ অভ্যাস খুবই বিপদজনক। আর এখন তো নিছক পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। নিজেকে খুন করে ফেলবে যে!

—আমি মনে করেছিলাম ঐ জন্যই এ-গুলো আমাকে দেওয়া হয়েছে বুঝি! বললো কিটী।

নিশ্চিন্তমনে খেয়ে চললো কিটী। কেমন একটা অসমসাহসিকতা যেন পেয়ে বসেছিল তাকে। বিদ্রূপ-কটাক্ষে দেখছিল ওয়ালটারকে। কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল ওয়ালটার। তার হাতেও খানিকটা তুলে দেওয়ার সংগে সংগে সে খেয়ে ফেললো নির্বিবাদে। সেদিন তারা খেতে আপত্তি করেনি দেখে বাবুর্চি রোজই দিয়েছে তাদের ডিনারের সংগে; তারাও মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়ে গ্রহণ করেছে প্রতিদিন। বিপদের এমনি আবাহন খুবই অদ্ভুত! রোগের ভয়ে ভীত কিটী এইগুলো গ্রহণ করেছে শুধু ওয়ালটারের প্রতি একটা প্রতিশোধ-বৃত্তি চরিতার্থ করবার ইচ্ছা নিয়েই --তার মনের ভয়কে জয় করবার মানসেও।

•

এই ঘটনারই পরদিন বিকেলে, বাংলোয় এসে কিছুক্ষণ বসবার পর কিটীকে তার সংগে বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ জানালো ওয়াডিংটন। এখানে আসবার পর বাড়ির বার হয়নি একদিনও কিটী। প্রসন্নচিত্তে রাজি হোল সে।

—বেড়াবার জায়গা এখানে নেই কিছু। চলুন আমরা পাহাড়ের ওপরে যাই। বলে ওয়াডিংটন।

—বেশ, তাই চলুন—ওখানে ঐ তোরণটার কাছে যাবো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওটা আমি অনেকবার দেখেছি।

বেয়ারা ফটক খুলে দেবার পর বাইরে ধূলায়-ধূসর গলিটায় বেরিয়ে পড়ে তারা। কিছুটা পথ হাঁটবার পর ওয়াডিংটনের হাতটা চেপে ধরে হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে কিটী।

—ঐ দেখুন!

—কী হোল ?

বাইরে পাঁচিলটার ঠিক নিচে একটা লোক চিৎ হয়ে পড়েছিল—পা দুটো সটান আর হাত দুটো মাথার ওপর দিয়ে লম্বা হয়ে ছড়ানো ; পরনে শতছিন্ন চীনাদের ঐ নীল পোশাক। একটা ভিখারী।

—মরে গেছে বলে যেন মনে হয় ! হাঁপিয়ে বলে কিটী।

—হ্যাঁ, মরে গেছে। চলুন আমরা যাই ; এদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। ফেরবার পথে ওটাকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করবোখন। কিন্তু এমন ভীষণভাবে কাঁপছিল কিটী যে, এক পাও নড়তে পাচ্ছিল না সে।

—মড়া আমি দেখিনি কখনো এর আগে।

—দেখে-শুনে আরো শিগগির আপনার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। কেন না, এখান থেকে চলে যাবার আগে এ রকম আপনাকে আরো অনেক দেখতে হবে হয়তো।

কিটীর একটা হাত অতি ধীরে টেনে নেয় ওয়াডিংটন নিজের বাহুর ভেতর। কিছুটা পথ হেঁটে চলে তারা নীরবে।

—ও লোকটা কলেরায় মরেছে নাকি ? জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—মনে হয় তাই।

পাহাড়ের চড়াই পথে হাঁটতে হাঁটতে তোরণটির কাছে এসে পৌঁছয় তারা। বিচিত্র কারুকার্য খোদাই তোরণের গায়। চতুষ্পার্শ্ববর্তি গ্রামগুলোর বিদকুটে অবাস্তব স্বাক্ষর হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে ঐ তোরণটি। তোরণের পাদদেশে উপবেশন করে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয় সমুখে দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমির ওপর। পাহাড়টির গায় ছড়িয়ে আছে মৃতের সমাধি ; ছোট ছোট মাটির সবুজ ঢিপি—সারিবদ্ধভাবে নয়, কেমন যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; মনে হয় মাটীর নিচে ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি করছে বুঝি এরা। সবুজ ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে আঁকা বাঁকা চলেছে সরু সরু আলিপথ।

একটু দূরে একটি ছোট ছেলে একটা মোষের পিঠের ওপর বসে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে। তিনটি কৃষক খড়ের টুপি মাথায়, ঘাড়ের বোঝায় কাত হয়ে থপথপিয়ে চলছে পথ বেয়ে। উত্তপ্ত দিনের শেষে মৃদুমন্দ সান্ধ্য-সমীরণ বড় মিষ্টি লাগে ঐ খানটায় বসে; সুদূর বিস্তৃত ঐ গ্রামের দিকচক্রবাল রেখার দিকে তাকিয়ে সন্তপ্ত মনে নেমে আসে কেমন একটা প্রশান্ত বিষাদ। কিন্তু মৃত ভিখারীটিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না কিটী।

—আচ্ছা, বলতে পারেন চারিদিকে যখন এত লোক মরছে, তার মাঝে আপনি কী করে এত কথা এত হাসি আর এত হুইস্কি খেতে পারছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কিটী।

উত্তর দিলো না ওয়াডিংটন। মুখ ফিরিয়ে তাকালো সে কিটীর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে নিজের হাত রাখল কিটীর বাহুর ওপর।

—বুঝলেন, এ ঠাঁই মেয়েদের জন্যে নয়! গম্ভীর সুরে বলে সে।

—আপনি চলে যান না কেন? আবার জিজ্ঞাসা করে ওয়াডিংটন। তির্যক তীক্ষ্ণ কটাক্ষে লক্ষ্য করে কিটী। ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি খেলে যায়।

—এমনি দুঃসময়ে স্বামীর পাশে স্ত্রী থাকবে, এই তো স্বাভাবিক, নয় কি?

—ওদের 'তার'এ যখন জানলুম ডাক্তারের সাথে আপনিও আসছেন, অবাক হয়ে গিয়েছিলুম আমি। তারপর ভাবলুম, হয়তো আপনি নাসিংও জানেন, এখানে ও-সবের তো খুবই দরকার। হাসপাতালে রোগীদের জীবন-অতিষ্ঠ-করে-তোলা ঐ গুমরো-মুখো মেয়েগুলোর মতোই আপনাকে দেখবো, এই আশাই আমি করেছিলুম! কিন্তু সেদিন আপনাকে বাংলোয় প্রথম দেখে এমনি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যে, পালকের ঘায়েও

হয়তো মূর্ছা যেতুম আমি। আপনাকে দেখে কেমন যেন ফ্যাকাশে, পরিশ্রান্ত মনে হয়েছিল আমার।

—রাস্তায় সুদীর্ঘ ন-দিন কাটানোর পর আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখবার আশা করতে পারেন না নিশ্চয়ই!

—এখনো আপনাকে তেমনি শ্রান্ত, তেমনি ফ্যাকাশে প্রাণহীন মনে হয় আমার। যদি কিছু মনে না করেন আমি বলবো—ভয়ানক অসুখী আপনি!

নিজেকে সংযত করতে না পেরে লাল হয়ে ওঠে কিটী। কিন্তু সশব্দে হেসে ওঠে পরক্ষণেই।

—আমার কথাটা আপনার ভালো লাগেনি বলে খুবই দুঃখিত আমি। কিন্তু কী করে আপনার দুঃখের খবর পেলুম জানেন। বারো বছর বয়স থেকে আমি অনেক দুঃখ পেয়ে এসেছি। গোপন দুঃখটা মনের ভেতর লুকিয়ে রাখতে যাওয়াটা খুবই আয়াসসাধ্য! এ-জন্য কতলোক আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে ভাবতে পারবেন না।

ওয়াডিংটনের নীলাভ উজ্জ্বল চোখ দুটো কিটীর মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল। বুঝতে পারলো কিটী তার এক বর্ণ কথাও বিশ্বাস করেনি ওয়াডিংটন কিন্তু না বুঝার ভাণ করবে সে যতক্ষণ, কিছু আসবে-যাবে না কিটীর।

—বেশি দিন বিয়ে হয়নি আপনার এ আমি জানতুম আর আপনারা দুজনে পরস্পরের প্রেমে মুগ্ধ—এ সিদ্ধান্তও আমি করেছি। কাজেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি—স্বামীই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আমার ধারণা বরং আপনিই তাঁকে ছেড়ে থাকতে চাননি।

—আপনার এ ব্যাখ্যার পেছনে যুক্তি আছে স্বীকার করি। উত্তর দেয় কিটী সহজ ভাবে।

—হ্যাঁ, তবে আসলে সত্যি নয়।

কী সে বলতে চাইছে সেই আশংকায় আরো বলার অপেক্ষায় থাকে কিটী ; কারণ ওয়াডিংটনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছে সে। কিটী জানে মনের কথা প্রকাশ করতে একটুও ইতস্তত করে না ওয়াডিংটন। তাই নিজের কথা ওয়াডিংটনের মুখে শুনবার তীব্র আকাংক্ষা দমন করতে পারে না কিটী।

—আপনি আপনার স্বামীকে ভালোবাসেন আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা, আপনি তাকে অপছন্দ করেন। এমন কি তাঁকে ঘৃণাও করেন—এ কথা শুনলেও আশ্চর্য হবো না! তবে তাঁকে আপনি ভয় করেন, এটা সত্যি।

ক্ষণিকের জন্য ওয়াডিংটনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো কিটী। তার কথায় কিটী বিচলিত হয়েছে এইটুকু বুঝতে দিতে চায় না সে ওয়াডিংটনকে।

—কী জানি কেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমার স্বামীকে আপনার ভালো লাগে নি। নিষ্প্রভ ব্যাঙ্গোক্তির ছোঁয়াচ লাগিয়ে বলে কিটী।

—আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর মাথা আছে, তিনি চরিত্রবান ; আর এ দুটোর যোগাযোগ কিন্তু সত্যি খুবই অসাধারণ। আমার বিশ্বাস এখানে আপনার স্বামী কী করেছেন কিছুই জানেন না আপনি ; কারণ আপনার কাছে তিনি স্পষ্ট নন, এই আমার ধারণা। এই ভীষণ মহামারির দুর্বার গতি এক হাতে যদি কেউ রোধ করতে পারে, সে কেবল তিনি। তিনি রোগীর চিকিৎসা করছেন, সহর পরিষ্কার করছেন, আর পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করছেন। কোথায় তিনি যাচ্ছেন, কী তিনি করছেন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। দিনে বিশবার নিজের জীবন বিপন্ন করছেন তিনি। কর্ণেল ইয়ু-এর ওপর অপ্রতিহত প্রভাব তাঁর ; সমস্ত সেনাবাহিনীকে নিজের হাতে নিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি। এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘটেও কিছুটা বুদ্ধি জুগিয়েছেন

তিনি, যাতে এই অকর্মন্য লোকটাও অন্তত কিছু-না-কিছু করবার চেষ্টায় নেমেছে এতদিনে। আর কনভেণ্টের ভিক্ষুনীরা তো ওঁর নাম জপ করছে রাতদিন। তাঁকে বীর বলে শ্রদ্ধা করে তারা।

– আপনি করেন না?

—কিন্তু এই কি তাঁর কাজ? তিনি ব্যাকট্রিও-লজিস্ট। কেউ ডাকেনি তাঁকে এখানে আসবার জন্য। এই সব মৃত্যু পথ-যাত্রী চীনাগুলোর জন্যে সমবেদনা-কাতর তিনি, এ ধারণা করতেও পাচ্ছি না আমি। ওয়াটসনের কথা আলাদা। তিনি মনুষ্য জাতিকে ভালোবাসতেন। তিনি মিশনারি হলেও, খ্রীস্টিয়ান, বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান, কোন প্রভেদ ছিল না তাঁর কাছে—তারা মানুষ, এই এই ছিল বড় পরিচয় তাঁর কাছে। সহস্র সহস্র চীনা মরছে কলেরায়, তাদেরই দুঃখে বিগলিত হয়ে আপনাব স্বামী এখানে ছুটে এসেছেন, বিশ্বাস করি না আমি। এমন কি বিজ্ঞানের সাধনাও তাঁর আসার উদ্দেশ্য নয়। তাহলে, বলতে পারেন, কী জন্য তিনি এসেছেন এখানে?

—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারেন।

—আপনাদের দুজনকে একসংগে দেখতে ইচ্ছে করে আমার। আমি মাঝে মাঝে ভাবি যখন আপনারা দুজন একা থাকেন কী রকম ব্যবহার করেন একে অন্যের সংগে। আমার সামনে আপনারা অভিনয় করেন দুজনেই। কিন্তু জানেন, সে অভিনয় আপনাদের ব্যর্থ, সে অভিনয় নিস্ফল!

—কী যে বলছেন, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মুচকি হাসে কিটী, একটু চটুলতার ভাণ করে। তবে বুঝতে পারে ঠকানো কঠিন ওয়াডিংটনকে।

—আপনার রূপ আছে, অথচ আশ্চর্য আপনার স্বামী মুখ তুলেই তাকান না আপনার দিকে। আপনার সংগে যখন কথা বলেন মনে হয় অপরিচিত কেউ।

—তিনি আমাকে ভালোবাসেন না এই কি আপনার ধারণা নাকি? ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে কিটী, ক্ষণিকের জন্য যেন তার মনের হালকা ভাবটা দূর হয়ে যায় হঠাৎ।

—জানি না। কী জানি, হয়তো আপনি তাঁর মন এমনি বিষিয়ে তুলেছেন যার জন্য আপনার কাছে আসতেও যেন প্রবৃত্তি হয় না তাঁর। হয়তো ভালোবাসার এমন আগুন জ্বলছে ওঁর মনে যে, যে কোন কারণেই হোক মনের ভাব প্রকাশ করতেও তিনি অনিচ্ছুক। নিজের মনকেও অনেকবার প্রশ্ন করেছি আমি, তবে কি আপনারা দুজনেই আত্মহত্যা করবার বাসনা নিয়ে ছুটে এসেছেন এখানে!

স্যালাডের ব্যাপার নিয়ে ওয়াডিংটনের চোখে প্রথমে চকিত চাউনি এবং পরক্ষণেই কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিল সেদিন কিটী।

—আমার মনে হয় সেদিনকার ঐ কয়েকটা লেটুস পাতায় খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন আপনি। হালকা ভাবে বলে কিটী। তারপর উঠে দাঁড়ায় সে।

—চলুন, এবার বাড়ি যাই। আপনি হয়তো এ সময় একটু হুইস্কি আর সোডা পেলে খুশি হোন, না?

—সর্বক্ষেত্রে আপনি নায়িকা নন ভয়ে আপনি মরে যাচ্ছেন। সত্যি বলুন তো আপনি এখান থেকে চলে যেতে চাইছেন না!

—কিন্তু আপনার কী যায়-আসে তাতে?

—আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

—আপনি আমার গোপন ব্যথায় দুঃখিত হচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি আমার দিকে তাকিয়ে এই মনে হয় আপনার?

চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওয়াডিংটন কিটীর দিকে। তার সেই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে মিশে আছে নদীর বুকে গাছের ছায়ার মতো কিসের যেন একটা ছায়া; অপূর্ব মমতার একটুখানি ঝলক। চোখে জল ভরে আসে কিটীর সেই চাউনিতে।

—আপনি তাহলে এখানেই থাকতে চান ?

—হ্যাঁ।

তোরণের নিচ দিয়ে এগিয়ে চলে তারা। নেমে আসে পাহাড়ের উৎরাই পথে। বাড়ির কম্পাউণ্ডের কাছে—ভিখারীর সেই মৃত দেহটা পড়ে আছে তখনো। কিটীর হাত বাহুবন্ধনে ধরে নেয় ওয়াডিংটন, কিন্তু কিটী ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিটী।

—কী ভীষণ দেখতে, না ?

—কী ? মৃত্যু ?

—হ্যাঁ! এর কাছে আর সব কী তুচ্ছ! মানুষ বলেই যেন মনে হয় না এই ভিখারীটাকে। এর দিকে তাকিয়ে নিজের মনকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায় না এই লোকটাও বেঁচে ছিল একদিন। মনেও আসে না এই তো কয়েক বছর আগেও দুরন্ত একটি ছোট্ট বালক ছুটোছুটি করেছে, ঘুড়ি উড়িয়েছে এই পাহাড়েরই বুকে।

অবরুদ্ধ কান্নার বেগ আর রোধ করতে পারে না কিটী।

দিন কতক পরে ওয়াডিংটন কনভেণ্টের কথা বলছিল কিটীকে, হাতে মস্ত একটা হুইস্কির গ্লাস।

—ঐ মাদার সুপিরিয়র এক অদ্ভুত মহিলা! সিসটাররা বলছেন, উনি নাকি ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে; কিন্তু সেই পরিবারের পরিচয় দিতে এঁরা নারাজ। মাদার নাকি বলতে চান না।

—আপনার যদি জানবার ইচ্ছাই হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করেন না কেন ? মৃদু হেসে কিটী বলে।

—আপনার সাথে পরিচয় হলে আপনিও বুঝবেন অশোভন প্রশ্ন কেন তাঁকে করা যায় না।

—আপনাকে যখন অভিভূত করেছেন তখন নিশ্চয়ই বলবো অসীম শক্তির অধিকারিণী ঐ মহিলা।

—তাঁর কাছ থেকে একটা সংবাদ এনেছি আপনার জন্য। আপনাকে ওঁদের ওখানে একবার যেতে বলেছেন, আপনি গেলে খুবই খুশি হবেন এঁরা। অবশ্যি ঐ মহামারির ভেতর যদি প্রবেশ করবার সাহস পান আপনি।

—এ তাঁর দয়া! আমাব কথা তিনি জানেন ভাবতে পারিনি কিন্তু আমি।

—আমিই বলেছি। সপ্তাহে দু একবার সেখানে যাই আমি। যদি কিছু কাজে লাগে, এই ভেবেই যাই। আমার বিশ্বাস আপনাব স্বামীও হয়তো আপনার সম্বন্ধে আলাপ করেছেন ওঁদের কাছে। আপনার প্রতিও ওঁদের অশেষ শ্রদ্ধা।

—আপনি ক্যাথলিক? ওয়াডিংটনের চোখ দুটে মটমিট করে উঠলো! তার ছোট মুখটী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো একটা হাসির লহরে।

—আপনি ও রকম চোখ পাকাচ্ছেন কেন বলুন তো? প্রশ্ন কবে কিটী।

—অবিশ্বাসীকে দিয়ে কী কাজ হবে! আমি ক্যাথলিক নই। চার্চ-অফ-ইংলণ্ডের সভ্য বলেই পরিচয় দিই নিজেকে। কিছুতেই বিশ্বাস নেই এই কথাটা প্রকাশ করার এই সহজ উপায়। বছর দশেক আগে সাত জন সিসটাব সংগে নিয়ে এই মাদার এসেছিলেন এইখানে। তাদের মাত্র তিনজন বেঁচে আছে এখনো। মহামারি বাদ দিলেও এই মী-তান-ফু সহরটা একটা স্বাস্থ্যনিবাস মোটেই নয়। এই সহরটার বুকে ভীষণ দারিদ্রের পরিবেষ্টনীর ভেতর এঁরা বাস করেন। কঠিন পরিশ্রম করেন এঁরা, কোন ছুটি নেই এঁদের।

—তাহলে শুধু মাত্র মাদার আর তাঁর তিন সহকর্মী সিসটারই আছেন এখন?

—না, যাঁরা এর মধ্যে মারা গিয়েছেন তাদের জায়গায় এবং পরে আরো অনেকেই এসেছে। বর্তমানে এঁরা আছেন ছজন। কলেরা সুরু হবার প্রথম দিকেই একজন মারা যাবার পর ক্যান্টন থেকে আরো দুজন এসেছেন।

একটু যেন কেঁপে ওঠে কিটী।

—আপনার ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?

—না। কী জানি কেন শরীরটা কেমন শির-শির করে উঠলো হঠাৎ।

—ওঁরা যখন আসেন ফ্রান্স থেকে চিরদিনের জন্যই বিদায় নিয়ে এসেছেন। প্রোটেস্টান মিশনারিদের মতো বছরে বার কয়েক ছুটির ব্যবস্থা নেই এদের। এটাই আমাব কাছে খুব কষ্টকর মনে হয়। ইংরেজদের দেশেব মাটির ওপর টান নেই খুব বেশি; পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে নিজেদের আপন করে নিতে পারি আমরা। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই ফরাসী জাতের দেশের প্রতি টান যেন নাড়ীর সংগে যুক্ত। দেশের বাইরে এসে কোথাও সোয়াস্তি পায় না এরা। আমি নিজে মনে খুবই ব্যথা অনুভব করি যখনই ভাবি কতটুকু ত্যাগই না স্বীকার করেছে এই মেয়েগুলো। বোধ হয় আমিও যদি ক্যাথলিক হতুম ওদের মতোই সহজভাবে নিতে পারতুম সবকিছু।

কিটী তাকিয়ে থাকে ওর দিকে কেমন নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে। মনের কতটুকু আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে এতগুলো কথা বলে গেল এই ছোট্ট মানুষটী কিছুই যেন উপলব্ধি করতে পারলো না কিটী। নিজের মনে প্রশ্ন জাগলো তবে কি এগুলো নিছক একটা ছল মাত্র? অতিরিক্ত হুইস্কি খেয়েছে ওয়াডিংটন, কি জানি হয়তো-বা তারই প্রভাবে প্রকৃতিস্থ নয় সে।

—চলুন একদিন, নিজের চোখেই দেখে আসবেন সব। একটা টমেটো খাওয়ার বিপদের মতোও বিপদ নেই সেখানে। ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন একটু বিদ্রূপের সুরেই বলে ওয়াডিংটন।

—আপনি যদি ভয় না পান, আমারও ভয় পাবার তো কারণ নেই।

—মনে হয় আপনার ভালোই লাগবে। বেশ আনন্দ পাবেন, দেখবেন অন্তত এই ফরাসী মেয়েগুলো।

শম্পানে নদী পার হোল তারা। ওপারে চেয়ারের বন্দোবস্ত ছিল কিটীর জন্য। পাহাড়ের চড়াই পথে ওয়াটার-গেট পর্যন্ত তাকে বয়ে নিয়ে গেল সেই চেয়ারে। এই পথেই কুলিরা নদী থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। কাঁধের বাঁকে ঝুলানো বড় বড় বালতিতে জল নিয়ে হেলতে দুলতে চারদিকে জল ছিটিয়ে রাস্তা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওরা। এক্ষুনি যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে মনে হোল। কিটীর বেহারাগুলো রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে এগিয়ে চললো।

—ব্যবসা বাণিজ্য সবই বন্ধ। কিটীর পাশে পাশে চলতে চলতে বলে ওয়াডিংটন। —অন্য সময় হলে মালবাহী কুলিদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া দুষ্কর হোত।

রাস্তা এমনি সরু আর আঁকা বাঁকা যে দিকভ্রম হয় কিটীর! দোকানগুলো প্রায় সবই বন্ধ। এখানে আসার পথে এদেশের নোংরা রাস্তাগুলো দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে কিটী; কিন্তু এ রাস্তায় যে কতদিনের নোংরা আবর্জনা সব জমে আছে হিসাব করা কঠিন। চারদিকে এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ যে রুমাল নিয়ে

মুখ চাপা দিলো কিটী। চীনা সহরগুলোর ভেতর দিয়ে আসতে আসতে রাস্তার জনতার বিস্মিত দৃষ্টিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কিটী। কিন্তু এখন লক্ষ্য করে কদাচিত দু-একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি পড়ছে তার ওপর। কোন ভিড় নেই, ইতস্তত দুটি একটি পথিক চলেছে রাস্তায়, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সবাই। কেমন ভয় ও নৈরাশ্যের ছাপ ওদের চোখে মুখে। কোন কোন বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে কানে আসে কাঁসরের আওয়াজ, আবার কোথাও-বা শুনা যায় কর্কশ আর বিলম্বিত লয়ে কোন এক অজানা বাদ্যযন্ত্রের বিষাদ-ঘন আর্তনাদ। প্রতিটি রুদ্ধ দুয়ারের ওপারেই হয়তো পড়ে আছে এক একটি মৃতদেহ।

—এই যে আমরা এসে গিয়েছি। অবশেষে বলে ওয়াডিংটন। একটা ছোট ফটকের সামনে চেয়ার নামায় বেহারাগুলো। সাদা দেয়ালের গায় বিরাটাকৃতি ক্রুশ ঝুলছে, কিটী নেমে পড়ে চেয়ার থেকে। কলিং-বেল টেপে ওয়াডিংটন।

—দেখুন একটা বিরাট কিছু কিন্তু আশা করবেন না। এঁরা ভীষণ গরিব।

একটা দেশীয় মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়ায় তাদের সামনে। ওয়াডিংটনের সংগে দু-একটা কথার পর করিডরের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে যায় তাদের। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল ; নক্সা-কাটা অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা। দেয়ালের গায়-গায়-লাগানো গুটিকতক সাধারণ চেয়ার। ঘরের এক কোণে পবিত্র ভার্জিন মেরীর একটা প্ল্যাস্টার মূর্তি।

একটু পরেই বেরিয়ে আসে একজন ভিক্ষুনী। বেঁটে স্থূলকায়, মুখখানি মিষ্টি, রক্তিম গাল আর সুন্দর উৎফুল্ল দুটো চোখ। কিটীর সংগে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় ওয়াডিংটন। নাম সিসটার সন্ত জোসেফ।

'*C'est la dame du docteur*'—ডাক্তারের স্ত্রী বুঝি ? জিজ্ঞাসা

করে সে। হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বলে, মাদার আসছেন এক্ষুণি।

সিসটার জোসেফ ইংরেজি জানে না একটুও আর কিটীর ফরাসী ভাষাও ভাঙা ভাঙা। কিন্তু ওয়াডিংটনের অশুদ্ধ ফরাসী বাক্যস্রোত ও হালকা মন্তব্য সিসটারের বিপুল হাসির উদ্রেক করে। সিসটারের খুশি-মনের অফুরন্ত হাসি অবাক করে কিটীকে। কিটীর ধারণা ধর্মানুরাগীরা খুবই গম্ভীর, কিন্তু সিসটারের মিষ্টি শিশুসুলভ চপলতা কিটীর মন স্পর্শ করে।

দোরটা খুলে গেল। কিটীর মনে হোল আপনাতেই যেন ঘুরে গেল দোরটা কব্জির ওপর। মাদার সুপিরিয়র প্রবেশ করলেন ছোট্ট ঘরটিতে। একটু দাঁড়ালেন তিনি দোরগোড়ায়, উৎফুল্ল সিসটার এবং ওয়াডিংটনের কুঞ্চিত-কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি গম্ভীর হাসির রেখা ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটের কোণে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন কিটীর দিকে।

—আপনি মিসেস ফেন? জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজিতে। তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট, প্রতিটি শব্দমাত্রা সম্বন্ধে সচেতন। মাথাটা নোয়ালেন সামান্য একটু সামনের দিকে।

—আমাদের মহানুভব ডাক্তারের স্ত্রীর সংগে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলুম। বললেন তিনি।

কিটী অনুভব করলো মাদার সুপিরিয়র যেন একটা সপ্রতিভ এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ঘিরে নিয়েছেন তাকে। তাঁর সে দৃষ্টি এমনি প্রাণখোলা আর সরল যে অশোভন মনে হয় না একটুও। মনে হয় প্রথম পরিচয়েই একটা স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়াই তাঁর বৈশিষ্ট্য, এর জন্য কোন ছলচাতুরির প্রয়োজনই মনে আসে না তাঁর। অতিথিদের চেয়ারে বসবার জন্য সসম্ভ্রমে ইসারা করে নিজেও একটা আসন গ্রহণ করলেন। সিসটার জোসেফ মাদারের একটু পেছনে দাঁড়িয়ে; মুখে তখনো নীরব হাসির ঝলক।

—আপনারা, ইংরেজরা, চা ভালোবাসেন আমি জানি, সে ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এদেশীয় প্রণালীতে পরিবেশন করায় ক্ষমা করবেন কিন্তু আমাকে। হুইস্কি হলেই মিঃ ওয়াডিংটনের পক্ষে ভালো হোত সেও জানি, কিন্তু সত্যি আমি খুবই দুঃখিত, এটার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। বললেন মাদার।

মুচকি হাসলেন তিনি, কিন্তু তাঁর গম্ভীর দৃষ্টিতে অবজ্ঞার একটু আভাস।

—এই দেখুন, '*ma mere*' আপনি এমন করে বলছেন যেন আমি একটি পাঁড় পাতাল। বলে অপ্রতিভ ওয়াডিংটন।

—কিন্তু মিঃ ওয়াডিংটন, আপনি আদৌ মদ খান না শুনলে বেশি খুশি হতুম।

—তবে খুব বেশি ছাড়া যে আমি খাই না এ কথাটা অবশ্যিই আমি বলবো।

হেসে ফেললেন মাদার। ফরাসী ভাষায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিলেন কথাটা সিসটার জোসেফকে। সৌহার্দ্যপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সিসটার ওয়াডিংটনের দিকে।

— মিঃ ওয়াডিংটনকে কিছুটা রেয়াত দিতেই হবে। দু তিনবার অর্থের অভাবে অনাথ শিশুদের ভরণপোষণই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, সে বিপদে মিঃ ওয়াডিংটনই এগিয়ে এসে আমাদের রক্ষা করেছেন।

যে চীনা মেয়েটি দোর খুলে দিয়েছিল, সে একটা ট্রে হাতে ভেতরে এলো, ট্রের ওপর কয়েকটা চীনা কাপ, একটা টি-পট আর একটা প্লেটে কিছুটা ফরাসী কেক—ওঁরা বলেন ম্যাদেলিন।

—এই ম্যাদেলিন কিন্তু আপনাদের খেতেই হবে; সিসটার সন্ত জোসেফ নিজ হাতে আপনাদের জন্য তৈরি করেছেন। বললেন মাদার।

তারপর অনেক কথাই হলো। মাদার কিটীর কাছে জানতে

চাইলেন, কতদিন সে এদেশে এসেছে, হংকং থেকে এখানে আসতে তার খুবই কষ্ট হয়েছে কিনা, সে কখনো ফ্রান্সে গিয়েছে কিনা, হংকংএর জলবায়ু তার কেমন লাগছে—এমনি অনেক কথা। খুব সাধারণ কথা হলেও, হৃদ্যতার পরিচয় ছিল প্রতিটি কথায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৈশিষ্ট্যও ছিল কিছুটা। ঘরটা বেশ নিভৃত; মনেই হয় না যেন একটা জনাকীর্ণ সহরের বুকে রয়েছে তারা। শান্তি শুধু এখানেই বিরাজমান। বাইরে তখনো মহামারির দুর্নিবার তাণ্ডবনৃত্য; সন্ত্রস্ত চঞ্চল লোকগুলোকে সংযত রেখেছিল শুধু একজন সৈনিকের দৃঢ় মনোবল। সে যেন একাই একশো। কনভেন্টের হাসপাতাল রুগ্ন এবং মুমূর্ষু সৈনিকে ভর্তি। অনাথ শিশুদেরও প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

কী জানি কেন কিটী মুগ্ধ হোল। প্রশান্ত গম্ভীর মহিলাটির আন্তরিক প্রশ্ন শুনে তাঁকে ভালো করে লক্ষ্য করলো কিটী। শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা; রঙ বলতে শুধু বুকের ভেতর লুকানো রক্ত-রঙিন উত্তপ্ত অন্তরটুকু। মধ্য বয়সী, চল্লিশ কি পঞ্চাশ ঠিক বলা কঠিন। মসৃণ ফ্যাকাশে মুখে কোন রেখার কুঞ্চন নেই। ব্যবহারের গাম্ভীর্য, স্থিতধী, আর সুন্দর হাতের শীর্ণভাব থেকে সহজেই পরিচয় মেলে যৌবনের সীমা অতিক্রম করে এসেছেন বহুদিন। মুখের গড়ন লম্বাটে, বড় হা-মুখের ভেতর বড় বড় দাঁত। নাক ছোট না হলেও খুবই কোমল এবং স্পর্শকাতর; কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কালো ভ্রূর নিচে চোখ দুটোই যেন সারা মুখে কেমন একটা বিষাদঘন ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে। বড় বড় নিকষ কালো চোখ দুটো নিষ্প্রাণ না হলেও শান্ত-স্থির-দৃষ্টি কেমন যেন অদ্ভুত রকম অতলস্পর্শী। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বালিকা বয়সে তাঁর রূপ ছিল কিন্তু আরো লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ওঁর রূপও বেড়ে উঠেছে দিন

শিন। গভীর ক্ষীণ সংযত ওঁর কণ্ঠস্বর; যে ভাষাতেই কথা বলেন তিনি, বলেন অতি ধীরে ধীরে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর খ্রিস্টিয়ানসুলভ বদান্যতাদীপ্ত কর্তৃত্বাভিমান; যে জন্য হুকুম করার প্রবৃত্তি খুবই প্রকট। তাঁর আদেশ পালিত হবে এই তাঁর সহজাত চিত্তবৃত্তি; কিন্তু এই আজ্ঞানুবর্তিতাও তিনি গ্রহণ করেন খুবই নম্রতার সংগে। চার্চের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা কারো দৃষ্টি এড়ায় না কখনো। কিন্তু আশ্চর্যি হয় কিটী এত গম্ভীর প্রকৃতির হয়েও মানুষের মনুষ্যোচিত দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর কী অদ্ভুত সহনশীলতা! ওয়াডিংটনের নির্লজ্জ এবং অর্থহীন বাক্যস্রোতে তাঁর গম্ভীর মৃদু হাসি রসজ্ঞানেরই পরিচয় দেয়।
এ ছাড়াও আরো কতগুলো গুণ অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিল কিটী; কিন্তু কী সেই গুণ ভাষার কোঠায় ফেলতে পারছিল না সে। মাদারের অমায়িক মধুর ব্যবহার সত্ত্বেও, তাঁর সামনে নেহাত ইস্কুলের মেয়েব মতো ছোট মনে হচ্ছিল নিজেকে। তাঁর চরিত্রের ঐ অজানা গুণগুলোই বুঝি দুজনার ভেতর একটা দুরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করল।

—'*Monsieur ne mange rien*', মঁশিয়ে কিছুই খাচ্ছেন না কিন্তু! বলে সিসটার সন্ত জোসেফ।
— মাঞ্চু রান্না মঁশিয়ের মুখ নষ্ট করে দিয়েছে বোধ হয়। উত্তরে বললেন মাদার।
সিসটারের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটুখানি সংবৃতভাব প্রকাশ পেলো চোখে মুখে। ওয়াডিংটন আরো এক টুকরো কেক তুলে নিলো। চোখে মুখে তাঁর দুষ্টুমি; কিটী কিন্তু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা।

—এ কিন্তু অবিচার করছেন আমার ওপর, *'ma mere'*। এই দেখুন আমি খাচ্ছি।

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ফিরে তাকালেন মাদার কিটীর দিকে।

—মিসেস ফেন কনভেণ্ট দেখলে খুব খুশি হবো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারি বিশৃংখলা এখন চারদিকে। এরই ভেতর দেখতে হবে আপনাকে। আমাদের কাজ অনেক, অথচ লোকের অভাব। সিসটারের সংখ্যা খুবই কম। এদিকে কর্ণেল ইয়ু-এর অনুরোধে, আমাদের ইনফারমারিটাও রুগ্ন সৈন্যদের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। খাবার হলটাকেই শিশুগুলোর জন্য ইনফারমারিতে পরিণত করতে হয়েছে। বললেন তিনি।

কিটীকে পথ দেখাতে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন মাদার। ঠাণ্ডা সাদা করিডরের ভেতব দিয়ে তাঁরা দুজন পাশাপাশি চললেন—পেছনে সন্ত জোসেফ আর ওয়াডিংটন। প্রথমে একটা বড় ফাঁকা ঘরে গেল সবাই; সে ঘরে জনাকয়েক চীনা মেয়ে সূচের কারু-কার্য করছিল বসে বসে। আগন্তুকদের প্রবেশ করবার সংগে সংগে উঠে দাঁড়ালো তারা সবাই। ওদের কাজের নমুনা দেখালেন মাদার কিটীকে!

—এপিডেমিকের ভেতরও এ কাজ আমরা বন্ধ করিনি। কারণ, এতে মনকে ভুলিয়ে রাখা যায়।

অন্য একটা ঘরে গেল তারা। সাধারণ সেলাইর কাজ করছিল আরো কতগুলো ছোট ছোট মেয়ে। তৃতীয় ঘরে একটি চীনা সিসটারের হেফাজতে শুধু খুদে শিশুরা। শিশুরা খেলায় মত্ত। মাদার ঘরে ঢোকার সংগে সংগেই সবাই ঘিরে ধরলো তারা। কালো চুল ও কালো চীনা খুদে-খুদে চোখ নিয়ে বাচ্চাগুলো কেউ-বা তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলো আর কেউ-বা লুকলো তাঁর স্কার্টের ভাঁজে ভাঁজে। তাঁর গম্ভীর মুখে একটা মনভুলানো

হাসি ভেসে উঠলো। তিনি আদর করলেন এদের সবাইকে, হাসিখুশিতে ভরা দু-চারটি কথাও বললেন ওদের, ভাষা না বুঝলেও কিটীর মনে হোল ওদের আদর করছেন উনি। একটু শিউরে উঠলো কিটী, চ্যাপটা নাক আর কংকালসার কুৎসিৎ ঐ শিশুগুলোর দিকে তাকিয়ে ওদের মানুষের আকৃতি বলেই মনে হয় না। পরিবেশটা কেমন কুৎসিৎ, বীভৎস লাগছিল কিটীর। কিন্তু এদেরই মাঝে দাঁড়িয়ে রইলেন মাদার মূর্তিমতী দয়া যেন। ওরা ছাড়তে চায়না তাঁকে, গায় গায় যেন সাপটে থাকে সবাই; একটু জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন এদের হাত থেকে। এই মহিয়সী মহিলার ভেতর ভয়ের কিছুই এরা দেখে না কখনো।

অন্য একটা করিডরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বললেন মাদার:

—এরা অনাথ এই অর্থে যে, এদের মা বাপ এদের পরিত্যাগ করেছে। প্রতি শিশুর মাথা পিছু আমরা কিছু অর্থ দিই যখন নিয়ে আসে ওদের। এই লোভটুকু না দেখালে এখানে নিয়েই আসবে না, হয়তো-বা মেরেই ফেলবে।

সিসটারের দিকে তাকিয়ে বলেন মাদার:

—আজকে আরো কেউ এসেছে?

—হ্যাঁ, চার জন।

—আর এখন এই কলেরার ভয়ে অযথা কতকগুলো নিষ্কর্মা মেয়ের বোঝা আর বইতে চায় না কেউ।

ডরমিটরিতে নিয়ে গেল কিটীকে; একটা ঘরের দোরের কাছে এসে দাঁড়ালো তারা, লেখা আছে '**ইনফারমারি**'। কিটীর কাণে আসে গোঙানির আওয়াজ আর তীব্র চিৎকার। এক একটা আওয়াজ থেকে মনে হয় এ আর্তনাদ বুঝি বেদনার্ত মানুষের নয়।

—ইনফারমারিতে আর আপনাকে নিয়ে যেতে চাই না। বললেন

মাদার তাঁর অতি কোমল কণ্ঠে।—এ দৃশ্য দেখবার নয়। তারপর হঠাৎ কী কথা মনে এলো তাঁর। বললেন :

—কী জানি, হয়তো ডাঃ ফেন আছেন সেখানে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি সিসটারের দিকে, সে সহাস্যে দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। দোর খোলার সংগে সংগে ভেতরকার ভয়াবহ চিৎকারের শব্দ শুনে কিটী ছিটকে দূরে সরে গেল। ফিরে এলো সিসটার সন্ত জোসেফ।

—তিনি এসেছিলেন, আর খুব শিগগির হয়তো ফিরে আসছেন না।

—ছ-নম্বরের খবর কী।

—'*Pauvre garcon*' মরে গেছে।

ক্রুশ আঁকলেন মাদার, বিড় বিড় করে প্রার্থনা করলেন মৃতের উদ্দেশ্যে।

এক ফালি উঠোনের পাশ দিয়ে চলছিল তারা। কিটীর চোখে পড়ে একটা নীল কাপড়ে ঢাকা পাশাপাশি তুটো অবয়ব যেন পড়ে আছে মাটিতে। ওয়াডিংটনের দিকে ফিরে তাকালেন মাদার।

—আমাদের বেডের এত অকুলান, অনেক সময় তুজনকে একই বিছানায় রাখতে হয়; আর যখনই একজন মারা যায় তাকে সরিয়ে অন্য রোগীর স্থান করে দিতে হয়।

কিটীর দিকে তাকিয়ে একটু মৃতু হেসে বললেন :

—চলুন, এইবার আমাদের চ্যাপেল দেখাবো আপনাকে। এটা আমাদের গর্বের জিনিস। একজন বন্ধু এই কদিন আগে ফ্রান্স থেকে মাদার মেরীর একটা সুন্দর মূর্তি পাঠিয়েছেন।

চ্যাপেল বলতে একটা লম্বা নিচু ঘর মাত্র। চুনকাম করা দেয়াল আর সারিবদ্ধ বসার বেঞ্চ; এক প্রান্তে বেদি তারই ওপর মূর্তিটি দণ্ডায়মান; মূর্তিটি প্ল্যাস্টার নির্মিত এবং জ্বলজ্বলে ধ্যাবড়া রঙে চিত্রিত। তারই পেছনে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর বিরাট একটা তৈলচিত্র, পায়ের নিচে লুটিয়ে আছে মূর্তিমতী বিষাদক্লিষ্ট হুই মেরী। অক্ষম হস্তের অপটু স্পর্শে শিল্পীর অপারদর্শিতা ও বর্ণজ্ঞানের অজ্ঞতা ফুটে উঠেছে ছবিটির রেখায় রেখায়। একই শিল্পীর হাতে আঁকা চারদিকে দেয়ালের গায় অসংখ্য ক্রুশের ছবি। কেমন একটা রুক্ষতা ও বীভৎসতার ছাপ সর্বত্র ছড়ানো।

ভিক্ষুনীরা ঘরে ঢুকেই প্রথমে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসে গেলেন। তারপর মাদার আবার আলাপ সুরু করলেন কিটীর সংগে।

—যা কিছু এখানে আসে সবই আসার পথেই ভেঙে যায়; কিন্তু আশ্চর্য এই মূর্তিটার গায় কিন্তু প্যারিস থেকে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে একটুও আঁচড় লাগেনি। এটা অলৌকিক ব্যাপার নয় কি!

বিদ্রূপাত্মক চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওয়াডিংটনের, কিন্তু বাক সংযত করে সে।

—বেদি আর ক্রুশের চিত্রগুলো এঁকেছিলেন আমাদেরই এক সিসটার, তাঁর নাম সন্ত আঁসেলম। আবার ক্রুশ আঁকেন মাদার।

—সত্যিকার শিল্পী ছিল ও। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় তাকেও প্রাণ দিতে হয়েছে এই মহামারির কবলে। আপনার কেমন লাগছে ছবিগুলো? বেশ সুন্দর না!

কিটীকে স্বীকার করতেই হোল। বেদির ওপর সাজানো থোকা থোকা কাগজের ফুল আর উৎকট কারুকার্য করা মোমদানি।

—'ব্লেসেড সেক্রামেন্ট' রাখবার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে।

—তাই নাকি! বুঝতে না পেরেই বলে কিটী।

—এই ভীষণ দুর্দিনে ঐটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে ঐ বসবার ঘরেই ফিরে আসে আবার তারা।

—আজকে সকালে যে শিশুগুলো এসেছে যাবার আগে তাদের দেখে যাবেন একবার?

—মন্দ কী! বলে কিটী।

বারান্দার ওধারে ছোট ঘরটায় ওদের নিয়ে গেলেন মাদার সুপিরিয়র। টেবিলের ওপর কাপড়ে ঢাকা কী যেন কিলবিল করে উঠলো। কাপড়টা সরিয়ে নিলো সিসটার—ভেতরে চারটি খুদে উলংগ শিশু। লাল রঙের শিশুগুলোর চঞ্চল হাত পা-গুলো অদ্ভুতভাবে নড়ছিল। ছোট ছোট চীনা মুখগুলো কেমন যেন ভ্রূকুটি-বিকৃতি। মানুষের মতো দেখতে নয় ওরা—বুঝি কোন এক অজানা বিচিত্র গোষ্টীর এক বিচিত্র জীব; তবু যেন কেমন একটা অন্তরস্পর্শী আবেদন ওদের চোখে মুখে। মাদার তাকালেন ওদের দিকে স্মিতহাস্যে।

—কেমন জীবন্ত এরা। অনেক সময় ঠিক মরার মুখেই নিয়ে আসে এদের। নিয়ে আসার সংগে সংগেই বেপটাইজ করে নিই।

—এঁর স্বামী কিন্তু খুব খুশি হবেন এদের পেয়ে। তিনি এখানে থাকলে এদের নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয় খেলা সুরু করতেন। এরা কেঁদে উঠলে কোলে তুলে নিতেন। সংগে সংগে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো এই শিশুগুলো। বলে সিসটার সন্ত জোসেফ।

কিটী আর ওয়াডিংটন এসে দাঁড়ায় বাইরে বেরুবার দরজার কাছে। মাদারকে ধন্যবাদ জানালো কিটী। ব্রহ্মচারিণী অপূর্ব শিষ্টাচার ও সম্ভ্রমের সংগে মাথা নুইয়ে গ্রহণ করলেন সেই ধন্যবাদ।

—খুবই আনন্দ পেয়েছি আমি। আপনি তো জানেন না আপনার স্বামীর কাছ থেকে কতটুকু দয়া আর সাহায্য পাচ্ছি আমরা। স্বয়ং

ভগবানই বুঝি এঁকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। আপনিও তাঁর সংগে এসেছেন দেখে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি। সারা দিনের কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্তির শেষে বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সান্নিধ্যে, আপনার ভালোবাসায় আর............হ্যাঁ, আর আপনার সুন্দর মিষ্টি মুখখানি দেখে তৃপ্তি বোধ করেন। আপনি ওঁর একটু যত্ন নেবেন কিন্তু। বেশি পরিশ্রম করতে দেবেন না। আমাদের সবার জন্য এইটুকু আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আরক্তিম হয়ে ওঠে কিটী। কী বলবে বুঝতে পারে না সে। তার হাত তুটো নিজের হাতে তুলে নিলেন মাদার। তাঁর ঐ চিন্তান্বিত আবেগহীন দৃষ্টি তারই ওপর নিবদ্ধ বুঝতে পারে কিটী; কেমন নিরাসক্ত ঐ দৃষ্টি অথচ কেমন একটা গভীর অনুভূতি ফুটে উঠেছে যেন তাঁর চোখ তুটোতে।

তাদের পেছনে দোর বন্ধ করে দিলো সিসটার সন্ত জোসেফ। চেয়ারে উঠে বসে কিটী। সেই আঁকাবাঁকা অপরিসর রাস্তা দিয়ে ফিরে চললো তারা। মাঝে মাঝে তুটো একটা কথা বলে ওয়াডিংটন, কিন্তু কোন উত্তর দেয় না কিটী। চেয়ারের তুপাশে পর্দা ফেলা—কিটীকে দেখা যায় না বাইরে থেকে। নীরবে চলতে থাকে ওয়াডিংটন। নদীর ধারে চেয়ার থেকে নেমে আসে কিটী। ওয়াডিংটন অবাক হয়ে দেখে তুর্নিবার অশ্রু বন্যায় কিটীর চোখ তুটো প্লাবিত।

—কী হয়েছে আপনার? কাঁদছেন যে? জিজ্ঞাসা করে ওয়াডিংটন। একটা গভীর উদ্বেগে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারাটা মুখ।

—কই কিছু না তো! বলে একটু হাসতে চেষ্টা করে কিটী।

আবার ফিরে আসে কিটী মৃত মিশনারির সেই বিষাদের ছায়া-ঘেরা নির্জন বারান্দায়। জানলার ধারে লম্বা চেয়ারটায় গা এলিয়ে অলস চোখে তাকিয়ে থাকে নদীর ওপারে মন্দিরটার দিকে; সান্ধ্য সমাগমে নদীর বুকে আবার সেই পরম সুন্দরের আবির্ভাব। বিক্ষুব্ধ মনের বিক্ষিপ্ত অনুভূতিগুলো আবার সংযোজিত করতে চেষ্টা করে কিটী। সে কখনো কল্পনা করেনি কনভেণ্টের এই অভিজ্ঞতা তার অন্তর এমনি আকুলভাবে স্পর্শ করবে। একটু শুধু কৌতূহল বশেই সে গিয়েছিল ওখানে। তার তো কিছু করবার ছিল না; দিনের পর দিন নদীর ওপারে ঐ প্রাচীর ঘেরা সহরটার দিকে শুধু তাকিয়েছিল। সহরের রহস্যময় রাস্তাগুলোর সংগে পরিচিত হবার আকাংক্ষা হাতছানি দিচ্ছিল তাকে!

কিন্তু একবার সেই কনভেণ্টের ভেতর প্রবেশ করেই মনে হয়েছে স্থান ও কালের অতীত কোন এক অপার্থিব জগতে চলে গিয়েছে সে। সেই আসবাব বর্জিত ঘরগুলো আর তারই ফাঁকা বারান্দার অণুতে পরমাণুতে কোন দূরাতীত এক রহস্যের সত্তা বুঝি লুকিয়ে রয়েছে। ঐ ছোট গির্জাটা কী কুৎসিৎ, হতশ্রী। নিজস্ব একটা রুক্ষতার ভেতর কেমন যেন একটু বিষাদঘন; কলংকজীর্ণ জানলার শার্সি আর ছবিগুলো নিয়ে ক্যাথিড্রেলের মাহাত্ম্য প্রকাশে কিসের যেন রিক্ততা ঠেকছে। কেমন যেন দীন হীন; কিন্তু বিশ্বাসের আভরণ আর স্নেহের আলিম্পন যেন আত্মার একটা অপরূপ সৌন্দর্যে বিভূতিমণ্ডিত করে রেখেছে একে। এই মহামারির ভেতর কনভেণ্টের সুবিন্যস্ত কর্মধারা বিপদের মুখেও ধৈর্য ও বাস্তববুদ্ধি জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা হাস্যকর মনে হলেও অন্তরকে

গভীরভাবে স্পর্শ করে। সিসটার সন্ত জোসেফ ইনফারমারির দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলে দেওয়ার পর যে ভীষণ আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হয়েছিল তখনো তা যেন কিটীর কানে বাজছে।

ওয়ালটারের প্রসংগ খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই উত্থাপন করেছিল তারা। প্রথমে সিসটারের মুখে, পরে মাদার নিজে। তার স্তুতিবাদে তাঁর কণ্ঠে বেজেছিল কোমল সুর। কিন্তু কী আশ্চর্য, কিটী যেন একটা গর্বের শিহরণ অনুভব করেছিল নিজের ভেতর। এত ভালোবাসে এঁরা ওয়ালটারকে। ওয়াডিংটন তার কাজের কিছুটা পরিচয় দিয়েছিল কিটীকে; কিন্তু এই ভিক্ষুনীরা শুধু তার কাজেরই প্রশংসা করেনি (হংকং সহরে বুদ্ধিমান বলে তার খ্যাতি জানা ছিল কিটীর) তারা বলছিল তার চিন্তাশীলতা আর অন্তরের কোমলতার কথাও। সত্যিই স্বভাব কোমল ওয়ালটার। রোগীর পাশে সে অপূর্ব! রাগ হয় না তার সহজে, তার স্পর্শ মধুর শীতল শান্তিময়। তার উপস্থিতি-টুকুই শুধু যেন কোন যাদুবলে সকল যন্ত্রণার নিরসন করে দেয়। তার চোখের সেই স্নেহভরা চাউনি আর দেখতে পাবে না, জানে কিটী। সে দৃষ্টিতে আছে শুধু ক্রোধ আর বিরক্তি। এতদিনে বুঝতে পারে কিটী—ভালোবাসার কী অফুরন্ত উৎস ছিল ওয়াল-টারের বুকে; কিসে যেন সেই উৎসমুখ খুলে গিয়ে তারই দুর্নিবার ধারা প্লাবিত করে দিচ্ছে আজ এইসব হতভাগ্য লোক-গুলোকে, যারা তাকে বই আর জানেনা কাউকে। ঈর্ষা জাগে না তার মনে, কিন্তু কী যেন একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করে কিটী; কী যেন একটা অভ্যস্ত-নির্ভর সরে গেছে তার পায়ের তলা থেকে—ভারসাম্য হারিয়ে দুলছে সে এদিক-ওদিক।

ওয়ালটারকে একদিন ঘৃণা করতো কিটী, তাই বুঝি আজ সে ঘৃণা করে নিজেকেই। তার প্রতি কিটীর অশ্রদ্ধা ওয়ালটার জানতো। তবুও বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠেনি তার মন। সে জানতো কিটী

মুর্খ, কিন্তু তাকে ভালোবাসতো বলেই এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি কোনদিন। এখন আর কোন ঘৃণা নেই কিটীর মনে, নেই কোন বিতৃষ্ণা; কিন্তু কেমন একটা ভয় একটা বিভ্রান্তি পেয়ে বসেছে কিটীকে। তার স্বামীর অপূর্ব গুণাবলী স্বীকার না করে পারে না কিটী। কখনো যেন মনে হয় ওয়ালটারের একটা অসাধারণ অথচ অলক্ষ্য মাহাত্ম্য আছে। অথচ কী অদ্ভুত, একেই কিটী ভালোবাসতে পারেনি! তার অন্তরে ভালোবাসা জেগে আছে এখনো সেই লোকটার জন্য যার অপদার্থতা এতদিনে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে মর্মে মর্মে। গত দীর্ঘ দিন চিন্তা করে অবশেষে কিটী প্রকৃত মূল্য নিরুপণ করতে সক্ষম হয়েছে ঐ চার্লস টাউনসেণ্ডের—বুঝেছে কিটী চার্লি একটি অতি সাধারণ লোক, যার গুণ বলতে কিছুই নেই। কিটীর অন্তরে এখনো যতটুকু ভালোবাসা আছে ওর জন্য সেইটুকুও যদি একেবারে মুছে ফেলতে পারতো সে! টাউনসেণ্ডের চিন্তাও মন থেকে দূর করে দিতে চেষ্টা করে কিটী।

ওয়ালটার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে এই ওয়াডিংটনও। কিটীই শুধু অন্ধ হয়েছিল এতকাল। কিন্তু কেন? সে কিটীকে ভালোবাসতো কিন্তু কিটী পারেনি তাকে ভালোবাসতে। মানুষের মন কী উপাদানে তৈরি যার জন্যে যে ভালোবাসে সেই পায় প্রতিদানে শুধু ঘৃণা আর অবজ্ঞা? কিন্তু ওয়াডিংটনও তো স্বীকার করেছে তারও ভালো লাগেনি ওয়ালটারকে! অনেকেই পারেনি এমনি! কিন্তু কনভেণ্টের এই দুটো ব্রহ্মচারিণীর মনে স্নেহের অনুভূতি রয়েছে ওয়ালটারের জন্য। লাজুক স্বভাবের হলেও এঁদের কাছে তার ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও স্নিগ্ধ।

কিন্তু কনভেণ্টের ব্রহ্মচারিণীরা কিটীর অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল সব ছাপিয়ে এইটাই বড় কথা। সুদীর্ঘ দশ বৎসর আগে ছোট্ট যে দলটি মাদারের সংগে চীনে এসেছিল, হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর আপেল-রাঙা-গাল সিসটার সন্ত জোসেফ, তারই একজন। তারই চোখের সামনে সংগীদের এক একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, কেউ-বা রোগে কেউ-বা নির্বাসনের জ্বালায়, তবু সে রয়েছে সদা প্রফুল্ল আনন্দময়। কিন্তু এই মধুর রসানুভূতি সে পেলো কোথা থেকে? কিটীর মনে প্রশ্ন জাগে। তারপর মাদার সুপিরিয়র। কল্পনায় তাঁর সম্মুখে গিয়ে আবার দাঁড়ায় কিটী—লজ্জায় হীনতায় নিজেকে বড়ো ছোট মনে হয় তার। সরলতার ও অকৃত্রিমতার ভেতরেও তাঁর চরিত্রের স্বকীয় মহত্ব জাগিয়ে দেয় কেমন একটা ভয়সমন্বিত বিস্ময়। সিসটার সন্ত জোসেফের দাঁড়াবার ভংগিতে, চোখ মুখের ইংগিতে প্রতিটি কথার সুরেই তার গভীর আনুগত্যের প্রকাশ; আর চপলমতি অসংযত ওয়াডিংটন-এর কণ্ঠস্বর তার আসোয়াস্তিভাব বুঝিয়ে দেয়। কিটীর মনে হয়, মাদারের বংশমর্যাদার পরিচয় করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন করে না। তাঁর চালচলনেই প্রকাশ তাঁর আভিজাত্যের—সেই আভিজাত্যের কর্তৃত্বাভিমান জানেনা অবাধ্যতা কী। তাঁর ভেতরে রয়েছে মহতী মহিলার অনুকম্পা আর সন্ন্যাসীর বিনয়। তাঁর কঠিন সুন্দর মুখখানিতে ফুটে রয়েছে একটা গভীর আন্তরিক আত্মনিগ্রহের ছাপ; অথচ এরই সংগে এমন একটা প্রশান্তি আর মাধুর্যের প্রকাশ যে এই সমস্ত শিশুরাও হৈ-হল্লার ভেতর তাঁকে ছেঁকে ধরতে ভয় পায় না একটুও; তাঁর অন্তরের গভীর স্নেহ লাভে তারা এমনি নিশ্চিত। যখন তিনি ঐ সদ্যোজাত শিশু চারটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন কেমন একটা

স্বর্গীয় হাসির ফুল ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে মুখে—নির্জন উলুবনের বুকে যেন সূর্যের একফালি চকিত হাসি।

ওয়ালটার সম্পর্কে সন্ত জোসেফের অসংলগ্ন উক্তি বিচলিত করেছিল কিটীকে। কিটী জানে কতটুকু আন্তরিকতা নিয়ে ওয়ালটার চেয়েছিল তার কাছে একটি মাত্র সন্তান; কিন্তু কখনো এতটুকু সন্দেহও তো জাগেনি কিটীর মনে যে এই নিরস কঠিন ওয়ালটারের বুকেও ছিল এমনি একটা বুভুক্ষা; বুঝতে পারেনি কিটী ওয়ালটারও ছোট্ট শিশুর প্রতি এতটা মরমী, এতটা কোমল। পুরুষদের অনেকেই তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে শিশুদের নিয়ে। কিন্তু কী অদ্ভুত এই ওয়ালটার।

কিন্তু এতসব মধুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রুপোলি মেঘের দিগন্তে একটুখানি কৃষ্ণ রেখার ছায়া যেন স্পষ্ট ঘনীভূত হয়ে বিষণ্ণ করে তোলে কিটীকে। সিসটার সন্ত জোসেফের শান্ত স্বভাব, তার চেয়েও, মাদারের মধুর সৌজন্যের ভেতরও কেমন একটা ব্যবধানের তীব্র অনুভূতি যেন বড় পীড়া দেয় কিটীকে। হৃদ্যতা পেয়েছে কিটী তাদের সবার কাছ থেকে, অমায়িক ব্যবহারও করেছে তারা, তবু যেন মনে হয়েছে কী যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে কোথায়, কী যেন একটা পায়নি সে তাদের কাছে। জানে না কিটী কী সেই অভাব, কিন্তু সে যে সেখানে শুধু একজন অপরিচিত আগন্তুক মাত্র এই অনুভূতিটুকু সম্বন্ধে কেমন একটা সচেতন ভাব পেয়ে বসেছিল কিটীর সারা মন। বুঝতে পারছিল সে, তার এবং ওদের ভেতর একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দণ্ডায়মান। ভিন্ন ভাষা তাদের, শুধু মুখেই নয়, অন্তরেও। তাই কিটীর পেছনে কনভেণ্টের দোর রুদ্ধ হয়ে যাবার সংগে সংগে তাদের অন্তর থেকেও কিটী নির্বাসিত হোল। সে যে তাদের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য ছিল এই অনুভূতিটুকুও যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল তাদের মন থেকে। মনে হোল সে বুঝি শুধু কনভেণ্ট

থেকেই বেরিয়ে এলো না, অতীন্দ্রিয় সত্তার একটা রহস্যময় উদ্যানের কপাটও বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেল তার কাছে চিরকালের মতো, যেখানে প্রবেশাধিকারই ছিল তার অতৃপ্ত আত্মার একান্ত আকাংক্ষা। হঠাৎ যেন নিজেকে বড়ো একা মনে হোল কিটীর। এমনি একা বোধ হয়নি কোনদিন। এই জন্যই কেঁদেছিল কিটী। কেমন একটা অবসাদে নিজের মাথাটা এলিয়ে দিলো, একটা নিবিড় দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভেতরটা খালি করে।

—উঃ। কী অপদার্থই না আমি!

সেদিন সন্ধ্যায় বাংলোয় ফিরে এলো ওয়ালটার একটু সকাল সকাল। এ-রকম সে আসে না। খোলা জানলার ধারে লম্বা চেয়ারটায় গা এলিয়ে শুয়েছিল কিটী। প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছিল তখন।

—আলো চাই না তোমার? জিজ্ঞাসা করে ওয়ালটার।

—খাবার দেবার সময় দিয়ে যাবেখন।

খুব কমই কথা বলে ওয়ালটার কিটীর সংগে। অতি সাধারণ মামুলি কথা। তারা বুঝি মাত্র দুজন পরিচিত বন্ধু। কিটীর প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার একটুমাত্রও প্রকাশ নেই ওয়ালটারের ব্যবহারে। কিটীব সংগে সে দৃষ্টি বিনিময় করে না, এমন কি হাসেও না কখনো। ব্যবহারে ভদ্রতার আতিশয্য।

—ওয়ালটার, এপিডেমিক কাটিয়ে উঠতে পারলে কী করবে স্থির করেছো? জিজ্ঞাসা করে কিটী।

একটু সময় চুপ করে থাকে ওয়ালটার। তার মুখ দেখতে পায় না কিটী।

—এখনো কিছু ভাবিনি।

যা এসেছে মনে তাই এতকাল বলেছে কিটী ; কথা বলবার আগে চিন্তা করা মনেও আসেনি কোনদিন। কিন্তু কেমন যেন ভয় হয় ওয়ালটারকে। আতংকে ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে, একটা অসহ্য যন্ত্রণায় দপদপ করে ওঠে বুকের ভেতরটা।

—আজকে বিকেলে কনভেণ্টে গিয়েছিলুম।

—শুনেছি।

আরো কথা বলতে নিজের ওপর যেন বলপ্রয়োগ করে কিটী। বলতেই হবে তাকে ; কিন্তু কী বলবে কিছু যে জোগায় না।

—তুমি কি সত্যিই আমার মৃত্যু কামনা করেই নিয়ে এসেছিলে এখানে ?

—শোন কিটী, আমি হলে চুপ করে থাকতুম। যা ভুলে যাওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করার কোন অর্থ নেই, এই আমার ধারণা।

—কিন্তু তুমি তো ভুলে যাওনি, আমিও যে ভুলতে পারিনি। এখানে আসার পর অনেক ভেবেছি আমি। আমার বক্তব্য শুনবে একটু ?

—বেশ, বলো।

—আমি তোমার সংগে জঘন্য ব্যবহার করেছি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওয়ালটার। তার স্থাণুর মতো অচঞ্চল মূর্তি কেমন যেন অদ্ভুত ভীতিপ্রদ।

—জানি না তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে কিনা। এসব ব্যাপার একবার মিটে গেলে মেয়েরা আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু পুরুষেরা কী ভাবে গ্রহণ করে মেয়েরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

অপ্রত্যাশিতভাবে কথাগুলো বের হতে নিজেরই কানে যেন কেমন অপরিচিত মনে হোল কিটীর।

—চার্লি কী তুমি জানো, সে কী করবে তাও তুমি জানতে। আজকে আমি স্বীকার করবো, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলে সেদিন। ও একটা অপদার্থ জানোয়ার বিশেষ। তেমনি অপদার্থ বলেই আমিও গিয়ে পড়েছিলুম তার মুঠোর ভেতর। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি না আমি। চাই না, আবার তেমনি তুমি আমায় ভালোবাস। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব কি বজায় রাখা যায় না? চারদিকে সহস্র সহস্র লোক যেখানে মরছে, কনভেন্টের ঐ ব্রহ্মচারিণীদের কৃচ্ছ্র তার উদাহরণ যেখানে……

—এর সংগে তাদের কী সম্পর্ক? বাধা দেয় ওয়ালটার।

—ঠিক বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছি না। ওদের ওখানে গিয়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতির স্বাদ পেয়েছি। সব কিছুরই একটা গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে পারছি আজকে। কী ভীষণ এসব আর কী বিস্ময়কর তাঁদের আত্মাহুতি! তাই বলছিলুম সত্যিই যদি আমার কথাগুলো বুঝে থাকো, তাহলে আমার মতো একটা নির্বোধ অবিশ্বাসী মেয়ের জন্য তোমার নিজের মনকে অনবরত পীড়া দেওয়ার মতো অবাস্তব এবং অসংগতিকর আর কিছুই নেই। তোমার চিন্তা জুড়ে থাকতে আমার মতো একটা অপদার্থ আর অতি তুচ্ছ নারীর যোগ্যতা কোথায়?

কোন উত্তর দেয় না ওয়ালটার, উঠেও যায় না। সুযোগ দেয় কিটীকে আরো বলতে।

—মিঃ ওয়াডিংটন আর কনভেন্টের ঐ মেয়েদের কাছে অনেক কথাই শুনেছি তোমার সম্পর্কে। সত্যি তোমার জন্য গর্ব অনুভব করছি আমি, ওয়ালটার।

—কিন্তু তুমি তো তা করতে না কোনদিন। বরং অবজ্ঞাই তো ছিল আমার প্রাপ্য। এখনো কি তাই নয়?

—তুমি জানো তোমায় ভয় করি আমি।

আবার নীরব ওয়ালটার।

—তোমায় ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। জানি না কী চাও! অবশেষে বলে ওয়ালটার।

—নিজের জন্য কিছুই চাই না, ওয়ালটার। আমি চাই না আমারই জন্যে তুমি অসুখী হও।

কেমন যেন প্রস্তর-কঠিন হয়ে ওঠে ওয়ালটার; কণ্ঠ কেমন ভাবাবেশ মুক্ত, অনুভব করে কিটী।

—আমি সুখী নই, এ চিন্তা তোমার ভুল। তোমার কথা চিন্তা করার চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক বেশি কাজ করবার আছে আমার, এখন।

—আমি ভাবছিলুম ঐ কনভেণ্টে গিয়ে কাজ করবার সুযোগ আমিও যদি পেতুম। ওঁদের লোকের খুব অভাব; ওঁদের একটুখানি সাহায্য করতে পারলেও নিজেকে খুবই কৃতার্থ মনে করতুম।

—কাজটা খুব সহজ নয় আর আরামেরও নয়। আমার সন্দেহ আছে, বেশিদিন হয়তো তোমার ভালো লাগবে না।

—আচ্ছা, সত্যি কি তুমি আমাকে এতটা ঘৃণা করো, ওয়ালটার?

—না! একটু ইতস্তত করে ওয়ালটার। কেমন অদ্ভুত তার কণ্ঠস্বর।—ঘৃণা আমার নিজেরই ওপর।

ডিনারের পরে আলোর ধারে বসে বই পড়ছিল ওয়ালটার। প্রতি সন্ধ্যায় এমনি সে পড়ে, কিটী শুতে না যাওয়া পর্যন্ত। বাংলোর একটা খালি ঘরে তার লেবরেটরি—সেখানেই চলে যায় তারপর। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে সেখানে। খুব কমই ঘুমোয় সে। কী যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন সে, জানে না

কিটী। নিজের কাজের প্রসংগে কিটীকে কোন কথাই বলে না ওয়ালটার। অতীতেও এমনি সংবৃতই ছিল ওয়ালটার—আত্মসম্প্রসারণ তার স্বভাববিরুদ্ধ।

ওয়ালটারের কথাগুলোই গভীর ভাবে চিন্তা করছিল কিটী। কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌছয়নি তখনকার আলোচনা। কতটুকুই-বা জানতো কিটী ওয়ালটারকে, তাই তার গুরুত্ব এবং সত্যতা সম্বন্ধেও কৃতনিশ্চিত হতে পারছিল না সে। তার জীবনে ওয়ালটার অশুভ হলেও ওয়ালটারের কাছে তার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে, এও কি সম্ভব? একদিন ওয়ালটার ভালোবাসতো তাকে, তাই আনন্দ পেতো তার কথাবার্তায়; আর আজ সে ভালোবাসা নেই, তাই হয়তো শুধু বিরক্তিই বোধ করে তার কথায়। ওই সব কথা ভাবতে মর্মাহত হয় কিটী।

তাকিয়ে থাকে কিটী ওয়ালটারের মুখের দিকে। ল্যাম্পের আলোতে মুক্তোর মতো ঝলমল করছিল তার প্রতিচ্ছবি। সুসংযত সুবিন্যস্ত গড়ন তার, আরো যেন প্রকট; কিন্তু বড়ো নির্মম, বড়ো হিংস্র; স্থাণুর মতো অচঞ্চল মূর্তি তার আরো যেন ভয়াবহ—বইয়ের পাতার ওপর ন্যস্ত দৃষ্টিই তার শুধু গতিশীল। কিন্তু কে ভাবতে পারে মুখের এই কাঠিন্যের ছাপ আবার ভেসে যায় আবেগের বন্যায়? কিটী জানে, তাই বুঝি কেমন একটা বিরক্তির শিহরণ খেলে যায় তার শিরা উপশিরায়। ওয়ালটার সুশ্রী, সৎ, নির্ভরশীল; উপরন্তু প্রতিভাও আছে তার, অথচ কী অদ্ভুত, তাকেই ভালোবাসতে পারেনি কিটী! তারই আদর সোহাগে নিজেকে আর ছাড়তে হবে না ভেবেও কেমন স্বস্তি আসে মনে।

এখানে আসতে বাধ্য করবার উদ্দেশ্য তাকে হত্যা করা কিনা কিটীর এই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ওয়ালটার, দেবেও না সে। অবাক হয় কিটী, কী এর রহস্য, কেমন আঁতকে ওঠে ভয়ে। দয়ায়

ভরা ওয়ালটারের মন, এমনি দুরভিসন্ধি তার মনে স্থান পেতে পারে কল্পনায়ও তো আসে না কিটীর। কিটীকে ভয় দেখানো বা চার্লি ও তাকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক রসিকতা করবার উদ্দেশ্যই বোধ হয় ছিল ওয়ালটারের। পরে হয়তো শুধু একটা জেদের বশেই এতদূর টেনে নিয়ে এসেছে কিটীকে।

ওয়ালটার বলেছিল, নিজেকেই সে ঘৃণা করে। কিন্তু কেন? কী এর অর্থ? আবার কিটী ফিরে তাকায় ওয়ালটারের সেই প্রশান্ত ভাবলেশহীন মুখের পানে। কোন চেতনা নেই কিটীর সম্বন্ধে, ঘরে আছে কি নেই।

—কেন তুমি নিজেকে ঘৃণা করো ওয়ালটার?

নিজের অজান্তেই জিজ্ঞাসা করে কিটী, যেন কোন বিরতি ঘটেনি তাদের আগেকার আলোচনায়।

বই নামিয়ে রেখে চিন্তাবিষ্ট দৃষ্টিতে কিটীর দিকে তাকায় ওয়ালটার। কোন সুদূর প্রান্ত থেকে যেন নিজের চিন্তার নুড়িগুলো কুড়িয়ে আনে সে।

—হয়তো, তোমাকে ভালোবেসেছিলুম বলে।

আরক্ত হয়ে ওঠে কিটী, মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। ওয়ালটারের সেই শীতল স্থির সন্ধানী দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না কিটী। ওয়াল-টারের মনের কথা বুঝতে পারে সে। কিছু সময় কেটে গেল উত্তর দিতে।

—আমার মনে হয়, আমার ওপর অবিচার করছো ওয়ালটার। আমার নির্বুদ্ধিতা, আমার চপলমতিত্ব আর হীনতার জন্য আমাকেই শুধু দোষ দিয়ে কী লাভ! আমি যে এমনি করেই গড়ে উঠেছিলুম। আমার পরিচিত সব মেয়েরাই যে এমনি……। সংগীতের রসোপলব্ধি করবার অক্ষমতায় যদি কারো সিমফনি অর্কেস্ট্রা ভালো না লাগে, তাকে দোষ দিয়ে কী লাভ? এও যে ঠিক তেমনি। তুমি যা চেয়েছিলে আমার ভেতর, তা নেই বলে

কেন অপরাধী করছো আমায়? আমি যা নই তাই বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে তোমাকে প্রতারিত করতে তো কখনো চাইনি! আমি ছিলুম একটু চপল, একটু উচ্ছল। মেলায় গিয়ে মুক্তোর হার বা ফার-কোট খোঁজ না নিশ্চয়ই, সেখানে তো শুধু খেলনা-ঢোলক আর বেলুন।

—তোমাকে কোন দোষ আমি দিইনি। বলে ওয়ালটার। কণ্ঠে কেমন যেন শ্রান্তি আর অবসাদ। মনে মনে একটু অধৈর্য হয়ে ওঠে কিটী। মৃত্যুর করাল ছায়া ঘিরে আছে তাদের; সেই আতংক, সেই পরম-রূপের বিস্ময়-অনুভূতি, যা কিটী উপলব্ধি করতে পেরেছে এই সেদিন, তার কাছে তাদের এই ব্যক্তিগত পাওয়া-না-পাওয়া যে কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর তা কি বুঝতে পারে না ওয়ালটার? কী আসে যায় একটা নির্বোধ মেয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায়? আর কেনই-বা তারই স্বামী অসীমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এই তুচ্ছ জিনিসকে স্থান দিয়েছে তার চিন্তায়! এত বুদ্ধি সত্ত্বেও এইটুকু পরিমিতি জ্ঞানের অভাব ওয়ালটারের, এটা খুবই যে আশ্চর্য লাগে কিটীর! একটা পুতুলকে সাজিয়ে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো দিয়েছে ওয়ালটার। তারপর যখন আবিষ্কার করেছে এ দেবী নয় শুধু কাঠের গুঁড়ো ভর্তি একটা পুতুল, পারেনি ক্ষমা করতে সে নিজেকে বা ঐ পুতুলটিকে। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে তার অন্তর। শুধু একটা মিথ্যার আকাশ-কুসুম দেখে এসেছে ওয়ালটার। কিন্তু যখনই বাস্তবের আঘাতে খান-খান হয়ে গিয়েছে সেই মিথ্যার বুনট, মনে হয়েছে অবলুপ্তি হয়েছে সত্যের। এইটাই ওয়ালটারের কাছে কঠোর এবং নির্মম সত্য যে, নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি বলেই ক্ষমা করতে পারেনি কিটীকে।

কিটীর মনে হোল ওয়ালটার একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে, চকিত দৃষ্টিতে তাকালো সে ওয়ালটারের মুখের দিকে। একটা

চিন্তার ঝলক খেলে গেল তার মনে, সংগে সংগে যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো কিটীর। একটা গভীর আর্তনাদের বেগ সংযত করলো সে। এই কি ভগ্ন-হৃদয়? তবে কি সত্যি ভেঙে গিয়েছে ওয়াল-টারের মন?

পরদিন সারাটা বেলা কিটী ভেবেছে ঐ কনভেণ্টের কথা। তারপর পরদিন খুব ভোরে, ওয়ালটার তখন বেরিয়ে গেছে, আয়াকে সংগে নিয়ে নদীর ওপারে গেল কিটী। দিনের আলো ফুটে ওঠেনি তখনো পুরোপুরি। চীনেরা ভিড় করেছে খেয়াঘাটে, কারো-বা কিষাণের নীলসুতির পোশাক, আবার কারো পরিধানে আভিজাত্যের কালো পরিচ্ছদ—চোখে তাদের মৃতের মতো অদ্ভুত দৃষ্টি, কোন ছায়াঘেরা জগতে বুঝি ভেসে চলেছে তারা জলের ওপর দিয়ে। পারে পৌঁছেও পারঘাটে অনিশ্চিতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, বুঝি জানে না কোথায় যাবে তারা; তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এলোমেলো ভাবে এগিয়ে চলে পাহাড়ের দিকে।
সহরের রাস্তাগুলো একেবারেই জনশূন্য, যেন মৃত্যুপুরী। পথচারিদের কেমন এক নিস্পৃহ গতি, মনে হবে বুঝি-বা এরা সব প্রেতাত্মা! আকাশ নির্মেঘ, প্রাতঃসূর্যের প্রভাতী আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। ঐ প্রশান্ত হাস্যমধুর প্রভাতে ভাবতেও বিস্ময় লাগে, কণ্ঠরুদ্ধ মৃতপ্রায় ব্যক্তির মতো ঐ সহরটাও মহামারির করাল কবলে পড়ে ধুঁকছে। বিশ্বাস হয় না, মানুষ যখন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে, প্রকৃতি, (আকাশের ঐ নীলিমা যে শিশুর অন্তঃকরণের মতোই নির্মল) নির্বিকার দাঁড়িয়ে তাই দেখছে!

কনভেন্টের দরজায় চেয়ার নামাবার সংগে সংগেই একটা ভিখারী এসে দাঁড়ায় কিটীর কাছে ভিক্ষা চাইতে। রঙচটা শতছিন্ন কন্থা ওর পরণে; কোন জঞ্জাল ঘেঁটে বুঝি কুড়িয়ে এনেছে। ছেঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় ওর গায়ের কঠিন চামড়া, ট্যান করা ছাগলের চামড়ার মতো। খালি পা দুটোও শুকনো জির-জিরে, রুক্ষ পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা, গাল বসে গিয়েছে, দৃষ্টি উদভ্রান্ত; কী জানি হয়তো পাগল! ভয় চকিতে সরে দাঁড়ায় কিটী। .চয়ার-বেহারাগুলো কর্কশ কণ্ঠে তাড়া করে; কিন্তু নাছোড়বান্দা সে। শুধু ওর কাছ থেকে রেহাই পেতেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কয়েকটি পয়সা ছুঁড়ে দেয় কিটী।

দরজা খোলার সংগে সংগেই আয়া জানালো মাদারের সংগে দেখা করতে চায় কিটী। সেই রুদ্ধ-অন্ধকার বসবার ঘরে নিয়ে যায় মাদেব, কোনদিন বোধ হয় এর জানলা খোলা হয়নি। বসে থাকতে থাকতে ভাবনা হয় কিটীর, হয়তো খবরই পৌঁছয়নি মাদারের কাছে। অবশেষে মাদার এলেন।

এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি আসবেন আশা কবিনি। একটু ব্যস্ত ছিলুম।

—আপনাকে বিরক্ত করলুম বলে ক্ষমা করবেন। সত্যি খুবই অসময়ে এসে পড়েছি।

একটু মৃদু হাসি খেলে গেল মাদারের চোখে মুখে, সংযত হলেও বড়ো মিষ্টি সেই হাসিটুকু। বসতে বললেন কিটিকে। কিন্তু কিটী লক্ষ্য করলো ওঁর দুটি চোখই কেমন ফোলা ফোলা। কাঁদছিলেন হয়তো! চমক লাগে কিটীর! তার ধারণা ছিল এই মহীয়সী নারীকে পার্থিব কোন কিছুই বুঝি স্পর্শ করতে পারে না।

—আমার মনে হচ্ছে কী যেন একটা অঘটন ঘটেছে। আজ আসি! না হয় অন্য এক সময় আসবো।

—না, না, সে কী! বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য। এ কিছু নয় শুধু.........আমাদের একজন সিসটার কাল রাত্রে মারা গিয়েছেন!

কেমন কেঁপে ওঠে তাঁর কণ্ঠ, সজল হয়ে ওঠে তাঁর দুটো চোখ।

—এমনি শোক করা আমার খুবই অন্যায়! আমি তো জানি মহীয়সী ছিলেন তিনি, তাঁর মহৎ এবং সরল আত্মার স্বর্গলাভ হয়েছে। কিন্তু দুর্বলতা যে সব সময় সংযত করা যায় না। একটু দুর্বলতা এসে গেছে বুঝতে পারছি।

—আমি দুঃখিত। সত্যি আমি ভীষণ দুঃখিত! বলে কিটী। সমবেদনার কান্নায় ভরে আসে তার কণ্ঠ।

—সেই দশ বছর আগে ফ্রান্স থেকে আমার সংগে যে কজন এসেছিল সে তাদেরই একজন। আর মাত্র তিনজন আমরা রইলুম পড়ে! মনে পড়ে, সবাই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম জাহাজের এক কোণে। ধীরে ধীরে জাহাজ ছেড়ে এলো মার্সাই বন্দর। 'সন্ত-মেরী-লা-গ্রেস'-এর স্বর্ণমূর্তির দিকে তাকিয়ে সবাই একসংগে প্রার্থনা করেছিলুম। দীক্ষা নেওয়ার সময় একটা বড়ো আকাংক্ষা ছিল আমার চীনে আসবার; কিন্তু যখন দেশের মাটির শেষ চিহ্নটুকুও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে বহুদূরে, রোধ করতে পারিনি আমি কান্নার বেগ। আমি দলের নেত্রী, এ আমার পক্ষে খুবই অশোভন, বিশেষ করে সংগের মেয়েদের কাছে! সেই সময় সিসটার সন্ত ফ্রান্সিস জেভিয়ার—ইনিই কাল রাত্রে মারা গেছেন—আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে বলেছিলেন, দুঃখ কিসের, যেখানেই যাই ফ্রান্স থাকবে আমাদের সংগে, আর রইলেন ভগবান।

গভীর শোকানুভূতি উদ্বেল করে তুলে তাঁর স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, কিন্তু আবার বিচার আর বিশ্বাস এসে প্রতিরোধ করে অশ্রুর বন্যা। সেই দ্বিধাবিভক্ত অনুভূতির সংঘর্ষই বুঝি বিকৃত করে দেয় তাঁর

কঠোর সুষমা-মণ্ডিত মুখশ্রী। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় কিটী। ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বে উঁকি দেওয়া অশোভন মনে হয় তার।

—ওর বাবার কাছে চিঠি লিখছিলুম। আমারই মতো মায়ের একমাত্র মেয়ে ও। ব্রিটানির এক জেলে পরিবারের মেয়ে। এই সংবাদ ভীষণ ভাবে লাগবে ওদের। উঃ, এই ভয়াবহ মহামারি যে কবে বন্ধ হবে! আমাদের আরো দুটি মেয়ে আক্রান্ত হয়েছে এই সকালে, এক দৈবানুগ্রহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারবে না এদের। আর এই চীনাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি আদৌ নেই। সিসটার জেভিয়ারকে হারিয়ে মর্মান্তিক ক্ষতি হয়েছে আমাদের। কত কাজ করবার আছে, অথচ কাজ করবার মতো লোক আর কই? চীনের বিভিন্ন মঠে আমাদের আরো অনেক ভগ্নী আছে এবং সবাই এখানে আসতে উদগ্রীব। আমি জানি, আমাদের এই সংঘের মেয়েরা দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও এখানে আসতে প্রস্তুত; কিন্তু এখানে আসা মানে অবধারিত মৃত্যু। কাজেই যারা আছে এখানে তাদের নিয়েই যতক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে পারবো অন্য কাউকে ডেকে এনে বলি দিতে আদৌ ইচ্ছা নেই আমার।

—এতে আমি একটু ভরসা পাচ্ছি, *ma mere*, বলে, কিটী। আমি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলুম খুবই দুঃসময়ে আমি এসেছি এখানে। সেদিনও আপনি বলছিলেন যে-কজন সিসটার আপনার আছে তার চেয়েও বেশি কাজ আপনার হাতে; তাই আমি ভাবছিলুম এদের একটুখানি সাহায্য করতেও যদি আপনার অনুমতি পেতুম! শুধু যদি একটু কাজে আসতে পারি, তাহলে যে কোন কাজই হোক-না কিছু মনে করবো না আমি। ঘর মোছার কাজ পেলেও কৃতজ্ঞ থাকবো আমি।

একটু মুচকি হাসলেন মাদার। অবাক হয়ে গেল কিটী এঁর

এমনি পরিবর্তনশীল প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে—যা ভাবান্তরে বিচরণ করতে পারে অতি সহজেই।

—ঘর মোছার দরকার হবে না এখানে। এ কাজ অনাথ শিশুরা নিজেরাই করে।······

তারপর একটু থেমে সদয় দৃষ্টিতে কিটীর দিকে তাকিয়ে বললেন: লক্ষ্মী মেয়ে, এই কথাটাই কি বুঝতে পারো না স্বামীর সংগে এখানে এসে কত বড় কাজ করেছো তুমি? অনেক স্ত্রীরই এমনি সাহস হোত কিনা সন্দেহ! সারাদিনের পর ক্লান্তি নিয়ে স্বামী ফিরবেন ঘরে তোমার কাছে, তখন তাকে একটুখানি আরাম, এতটুকু শান্তি দেওয়ার চেয়ে বড় কাজ কী আর থাকতে পারে তোমার বলতো? বিশ্বাস করো, তখন তাঁর একান্ত প্রয়োজন তোমার ভালোবাসা, তোমার একটুখানি সহানুভূতি।

মাদারের সমম স্থিরদৃষ্টির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না কিটী।

—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার করবার মতো সত্যিকার কিছুই থাকে না। আমি মনে মনে অনুভব করি, এত কাজ রয়েছে অথচ শুধু আলসেমিতেই আমি দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছি—এই চিন্তাটুকুও কেমন যেন অসহনীয় মনে হয়; নিজেকে এতটা অপদার্থ বলে মেনে নিতে চাইনা। আর এও আমি জানি যে আপনার মূল্যবান সময় বা আপনার দয়া কোনটার ওপরই আমার দাবি নেই একটুও; কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্যিই আমার অন্তরের কথা। তাই বলছিলুম, আপনাকে সাহায্য করবার একটুখানি অধিকারও যদি পাই তবে এটা আপনারই দেওয়া দান বলে গ্রহণ করে কৃতার্থ হবো।

—তোমাকে খুব সবল মনে হয় না দেখতে। পরশুদিন প্রথম তোমায় দেখেই কেমন যেন পাংশু মনে হয়েছিল। সিসটার জোসেফ বলছিল হয়তো তুমি সন্তান-সম্ভবা।

—না, না……চিৎকার করে ওঠে কিটী; সারা মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

একটু রুপোলি হাসির ঝলক খেলে গেল মাদার সুপিরিয়র-এর ঠোঁটের কোণে।

—দুষ্টু মেয়ে, এতে লজ্জার কী আছে? আর মনে করাটাও এমন কী অস্বাভাবিক! কদ্দিন বিয়ে হয়েছে তোমার?

—স্বভাবতই আমি একটু ফ্যাকাশে দেখতে, তাই অমনি মনে হয়েছে। যথেষ্ট শক্তি আছে আমার, দেখবেন কাজ করতে একটুও কষ্ট হবে না।

আপন সত্তায় আবার ফিরে এলেন মাদার। তাঁর স্বভাবজাত কর্তৃত্ববোধ প্রকাশ পেলো তাঁরই অজান্তে। পরীক্ষার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন তিনি কিটীকে। একটু থতমত খেয়ে গেল কিটী।

—চীনা ভাষা বলতে পারো তুমি?

—না। উত্তর দেয় কিটী।

—খুবই দুঃখের কথা। বয়স্থা মেয়েদের দেখাশুনোর ভার দেওয়া যেতো তোমাকে। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার পক্ষে তো খুবই কঠিন হবে দেখছি। এরা—কী যেন বলে—হ্যাঁ, এরা তোমার আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে।

—নার্সিং-এ সিসটারদের সাহায্য করতে পারি না কি? কলেরাকে ভয় করি না। শিশুদের অথবা সৈনিকের পরিচর্যার ভারও নিতে পারি আমি।

চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন মাদার। মুখে হাসি নেই আর।

—কলেরা যে কী তুমি জানো না। এ একটা ভীষণ মারাত্মক জিনিস। হাসপাতালের কাজ সৈনিকরা নিজেরাই দেখছে, শুধু পরিচালনার জন্য একজন সিসটার আছেন। আর অনাথ আশ্রমের মেয়েদের……না, না, তোমার স্বামী এ ব্যবস্থা মোটেই

পছন্দ করবেন না ; তুমিও সহ্য করতে পারবে না। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার।

—দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যাবে।

—না, সে হয় না। এ আমাদেরই কাজ, শুধু আমাদেরই সাজে ; সেবাব্রত আমাদেরই নিজস্ব জিনিস। এতে প্রবেশ করবার অনুমতি নেই তোমার।

—আপনার কথায় বড়ো অপদার্থ বড়ো অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। কোন মতেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না যে, আমি করতে সক্ষম এমন কোন কাজই নেই এখানে।

—তোমার স্বামীর মত নিয়েছো ?

—হ্যাঁ।

মাদার তাকালেন কিটীর দিকে, যেন ওর অন্তরের সবটুকু গোপন কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো সে দৃষ্টিতে। কিন্তু কিটীর দৃষ্টিতে উদ্বেগ আর আবেদনের আভাস দেখে একটু মৃদু হাসলেন তিনি।

—তুমি প্রোটেস্টান, কেমন না ?

—হ্যাঁ।

—সে যাক। ওয়াটসনও—সেই মিশনারি ডাক্তার, যিনি মারা গিয়েছেন—প্রোটেস্টান ছিলেন, কোনো অসুবিধা হয়নি তাতে। তাঁর চরিত্রের মাধুর্যে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলুম। গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ আমরা সবাই তাঁর কাছে।

এক ফালি হাসির ছায়া ফুটে উঠলো কিটীর মুখের ওপর। কিন্তু কোন কথা বললো না সে। কী যেন চিন্তা করছিলেন মাদার। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—বেশ, ভালো কথা। তোমার করার মতো কাজ দিতে পারবো আশা করি। সিসটার ফ্রান্সিসও চলে গেল, সত্যি সব কাজ সামলে ওঠা মুস্কিল হবে আমাদের। কবে থেকে আসতে পারবে তুমি ?

—এখনই…!

—খুব খুশি হলুম তোমার কথা শুনে।

—আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার সাধ্যমতো আমি করবোই। সত্যি, যে সুযোগ আপনি আমায় দিচ্ছেন তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

বারান্দার দরজা খুলে দিলেন মাদার সুপিরিয়র। কিন্তু বাইরে যেতে যেতে কেমন ইতস্তত করলেন তিনি, আবার একবার তাকালেন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কিটীর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে কিটীর বাহুতে ছোঁয়ালেন তাঁর হাতের স্পর্শ।

—দেখ, মা, সব চেয়ে বড়ো কথা কী জানো—শান্তি পাবে না তুমি কাজের ভেতর, শান্তি নেই আমোদ-প্রমোদে, কোথাও নেই শান্তি এই ভুনিয়ায়। না এই কনভেন্টের ভেতরও নয়। খুঁজে দেখো শান্তি পাবে শুধু তোমার ঐ অন্তরে!

কেমন চমকে ওঠে কিটী। কিন্তু তখনই তড়িত বেগে বেরিয়ে গেলেন মাদার সুপিরিয়র।

আত্মার পরিতৃপ্তি পেলো কিটী তার কাজে। প্রতিদিন ভোরে সূর্য ওঠবার একটু পরেই চলে যায় সে কনভেন্টে, আর ফিরে আসে দিনান্তে অস্তোমুখী সূর্য যখন সোনালি আলোর আবরণ বিছিয়ে দেয় অপরিসর ক্ষুদ্র নদী আর তারই বুকে ভিড় করা অসংখ্য নৌকাগুলোর ওপর।

মাদার ছোট ছোট শিশুদের দেখবার ভার দিয়েছেন তাকে। কিটীর মা তাঁর স্বদেশ লিভারপুল থেকে ঘর সংসার করবার একটা ব্যবহারিক জ্ঞান লণ্ডনে নিয়ে এসেছিলেন, এবং কিটীর স্বভাবজাত চাপল্য সত্ত্বেও এমন কতকগুলো উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া গুণ

ছিল, যে জন্যে অনেক সময়ই ঠাট্টা করতেন তিনি। সেই উত্তরাধিকারের মধ্যে সূচিকার্যে দক্ষতা একটী। কিটীর এ গুণের কথা যখন প্রকাশ পেলো ছোট মেয়েদের সূচিকাজ তদারকের কাজও পেলো সে। দুটো একটা ফরাসী কথা জানতো ওরা, আর কিটীও চীনা শব্দ দু চারটা আয়ত্ব করে নিলো দিনে দিনে ; কাজেই কোন অসুবিধা হোল না কাজে। ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর নজর রাখা, ওদের পোশাক বদলে দেওয়া, বিশ্রামের সময় বিশ্রামের ব্যবস্থা করা এও ছিল তারই কাজ। আয়ার তত্বাবধানে ছোট শিশুদের দিকে নজর রাখাও তার কাজের একটা অংশ। এই সব গুরুত্বহীন কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিটীর মন চাইতো এর চেয়েও কষ্টসাধ্য কোন কাজের দায়িত্ব। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না মাদারের এ দিকে, কাজেই কিটীও সাহস পেতো না কিছু বলতে।

প্রথম কদিন এই সব মেয়েগুলোর প্রতি একটা ক্ষীণ বিতৃষ্ণার ভাব দূর করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে কিটীকে। এদের সেই কুৎসিৎ পোশাক, রুক্ষ কালো কালো চুল, হলদে গোল মুখ, কালো চোখের অবাক দৃষ্টি সহ্য করতে পারেনি সে। কিন্তু তার মনে পড়ে সেই প্রথম দিনকার দৃশ্য ; এই কুৎসিত শিশুগুলো দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মাদার সুপিরিয়র-এর করুণ দৃষ্টি কেমন রূপান্তরিত করে দিয়েছিল তাঁর চেহারা। তাই নিজের এই উপজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পন করে না কিটী। তারপর ধীরে ধীরে এই ক্রন্দনরত শিশুদের কোলে তুলে নিয়ে যখন বুঝতে পারে, দুটি একটি মিষ্টি কথা—অবোধ্য হলেও, হাতের একটু মৃদু চাপ, গালের একটু নরম স্পর্শ পেলেই ওরা আরাম পায়, শান্ত হয়, তখন সেও ভুলে যায় তার বিরক্তি। শিশুরাও নির্ভয়ে আসে তার কাছে নিজ নিজ শিশুসুলভ অভাব অভিযোগ নিয়ে ; তাদের সেই নির্ভরতা বিচিত্র পুলকের এক অনুভূতি জাগিয়ে দেয় তার মনে। যাদের

সে সেলাই শেখায় সেই বড় মেয়েদের সম্বন্ধেও এমনি ভাব মনে আসে তার। তাদের উজ্জ্বল বুদ্ধি-দীপ্ত হাসি, প্রশংসালব্ধ আনন্দের প্রকাশ, খুবই স্পর্শ করে কিটীকে। ওরা তাকে চায় বুঝতে পারে কিটী; পাওয়ার গর্বে গর্বিতা কিটীও প্রতিদানে বিলিয়ে দেয় তার অন্তরের স্নেহ মমতা।

কিন্তু এদেরই ভেতর একটি শিশুকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেনি কিটী। ছয় বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে, হাবা, ছোট্ট লিকলিকে দেহটার ওপর বিরাটাকৃতি একটা মাথা, ভারে আন্দোলিত, বড় বড় চোখে শূন্য অর্থহীন দৃষ্টি; কর্কশ কণ্ঠে অবোধ্য জড়ানো দুটো একটা কথা বলে মাত্র; কেমন যেন ভীষণ; কী জানি কেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ওর কিটীর ওপর। মস্ত ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়েও রেহাই নেই, সব সময়ই পিছু পিছু থাকে। তার স্কার্টের কোণ ধরে থাকে, কখনো বা মুখ ঘসে কিটীর হাঁটুতে। কিটীর হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে খেলা করতে চায়। বিতৃষ্ণায় শির-শির করে ওঠে কিটীর সর্বশরীর। সে বুঝতে পারে একটুখানি আদরের জন্য লালায়িত ঐ হাবা শিশুটি, কিন্তু ওকে স্পর্শ করতেও মন চায় না তার।

একদিন কিটী কথা প্রসংগে সিসটার জোসেফকে বলেছিল কেনই বা বেঁচে আছে এই হতভাগ্য শিশুটি। সিসটার একটু হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ঐ বিকলাংগ হতভাগ্য শিশুটির দিকে। এগিয়ে এসে ঐ হতভাগ্য জীবটি তার উঁচু কপাল রগড়ে দিলো ঐ প্রসারিত হাতে।

—বেচারি! সিসটার বললে।—মরবার মুখেই একে এখানে নিয়ে এসেছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ঠিক সেই সময়ই আমিও উপস্থিত ছিলুম দোরের কাছে। একটুও সময় নেই বুঝে তখনই ব্যাপটাইজ করার ব্যবস্থা করেছিলুম। আপনি বিশ্বাস করবেন না একে বাঁচিয়ে তুলতে কী কষ্টই-না পেতে হয়েছে আমাদের।

কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি ওর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

নীরব রইলো কিটী। নিজস্ব হালকা-মনে অনেক কথাই বললো সিসটার জোসেফ। পরদিন আবার যখন সেই বিকলাংগ হাবা মেয়েটা তার কাছে এলো, কিটী নিজেকে সামলে নিয়ে ওর বিরাট মাথাটায় আদর করে একটু হাত বুলিয়ে দিলো। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও আনলো সে। কিন্তু হঠাৎ শিশুটি অদ্ভুত বিরক্তিতে ছুটে পালিয়ে গেল তার কাছ থেকে। কিটীর ওপর যেন কোন টান রইলো না আর। এরপর থেকে আর আসেনি তার কাছে। বুঝতে পারলো না কিটী কী সে করেছে। হাসিতে ইংগিতে অনেক ভাবেই ওকে আকর্ষণ করতে চেয়েছে কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে যেন দেখতেই পায়নি কিটীকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মব্যস্ততার জন্য চ্যাপেলে উপাসনার সময় ছাড়া সিসটারদের সংগে কদাচিত দেখা হয় কিটীর। প্রথম দিনই বয়স অনুপর্যায়ে উপবিষ্ট মেয়েদের পেছনে সর্বশেষ সারিতে তাকে বসে থাকতে দেখে কাছে এসে দাঁড়ালেন মাদার। মাদার বললেন :

—আমাদের সংগে চ্যাপেলে আসার দরকার নেই তোমার। তুমি প্রোটেস্টান, নিজস্ব ধর্মমত থাকতে পারে তোমার।

—কিন্তু মাদার, আমার যে আসতে বড়ো ভালো লাগে! দেখেছি, এখানে এলে মনে বড়ো শান্তি পাই আমি।

একটা ক্ষণিকের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাঁর মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললেন :

—যা ভালো লাগে তা করবার স্বাধীনতা রয়েছে তোমার।

তবে আমি বলছিলুম এতে তোমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কিন্তু অল্পদিনের ভেতরই ঘনিষ্ঠতা না হলেও কিটী সিসটার সন্ত জোসেফের সংগে খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কনভেন্টের অর্থনৈতিক পরিচালনার ভার ওরই ওপর, তাই এই বিরাট পরিবারের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের বিধিব্যবস্থা করতেই দিনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়ে যেতো জোসেফের। ও বলতো দিনের মধ্যে শুধু উপাসনার সময়টুকুই নাকি ওর বিশ্রামের সময়। কিন্তু বিকেলের দিকে কনভেন্টের মেয়েদের নিয়ে যখন কিটী কাজে বসতো, সিসটার জোসেফ গল্পগুজবে কাটিয়ে যেতো কিছুটা সময়। সব সময় তার মুখে একই কথা, মরবারও নাকি ফুরসত নেই তার! মাদার কাছে না থাকলে হাস্যকৌতুকে উচ্ছল আর বাঙ্ময় হয়ে উঠতো সিসটার জোসেফ। এমনকি পরচর্চাতেও আপত্তি ছিল না তার। কিটীকে ভয় করবার কিছু ছিল না; বরং গল্প গুজবে মেতে উঠতো তার সংগে। কিটীর অশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে ভুল ধরতে ইতস্তত করতো না। এমনকি তাদের হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াতো। সিসটার রোজই কিটীকে নূতন নূতন চীনা শব্দ শেখাতো। কৃষকের মেয়ে সিসটার জোসেফ, মনে প্রাণে তাই সে কৃষকের মতোই সরল।

—সন্ত জোয়ান-অব-আর্কের মতো ছেলেবেলায় আমিও গোরু চড়াতুম। বলে সে।—কিন্তু ওঁর মতো স্বপ্ন দেখতে পেতুম না এই যা রক্ষে; নইলে বাবা আমায় চাবকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। যা দুষ্টু আমি ছিলুম, বুড়ো বাবার কী মারই আমি খেয়েছি এই দুষ্টুমির জন্য। ছেলেবেলাকার এই সব দুষ্টুমি আর বদমায়েসির কথা মনে করতেও কেমন যেন লজ্জা বোধ হয় এখন।

বিশালকায়া মধ্যবয়সী ভিক্ষুনী মেয়েটিও একদিন অসংযত এক শিশু ছিল ভাবতেও হাসি পায় কিটীর। কিন্তু তার স্বভাবের

শিশুসুলভ সরলতার জন্যই আকর্ষণ করে সে সবাইকে। হেমন্তে যখন ফলভারে নুয়ে পড়ে আপেল গাছগুলো আর মাঠের ফসল ওঠে গোলায়, গ্রাম্যজীবনের সেই সৌরভ যেন সব সময় ঘিরে থাকে তাকে। মাদার সুপিরিয়রের মতো বিষাদময়ী অতি সংযমী সন্ন্যাসিনীর আভাস মাত্রও নেই তার ভেতর ; কিন্তু আছে একটা সরল এবং সদা আনন্দময় ভাবের প্রকাশ।

—আচ্ছা, আপনার কি একবারও দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, *ma sœur* ? জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—কই নাতো! তাহলে যে ফিরে আসাই কষ্টকর হবে! এখানেই ভালো লাগে আমার, এই অনাথ শিশুগুলোকে নিয়েই আনন্দ পাই বেশি, এদের নিয়েই আমি সুখী। সত্যি এরা কত ভালো কত কৃতজ্ঞ! সন্ন্যাসিনী হওয়া ভালো (*on a beau etre religieuse*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ন্যাসিনীরও মা আছে, সেও ভুলতে পারে না একদিন মায়েরই স্তন্যপান করেছে সে। আমার মা খুবই বুড়ো হয়েছেন এতদিনে। দুঃখ হয়, আর তাঁকে দেখতে পাবো না কখনো। পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সুখেই আছেন হয়তো তিনি, আমার ভাইটিও খুব ভালোবাসে মাকে। ভাইয়ের ছেলেও নিশ্চয় বড় হয়েছে এতদিনে, খামারে কাজ করবার আরো একটি লোক পেয়ে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়েছে তারা। আমি যখন দেশ ছেড়ে আসি তখন আমার ভাইপোটি একেবারে ছোট্টটি ছিল, তবু কী শক্তি দেখেছি ওর দুই হাতে!

শান্ত নির্জন ঘরটায় বসে ঐ সদালাপী সন্ন্যাসিনীর কথা শুনতে শুনতে মনেও আসেনি কখনো এই ঘরেরই চার দেয়ালের বাইরে তখন চলছে কলেরা মহামারির তাণ্ডব নৃত্য। সিসটার জোসেফের চরিত্রে ছিল এমনি একটা নির্বিকার ভাব যে নিজের ভেতরেও যেন সংক্রমণ অনুভব করে কিটী।

দুনিয়াকে জানবার, মানুষকে চিনবার কেমন একটা সহজাত

প্রবৃত্তি এবং আকাংক্ষা ছিল সিসটার জোসেফের ভেতর। কিটীকে তাই সে অবিরত প্রশ্ন করেছে অনেক কিছু, লণ্ডন আর ইংলণ্ড সম্বন্ধে। তার ধারণা এক বিচিত্র দেশ ইংলণ্ড, যেখানে নাকি ঘন কুয়াশায় দিনের বেলায়ও নিজের হাত চোখে দেখা যায় না। তার জানতে ইচ্ছে করে কিটী কখনো বল-নাচে গিয়েছে কিনা, তারা কটি ভাই বোন, তার বাড়িটা কি খুব বড় ইত্যাদি এমনি কত কী কৌতূহল। ওয়ালটারের কথাও বলে সে অনেকবার : মাদার বলেন, অপূর্ব লোক ডাঃ ফেন। তাঁর মংগলের জন্য সবাই তাঁরা প্রার্থনা করেন। কিটীর সৌভাগ্য এমনি মহৎ, উদার, বুদ্ধিমান স্বামী পেয়েছে সে!

কিন্তু একসময় সন্ত জোসেফ আবার ফিরে যায় মাদারের প্রসংগে। গোড়া থেকেই কিটী বুঝতে পেরেছে কনভেণ্টে এই মহিলার ব্যক্তিত্বই প্রধান। এই কনভেণ্টের সবাই এঁকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ভয় এবং বিস্ময়ের অনুভূতিও আছে সবার মনে। দয়াপরবশ হলেও তাঁর সমুখে কিটী নিজেকে মনে করে ইস্কুলের মেয়ের মতো। তাঁর সান্নিধ্যে কখনো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না কিটী। কেমন যেন একটা বিস্ময়ের আবেগ অপ্রতিভ করে দেয় তাকে। কিটীর মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার ইচ্ছা থেকেই সিসটার জোসেফ বলেছে কত বড়ো অভিজাত পরিবার থেকে মাদার এসেছেন। এঁর পূর্বপুরুষদের অনেকেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইয়োরোপের রাজাদের অনেকের সংগেই ছিল এঁর রক্তের সম্পর্ক, *un peu cousine*। স্পেনের আলফানসো অনেকবারই নাকি ওঁর বাবার সংগে শিকারে গিয়েছে, আর ফ্রান্সের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাদের অনেকগুলো স্যাতো। এই সব আভিজাত্য

ছেড়ে আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে তাঁর। মৃদু হাসতে হাসতে কিটী শুনলো সব কথা কিন্তু একটুও অভিভূত হোল না।

সিসটার বললে *Du reste,* শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন *comme famille, c'est le deesus du panier*

—ওঁর হাত দুটোর মতো এত সুন্দর হাত কিন্তু আর আমি দেখিনি কখনো। বলে কিটী।

—হায়রে, যদি জানতেন কী কাজে তিনি লাগিয়েছেন তাঁর এই সুন্দর হাত দুটো! কাজকে তিনি ভয় করেন না একটুও, *notre bonne mere*।

এই সহরে প্রথম যখন তারা আসে কিছুই ছিল না এখানে। তাদের চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে এই কনভেণ্ট। এর পরিকল্পনা করেছেন মাদার নিজে এবং এর কাজের তদারকও করেছেন তিনিই। এখানে আসবার পরমুহূর্ত থেকেই অনাকাংক্ষিত মেয়েগুলোকে বেবি-টাওয়ার ও ধাত্রীর নিষ্ঠুর হাত থেকে রক্ষা করার কাজে ব্রতী হয়েছে তারা। ঘুমোবার বিছানা ছিল না সেদিন তাদের। প্রথম দিকে রাত্রের হাওয়া নিরোধ করবার জন্য জানালায়· কাঁচ ছিল না ঘরগুলোতে। অর্থের অভাবে অনেক সময়ই মিস্তিরিদের মজুরি মেটাতে পারেনি, নিজেদের দুমুঠো আহারের ব্যবস্থা তো নয়ই। কৃষকদের মতোই সহজ জীবনযাত্রা ছিল তাদের। দেশে তার বাবার খামারে যেসব চাষী মজুর কাজ করতো এসব খাদ্য তারাও হয়তো ফেলে দিতো শুয়োরের খাবারের জন্য। এরই ভেতর মাদার সুপিরিয়র তাঁর সব মেয়েদের নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতেন ; আর মা মেরীই বুঝি সব সংস্থান জুগিয়ে দিতেন তাদের। পরদিনই হয়তো ডাকে হাজার ফ্রাঙ্ক এসে পৌঁছতো ; অথবা হয়তো তারা যখন উপাসনায় বসতো কেউ না কেউ আগন্তুক ইংরেজ (প্রোটেস্টান)

বা কোন দেশীয় চীনাম্যান কিছু-না-কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসে হাজির হতো তাদের দোর গোড়ায়। একদিন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল তারা যে, বাধ্য হয়ে মানত করেছিল মা মেরীর নামে। বিশ্বাস হবে কি? ঠিক পরদিনই ঐ আমুদে ওয়াডিংটন এসে হাজির একশত ডলার নিয়ে!

সিসটার বলছিল। কেমন মজার লোক ঐ ভদ্রলোকটি—মাথা ভরা টাক আর ছোট ছোট ক্রুর চোখ দুটি (*ses petits yeux malins*) হায় ভগবান, *Mon Dieu* কী নির্দয়ভাবেই না এ ভদ্রলোক ফরাসী ভাষাটাকে হত্যা করেন, অথচ মজা এই, এঁর কথায় না হেসে উপায় নেই। সব সময় ফূর্তি ভরা ওঁর মন। এত বড়ো একটা ভীষণ মহামারির ভেতরও এমন একটা হালকা ভাব দেখিয়ে চলেছেন যেন ছুটি উপভোগ করছেন। ওঁর অন্তকরণ ঠিক ফরাসীদেব মতো, আর রসজ্ঞান এমনি, মনেই হবে না উনি ইংবেজ। সিসটার জোসেফ অনেক সময় মনে কবতো হয়তো শুধু হাসাবার জন্যেই অমনি কথা বলেন মিঃ ওয়াডিংটন। কিন্তু ওঁব নৈতিক দিকটা খুব সর্বজন গ্রাহ্য নয়। তবে ওটা তার নিজস্ব ব্যাপার। বলেই নিশ্বাস ফেলে শ্রাগ কবে একটু মাথা নাড়ে সিসটার জোসেফ। বয়সে যুবক, আবার অবিবাহিত, কাজেই…

—ওঁর নৈতিক দোষটা কী, *ma sœur*? হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—সে কী কথা, আপনি জানেন না? থাক, ওসব কথা বলা আমার পাপ। আর ওসব কথা বলার আমার প্রয়োজনই বা কী! উনি একজন চীনা মেয়েকে নিয়ে থাকেন, চীনা ঠিক নয়, মাঞ্চু বলতে পাবেন। বোধ হয় কোন রাজকুমারী। তবে খুব ভালোবাসে ওঁকে।

—এ কিন্তু অসম্ভব! একটু জোরেই বলে ওঠে কিটী।

—না, না, বলছি আপনাকে, এর সবটুকুই সত্যি। ব্যাপারটা

খুব বিশ্রী বটে। সাধারণত ওরকম কেউ করে না। কেন, আপনার কি মনে নেই সেই প্রথম দিন আমার তৈরি কেক খাবে না বলে মাদার বলেছিলেন, *notre bonne mere*, মাঞ্চু রান্নায় ওর মুখ খারাপ হয়েছে? ঐ কথাই উনি বলছিলেন সেদিন, আর তখনকার তাঁর মুখের ভাব আপনার লক্ষ্য করা উচিত ছিল। এঁর এ কাহিনী খুবই অদ্ভুত বটে। শুনা যায় গত বিপ্লবের সময় তিনি হেংকাউ ছিলেন। মাঞ্চুদের অবাধ ধ্বংস লীলার সময় এই একটুখানি মিঃ ওয়াডিংটনই নাকি ওদের একটা অভিজাত পরিবারের সবারই প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ওরা রাজ পরিবারের আত্মীয়। ঐ পরিবারেরই একটি মেয়ে গভীর প্রেমে পড়ে ওঁর; আর···বাকিটা আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন। তারপর হেংকাউ ছেড়ে আসার সময় মেয়েটিও নাকি পিছু নেয় তাঁর; অগত্যা বাধ্য হয়েই তাঁকেও মেনে নিতে হয়—বেচারা! মিঃ ওয়াডিংটনও খুব ভালোবাসেন মেয়েটিকে। এই মাঞ্চু মেয়েরা কিন্তু সত্যি ভারি ভালো। কিন্তু এসব আমি কী বলছি! হাজারো কাজ পড়ে রয়েছে আমার আর আমি এখানে বসে আছি? আমার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে নাকি! সত্যি আমি ভারি লজ্জিত।

মানসিক বিবর্তনের কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি যেন জাগে কিটীর মনে। কর্মব্যস্ততা মনকে নিবিষ্ট রাখে, আর বহু জীবনের দর্শন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভংগির সংগে পরিচয় উদ্বুদ্ধ করে তার কল্পনাকে। ধীরে ধীরে ফিরে আসে যেন তার মনোবল, নিজেকে মনে হয় আরো সুস্থ আরো সবল। এতকাল সে মনে করতো কান্নাই বুঝি তার সম্বল; কিন্তু ইদানিং কেমন যেন অবাক লাগে, নিজেই বুঝতে পারে না কত সহজে ও সামান্য কারণেই সে হাসতে

পারে যখন তখন। এই ভীষণ মহামারির ভেতর দিন কাটানো কেমন সহজ সরল স্বাভাবিক মনে হয় এখন। লোকগুলো মরছে সব তারই আশেপাশে, কই তাদের ভাবনাও তো আর বিচলিত করে না তার মন! ইনফারমারিতে যেতে নিষেধ করেছেন মাদার; আর ঐ রুদ্ধ দুয়ারই তার ঔৎসুক্য জাগিয়েছে বেশি; উঁকি দিতে ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু পারেনি শুধু ধরা পড়বার ভয়ে। না জানি কী শাস্তি দেবেন মাদার এই অপরাধে! বহিষ্কারের কথা কল্পনাও করতে পারে না কিটী। শিশুগুলোর উপর অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে তার। তাকে ছাড়া তো ওরা থাকতে পারবে না; সে চলে গেলে কী যে করবে ওরা ভাবতেও পারে না কিটী।

হঠাৎ একদিন মনে হোল একটা পুরো সপ্তাহই বুঝি সে ভাবেনি চার্লস টাউনসেণ্ডের কথা, স্বপ্নেও দেখেনি তাকে। বুকের পাঁজরার ভেতর হঠাৎ একটা ধাক্কা অনুভব করে কিটী—সত্যিকার মুক্তি সে পেয়েছে এতদিনে! টাউনসেণ্ড আর তার চিন্তা জুড়ে বসবে না। ওকে আর ভালোবাসে না কিটী! ওফ্, কী মধুর শান্তি, মুক্তির কী অপূর্ব অনুভূতি! পশ্চাতে ফিরে স্মৃতির দুয়ারে আঘাত দিতেও কী অদ্ভুত লাগে তার; ভাবতেই পারে না কী অধীর ভাবেই না কামনা করেছিল সে চার্লিকে। একদিন ভাবতো জীবন বুঝি অর্থহীন হয়ে যাবে ওর বিহনে। এরপর বেঁচে থাকা মানে দুঃখকে বরণ করে নেওয়া। এখন সে-কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে। কী অপদার্থ! কী নির্বুদ্ধিতাই না করেছে কিটী নিজেকে নিয়ে! আজকে স্থির মস্তিষ্কে চার্লির কথা চিন্তা করে বিস্ময় লাগছে কিটীর। কী দেখেছিল সে সেদিন ঐ চার্লির ভেতর! তবু রক্ষে সে ইতিহাস জানে না ওয়াডিংটন। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর বিদ্রূপের কশাঘাত হয়তো সইতে পারতো না কিটী। কিন্তু আজ মুক্ত, এতদিনে মুক্তি পেয়েছে সে, সত্যিকার মুক্তি। প্রাণখুলে হাসতে পারছে কিটী।

কিটীর তত্ত্বাবধানে কনভেণ্টের ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে খুবই ; মৃদু হাস্যে সব সহ্য করে সে। এদের খেলাধুলায় বাধা দেয় না কখনো, শুধু চেঁচামেচিতে মাত্রাধিক্য না ঘটে এবং খেলতে গিয়ে কেউ আহত না হয় সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু আজ যেন আনন্দের আতিশয্যে ওদের সংগে খেলায় মত্ত হয়ে গেল কিটী নিজেও। ছোট ছোট মেয়েগুলো তাকেও টেনে নিলো খেলার সাথী করে। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দে ছুটোছুটি লাফালাফি আর গগনভেদী কর্কশ চিৎকারে মুখর করে তুললো।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে মাদার সুপিরিয়র। দুস্তর লজ্জায় কিটী ছিনিয়ে নিয়ে এলো নিজেকে ওদের হাত থেকে।

—এই করেই বুঝি তুমি এদের সামলাও ? জিজ্ঞাসা করেন মাদার তাঁর স্বভাব কোমল মৃদু হাসি নিয়ে।

—সবাই মিলে খেলছিলুম। ওরাও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আমারই দোষ মাদার, আমিই বাড়িয়ে দিয়েছিলুম ওদের।

এগিয়ে এলেন মাদার আরো কাছে, শিশুরাও ছুটে এসে ঘিরে নিলো তাঁকে ; ওদের শীর্ণ ঘাড়ের ওপর হাত রেখে খেলাচ্ছলে ছোট ছোট পীতাভ কানগুলো মলে দিলেন একটু। কোমল দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি কিটীর দিকে। আরক্ত হয়ে উঠলো কিটী, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার। তরল চোখ দুটো উজ্জ্বল, অবিন্যস্ত সুন্দর এলোমেলো চুল আর হাসি সব মিশে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

Que vous etes belle, ma chere enfant, সত্যি, মন খুশি হয়ে ওঠে তোমার দিকে তাকালেই। তাই তো মেয়েগুলো তোমায় দেখে এত মুগ্ধ হয়েছে ! বললেন মাদার।

আরো রক্তিম হয়ে ওঠে কিটী। কী জানি চোখ দুটোও কেমন সজল হয়ে ওঠে তার। মুখ ঢেকে ফেলে কিটী দুই হাতে।

—মাদার, সত্যি আমি খুবই লজ্জিত!

—এই দেখো, ছিঃ পাগলামি করো না। রূপ ভগবানের দান, দুর্লভ ও অমূল্য সম্পদ! এ সম্পদের অধিকারী সত্যি ভাগ্যবান। দাতার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর যিনি সে সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত তাঁরও ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা অপরের ভেতর সে-সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখবার সুযোগ তাঁকেও তো তিনি দিয়েছেন।

আবার মৃদু হাসলেন মাদার। কিটীর নরম গালে মৃদু চাপড় দিলেন একটু—বুঝি ছোট্ট শিশু সে।

কনভেণ্টে কাজ নেওয়ার পর ওয়াডিংটনের সংগে খুব কমই দেখা হয়েছে কিটীর। দু-একবার নদীর ধারে এসে কিটীর অপেক্ষায় রয়েছে সে, পরে পাহাড়ের পথে হেঁটে গিয়েছে দুজন। কখনো বা সে কিটীদের বাংলোয় এসেছে একটু হুইস্কির লোভে। কিন্তু কদাচিত ডিনার পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ওয়াডিংটন। এক রবিবারে স্থির করলো লাঞ্চ সংগে নিয়ে চেয়ারে তারা একটা বৌদ্ধ মন্দির দেখতে যাবে। সহর থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে, তীর্থস্থান বলে খ্যাতি আছে সে জায়গাটার। একদিন অন্তত বিশ্রামের দরকার মনে করে মাদার রবিবার দিন কোন কাজ করতে দেন না কিটীকে, ওয়ালটার অবশ্য তেমনি যথারীতি অতি মাত্রায় কর্মব্যস্ত।

খুব ভোরেই রওনা হোল তারা, রোদ বাড়বার আগেই পৌঁছুতে হবে। ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু আলি-পথে বয়ে নিয়ে চললো তাদের চেয়ারে। কখনো পেরিয়ে গেল বাঁশ ঝোপের আড়ালে ছোট ছোট নিভৃত খামার বাড়ি। ঘিঞ্জি সহরের কোলাহলের বাইরে এই

বিস্তৃত পরিবেশে অলস মনের কল্পনা বড়ো মধুর লাগলো কিটীর। বৌদ্ধ বিহারে এসে পৌঁছয় তারা। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট ছোট জরাজীর্ণ দেউলের সমষ্টি। হাসি মুখে ভিক্ষুরা উঠোনের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল তাদের, কেমন নিস্তব্ধ শূন্যতায় ঘেরা চারদিক। এগিয়ে গেল তারা মন্দিরগুলো দেখতে দেখতে। ভেতরে ভ্রূকুটিনেত্র দেব দেবীর মূর্তি। পীঠস্থানে আসীন বুদ্ধমূর্তি, কেমন সুদূর প্রসারি বিমর্ষ দৃষ্টি, ফিকে হাসির রেশ যেন মুখের কোণে। কেমন একটা বিষণ্ণ থমথমে ভাবের পরিব্যাপ্তি চারদিকে ; এর মাহাত্ম্যও বুঝি ধ্বংসোন্মুখ। দেব দেবীর মূর্তিগুলো ধূলায় ধূসর, সংগে সংগে তাদের ওপর যেন বিশ্বাসেও অবক্ষয় ঘটেছে। নিতান্ত অভাব অনটনের ভেতরেই কাটছে ভিক্ষুদের দিনগুলো, ছেড়ে যাবার আদেশের অপেক্ষায়। প্রধান ভিক্ষুর মুখে মিষ্টি হাসির ভেতরও যেন কেমন একটা নিস্পৃহ ভাবের আভাস। শিগগিরই হয়তো একদিন ভিক্ষুরা ছেড়ে যাবে এই মনোরম পরিবেশ, আর অনাদৃত জরাজীর্ণ বাড়িগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে প্রকৃতির অমোঘ নির্মম আঘাতে। ভগ্ন মন্দিরের উপেক্ষিত দেব দেবীর মূর্তিগুলোর গায়ে হয়তো জড়িয়ে উঠবে কত রকমের বন্যলতা, আর উঠোনের ভেতর জন্মাবে কত রকমের আগাছা। সেদিন দেবতারা ছেড়ে যাবে এই আবাস ভূমি, নেমে আসবে আঁধারের প্রেতমূর্তি।

ছোট একটা দালানের সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে কিটী আর ওয়াডিংটন। চারটি উঁচু থামের ওপর বসানো টালির ছাদ, তারই নিচে ঝুলছে ব্রোঞ্জের বিরাট একটা ঘণ্টা। অদূরে ক্ষীণ-স্রোতা নদীটির দিকে তাকিয়ে থাকে তারা। বাঁকের পর বাঁক

ঘুরে মহামারি বিধ্বস্ত সহরের দিকে বয়ে গেছে এই নদী। সহরের খাঁজকাটা প্রাচীরও চোখে পড়ে তাদের। দিনের উত্তাপ যেন ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে ঐ সহরটার ওপর। ধীরে বইলেও নদীর গতিশীলতা জাগিয়ে দেয় সব কিছুর অনিত্যতার এক বিষণ্ণ অনুভূতি। সব কিছুই তো চলে যায়, কিন্তু এই চলার পথের কী চিহ্ন রেখে যায় তারা? কিটীর মনে হোল সমগ্র মনুষ্য জাতিই বুঝি নদীর বুকে এক এক বিন্দু জল, বয়ে চলেছে সবাই অতি কাছে কাছে অথচ পরস্পর বিচ্ছিন্ন; চলেছে নামহীন এক বন্যাস্রোত সুদূরের ঐ মহাসিন্ধুর পথে। সব কিছুই এমনি ক্ষণস্থায়ী এমনি অকিঞ্চিতকর জেনেও মানুষ ঐ সব অতি তুচ্ছ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে অকারণ অশান্তির বন্যা ডেকে আনে নিজেদের ভেতর। ভাবতেও কেমন দুঃখ হয়।

সুন্দর চোখে এক ঝলক হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিটী:

—আপনি হ্যারিংটন গার্ডেনের নাম শুনেছেন মিঃ ওয়াডিংটন?

—না, কেন বলুন তো?

—কিছু না, এমনি। এখান থেকে অনেক দূরে। আমাদের সবাই ওখানে থাকেন।

—আপনি দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন?

—না।

—আমার মনে হয় হয়তো দু-এক মাসের মধ্যেই আপনারা এখান থেকে চলে যেতে পারবেন। এপিডেমিকও কমে আসছে, ঠাণ্ডা পড়ার সংগে সংগে আর আদৌ থাকবে না।

—মনে হয়, চলে যেতে খুবই কষ্ট হবে আমার।

একটু ক্ষণের জন্য নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কিটী। জানে না কী পরিকল্পনা আছে ওয়ালটারের মনে। কিছুই বলেনি তাকে। কেমন নির্বাক, শীতল, নম্র, অবোধ্য ওয়ালটার। ঐ নামহীন স্রোতে তারা দুই ফোঁটা জল, নীরবে বয়ে চলেছে

অজানার পথে ; স্ব স্ব প্রধান, ছোট্ট দুই বিন্দু জল। অথচ বাইরের দর্শকের কাছে স্রোতের অভিন্ন অংশ মাত্র।

—দেখবেন ঐ সন্ন্যাসিনীরা আবার আপনাকে ধর্মান্তরিত করতে সুরু না করে। মৃদু শ্লেষাত্মক হাসি হেসে বলে ওয়াডিংটন।

—অনেক কাজে ব্যস্ত ওঁরা। তাছাড়া কী-ই বা প্রয়োজন তাঁদের? এঁরা কী অপূর্ব অদ্ভুত দয়ালু, অথচ, সত্যি আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না—একটা বিরাট পাঁচিল দণ্ডায়মান আমার আর এঁদের মাঝখানে। সে যে কী বলতে পারবো না আমি। কী এক গোপন রহস্য বুঝি আছে যা এদের জীবনকে ভিন্নমুখী করে রেখেছে; আর সেই গোপন রহস্যের অংশ গ্রহণের যোগ্যতাও নেই আমার। একে ঠিক বিশ্বাস বলবো না—এ যেন আরো কিছু গভীর, আরো অন্তর্মুখী। তাঁরা যেন আমাদের এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও বিচরণ করেন, আর আমরা চিরদিন তাঁদের কাছে অপরিচিত থেকে যাবো। প্রতিদিন আমার পেছনে যখন কনভেণ্টের দরজা বন্ধ হয়ে যায় মনে হয় আমার অস্তিত্বও বুঝি তক্ষুণি লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁদের কাছে।

—আপনার অহমিকা-বোধে এ এক প্রচণ্ড আঘাত। বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর দেয় ওয়াডিংটন।

—আমার অহমিকা!

একটু শ্রাগ করে কিটী। আবার একটু মুচকি হেসে ফিরে তাকায় ওয়াডিংটনের দিকে।

—আচ্ছা, আপনি একজন মাঞ্চু রাজকুমারীকে নিয়ে আছেন—কই বলেননি তো আমায় কোনদিন!

—ঐ সব খুনসুটে মেয়েগুলো বুঝি এ সব বলেছে আপনাকে? আমাব বিশ্বাস একজন কাস্টম-কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সমালোচনা করা সন্ন্যাসিনীদের পাপ।

—আপনি এতটা স্পর্শকাতর কেন বলুন তো?

বাঁকা কটাক্ষে তাকায় ওয়াডিংটন।

—প্রচার করার মতো কী আছে বলুন এতে। আর আমার চাকুরিতে প্রমোশনের জন্য সাহায্য করবে বলেও তো আমি মনে করি না।

—ওকে আপনি খুব ভালোবাসেন, না ?

এইবার মুখ তুলে তাকায় ওয়াডিংটন। তার কুৎসিৎ মুখের ওপর বালসুলভ অপ্রতিভভাব ফুটে ওঠে।

—আমার জন্য সবই ত্যাগ করেছে সে—ঘর পরিবার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আত্মসম্মান, সবই। আজ কত বছর হয়ে গেছে ও সব ছেড়ে চলে এসেছে আমার কাছে। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি দু-তিন বার—কিন্তু ফিরে এসেছে সে প্রতিবারই। নিজে পালিয়ে গিয়েছি তার কাছ থেকে, প্রতিবারই সে পিছু নিয়েছে আমার। তারপর ব্যর্থ বলে ছেড়ে দিয়েছি আমি সে প্রচেষ্টা; জীবনের বাকি কটা দিন ওকে নিয়েই কাটাতে হবে এই আমার বিশ্বাস।

—সত্যি, ও আপনাকে খুব ভালবাসে ?

একটু হকচকিয়ে ওঠে ওয়াডিংটন।

—দেখুন, এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। ওকে যদি ছেড়ে দিই আত্মহত্যা করবে ও নিশ্চিত। আমার প্রতি কোন বিরূপভাব নিয়ে নয়, আত্মহত্যা করবে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই, মনের অতি স্বাভাবিক অবস্থায়; কারণ সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। ভাবতেও বড়ো বিস্ময় লাগে! এর একটা উচিত মূল্য না দিয়ে উপায় কী বলুন!

—কিন্তু বড়ো কথা ভালোবাসায়, প্রতিদানে নয়। কেননা ভালোবাসা পেয়েও অনেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। প্রতিদানে ভালো তো বাসেই না বরং বিরক্ত হয়, এও তো দেখা যায়।

—আর সবার কথা জানিনা, মিসেস ফেন, আমি নিজের কথা বলছি।

—ও সত্যিই রাজকুমারী নাকি ?

—না, ওটা কনভেন্টের ঐ মেয়েদের বাড়িয়ে বলা কথা। একটি বিশিষ্ট মাঞ্চু-পরিবারের মেয়ে। বিপ্লবের সময় এদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে খুব চমৎকার মহিলা, এটা ঠিক।

একটু গর্বের আভাস তার কণ্ঠে। কিটীর ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে হাসির একটু রেখা।

—তাহলে জীবনের বাকিটা কি এখানেই কাটিয়ে যাবেন নাকি ?

—এই চীনে? হ্যাঁ। তাছাড়া ওকে নিয়ে আর কোথায়ই বা যাবো বলুন ? চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে পিকিংএ ছোট্ট একটি বাড়ি নেবো ভাবছি, সেখানেই কাটিয়ে দেবো বাকি দিনগুলো।

—কোন ছেলেপিলে আছে আপনার ?

—না।

কেমন বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইলো কিটী তার দিকে। কী বিচিত্র! ছোট্ট এই বাঁদরমুখো টাক-মাথা মানুষটি ঐ বিদেশী মহিলার বুকে দুর্বার কামনার বহ্নি জ্বালিয়ে তুলেছে কেমন করে ? বলতে পারে না কিটী কেন; কিন্তু এই লোকটির কথার ধরণ থেকে ঐ মহিলার অন্তরের শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছে কিটী। কেমন একটু অসোয়াস্তিবোধ জাগে তার।

—হ্যারিংটন গার্ডেন সত্যি কত দূরে! মৃদু হাসে কিটী।

—ও কথা বার বার বলছেন কেন ?

—কী জানি, কিছু বুঝি না আমি। জীবনটা কী বিচিত্র! ছোট্ট পুকুর দেখে অভ্যস্ত যে, সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়ালে যে ভাব মনে আসে তার আমারও মনে হচ্ছে তেমনি। কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে আমার; অথচ একটা উল্লাসেও যেন ভরে উঠছে মন। আমি, আমি মরতে চাই না, মিঃ ওয়াডিংটন, আমি বাঁচতে চাই—জীবন পূর্ণ করে বাঁচতে। একটা নতুন সাহসের উন্মাদনা যেন অনুভব করছি মন ভরে! অজানা সমুদ্রের পথে পাড়ি

জমানো নাবিকের মতোই যেন অনুভূতি জাগছে আমার, মনে হচ্ছে আমার অন্তর যেন চাইছে অজানাকে জানতে।

চিন্তান্বিত ভাবে তাকিয়ে থাকে ওয়াডিংটন কিটীর মুখের দিকে। কিটীর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে আছে নদীর জলের ওপর। দুই ফোঁটা জল বয়ে চলেছে নীরবে ঐ নদীর বুকে, ঐ অজানা অনন্ত সাগরের পথে।

—মাঞ্চু মহিলার সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন মিঃ ওয়াডিংটন। বলে কিটী মাথাটা তোলে।

—সে তো আমাদের ভাষা বুঝে না, বলতে পারে না।

—আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, খুবই দয়া দেখিয়েছেন আমায়। আমার বিশ্বাস আকার ইংগিতে তার প্রতি আমার বন্ধুত্বের প্রীতি বুঝিয়ে দিতে পারবো আমি।

একটু ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি এলো ওয়াডিংটনের মুখ জুড়ে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিলো সে।

—একদিন এসে নিয়ে যাবো আপনাকে। সে আপনাকে এক কাপ জেসমিন চা খাওয়াবে সেদিন।

কিটী ওয়াডিংটনকে বলেনি প্রথম থেকেই এই বিজাতীয় প্রেম কেমন ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল তার মনে। এই মাঞ্চু রাজকুমারী কে ন এক অস্পষ্ট কিসের একটা প্রতিভূ হিসেবেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তাকে; কোন এক রহস্যঘন আধিভৌতিক ইন্দ্র-পুরীর দিকেই যেন তার এক ইংগিত!

দু-একদিন পরেই অভূতপূর্ব এক আবিষ্কার করে কিটী।

প্রতিদিনকার মতো সেদিনও কনভেণ্টে এসে শিশুদের ধোয়ামোছা আর জামা পরিয়ে দেবার কাজে লেগে গেল কিটী। কনভেণ্টে

এদের সবার বদ্ধমূল ধারণা রাত্রের বাতাস ক্ষতিকর। তাই ডরমিটরির আবহাওয়াটা বন্ধ এবং গুমোট। প্রভাতের খোলা হাওয়া থেকে এসে এই বন্ধ ঘরে প্রবেশ করেই কেমন অসোয়াস্তি বোধ হোত কিটীর ; তাই ঘরে ঢুকে তার প্রথম কাজ ছিল জানলা-গুলো এক এক করে খুলে দেওয়া। কিন্তু হঠাৎ যেন কেমন অসুস্থ বোধ করলো সেদিন। মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে গেল ; একটু সুস্থ বোধ করবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিটী কিছুক্ষণ। এমন অসুস্থ বোধ আর করেনি কোনদিন। ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠলো যেন। বমি করে ফেললো সে। চিৎকার করে উঠলো সংগে সংগে। তার চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল শিশুরাও। বড় মেয়েরাও ছুটে এলো কিটীর কাছে। তাকে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। তারপর চিৎকার করে উঠলো—কলেরা। কেমন বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে গেল কথাটা। একটা মৃত্যুর হিমেল অনুভূতি অচল করে দিলো তার সর্বাংগ। আতংকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো কিটী। তার প্রতি শিরার উপশিরার ভেতর অন্ধকারের বিভীষিকার স্পন্দন অনুভব করলো কিটী। নিথর হয়ে এলো ধীরে ধীরে, তার-পর যেন একটা গাঢ় তমিস্রা নেমে এলো তার সবসত্তাকে ঘিরে।

প্রথম চোখ খুলে বুঝতেই পারে না কিটী সে কোথায়। মেঝেতে শুয়ে আছে মনে হয় যেন ; মাথাটা একটু নাড়িয়ে বুঝতে পারে একটা বালিশ আছে মাথার নিচে। কিছুই মনে করতে পারছে না কিটী। নাকের কাছে স্মেলিং-সল্ট ধরে পাশে বসে আছেন মাদার—সিসটার জোসেফ সামনে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার মনে পড়লো। কলেরা! ভিক্ষুনীদের বিস্ময়-বিমূঢ় মূর্তি তার চোখের সামনে। সিসটার জোসেফকে মনে হোল একটা বিরাট আকৃতির কিছু—ভয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে আবার ধীরে ধীরে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

—মাদার, মাদার! আমি কি মরে যাচ্ছি? না, না, আমি যে মরতে চাই না!

—সে কী, মরবে কেন? বলেন মাদার সুপিরিয়র। খুবই শান্ত তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে যেন কৌতুক।

—কিন্তু, এ যে কলেরা হয়েছে আমার! ওয়ালটার কোথায়? তাকে খবর দিয়েছেন তো? ওঃ, মাদার, মাদার!

কান্নায় ফেটে পড়ে কিটী। হাত বাড়িয়ে দিলেন মাদার। দৃঢ়হস্তে চেপে ধরে কিটী সেই হাত—এ যেন যে জীবন হারাতে যাচ্ছে তারই একমাত্র শেষ অবলম্বন।

—ছিঃ, লক্ষ্মী মেয়ে। পাগলামি করো না। কলেরা বা এমনি কিছুই হয়নি তোমার!

—ওয়ালটার কোথায়?

—তোমার স্বামী এখন কাজে ব্যস্ত। তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। পাঁচ মিনিটের ভেতরই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

কেমন তীক্ষ্ণ এবং বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে তাকায় কিটী। এতটা সহজভাবে নিচ্ছে কেন এরা সবাই? কী নিষ্ঠুর এরা!

—একটা মিনিট একটুখানি স্থির হয়ে থাকো দেখি! ভয়ের কিছু নেই! বললেন মাদার সুপিরিয়র।

বুকের ভেতর কেমন দপ-দপ করে ওঠে কিটীর। কলেরার কথা ভাবতে ভাবতে এমনি সহজ হয়ে গিয়েছিল জিনিসটা যে তারও হতে পারে কখনো এই কথাটাই মনে আসেনি কোন দিন। উঃ কী বোকামিই সে করেছে! বুঝতে পারছে কিটী মরতে যাচ্ছে সে। ভীষণ ভয় পেলো। মেয়েরা একটা ইনভেলিড চেয়ার নিয়ে এলো জানালার ধারে।

—এসো, তোমায় ধরে চেয়ারটায় তুলে দিই। বসলে বেশ আরাম পাবে। একটু উঠে দাঁড়াতে পারবে তো? বললেন মাদার।

সিসটার জোসেফের সাহায্যে মাদার কিটীকে তুলে ধরলেন। ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লো সে চেয়ারটার ভেতর।

—জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া ভালো। সকাল বেলার হাওয়াটা এর পক্ষে ক্ষতিকর। বললেন মাদার।

—না, না, জানলাটা খোলাই থাক। বলে কিটী।

নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে তার। একটু সুস্থ বোধ করে কিটী ধীরে ধীরে। ওঁরা দুজনেই নীরবে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সিসটার জোসেফ কী যেন কানে কানে বলে মাদারকে, শুনতে পায় না কিটী। তার চেয়ারের ধারে বসে হাতটা তুলে নিলেন মাদার।

—শোন, *ma chere enfant* !

দুটো একটা প্রশ্ন করলেন তিনি কিটীকে। কিটী জবাব দেয় না-বুঝে। ঠোঁট কাঁপতে থাকে, কথাগুলোও যেন বলতে পারে না গুছিয়ে।

—কোন সন্দেহই নেই আর। এ ব্যাপারে আমাকে ঠকানো মুসকিল। বলে সিসটার।

একটু হাসে সে। সেই হাসিতে কেমন উত্তেজনা, স্নেহের কোন আভাসই নেই যেন। মাদারও হাসছিলেন মৃদু মৃদু কিটীর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে।

—এ সব ব্যাপারে সিসটার জোসেফের অভিজ্ঞতা একটু বেশি। তাই খুব সহজে ধরতে পেরেছে কী হয়েছে তোমার। সে ঠিকই ধরেছে।

—কী বলছেন আপনি? উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে কিটী।

—ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। কিন্তু এমনি সম্ভাবনার কথা কি তোমার মনে আসেনি একটুও। লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি যে মা হতে যাচ্ছো!

একটা তীব্র চমকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিটীর সর্বাংগ থর-থরিয়ে কেঁপে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সে সংগে সংগেই।

—ও কী! শুয়ে পড়ো। বললেন মাদার।
দুস্তর লজ্জায় রঙিন হয়ে দুই হাতে বুক ঢাকে কিটী।
—এ অসম্ভব! এ কখনো সত্যি নয়!
—*Qu'est-ce qu'elle dit?* প্রশ্ন করে সিসটার। তর্জমা করে বলেন মাদার। সিসটার জোসেফের গাল চিক-চিক করে ওঠে পুলকের আভায়।
—ভুল হতেই পারে না। আমি জোর গলায় বলছি আপনাকে।
—আচ্ছা, ক-বছর বিয়ে হয়েছে তোমার বলোতো? মাদার জিজ্ঞাসা করলেন। কেন, এ সময়ের ভেতর আমার ভ্রাতৃবধূর দু-দুটো সন্তান হয়েছিল যে!
চেয়ারের ভেতর নেতিয়ে পড়ে কিটী। তার বুকের ভেতর যেন মৃত্যুর যন্ত্রণা।
—সত্যি, কী লজ্জার কথা। ফিস ফিস করে বলে ওঠে কিটী।
—কেন, তুমি মা হতে যাচ্ছো বলে? কিন্তু এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী আছে বলোতো?
—*Quelle joie pour le docteur*। বলে সিসটার জোসেফ।
—একবার ভেবে দেখো তো, শুনে তোমার স্বামী কতটুকু খুশি হবেন এতে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন তিনি নিশ্চয়ই। ছোট ছেলেমেয়েদের ভেতর তুমি তাঁকে দেখনি তো কোন দিন; দেখনি তাঁর খুশিতে উপচে-ওঠা মুখের ভাব যখন এদের নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে উঠেন। ভেবে দেখতো, এমনি নিজের একটি পেলে কত মুগ্ধ হবেন তিনি!
নির্বাক হয়ে যায় কিটী ক্ষণিকের জন্য; স্নেহ কোমল দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। মাদার কিটীর একটা হাত তুলে নিয়ে চাপড়াতে থাকেন আস্তে আস্তে।
—আগেই এ অনুমান করা উচিত ছিল আমার। যাক, কলেরা তো

নয়! এই যথেষ্ট। অনেকটা ভালো বোধ করছি এখন। এবার কাজে যেতে পারবো। বলে কিটী।

—না, আজকে আর নয় লক্ষ্মীটি। তুমি একটুখানি শক পেয়েছো। বাড়ি গিয়ে এবার বরং একটু বিশ্রাম নাও।

—না, না। কাজে থাকলেই আমার ভালো লাগবে বেশি।

—আমি বলছি, তুমি বাড়ি যাও। তোমার এমনি খামখেয়ালির কথা শুনে ডাক্তার আমাদের কী বলবেন বলোতো? কালকে বা পরশু যখন হয় এসো, আপত্তি নেই। কিন্তু আজকে তোমাকে বিশ্রাম নিতেই হবে। দাঁড়াও, আমি বেয়ারা ডাকাচ্ছি। মেয়েদের কাউকে তোমার সংগে দেবো?

—না, থাক। আমি একাই যেতে পারবো।

শুয়ে ছিল কিটী। ঘরের জানালার খড়খড়ি নামানো। লাঞ্চের পর, চাকররাও ঘুমিয়েছে। সকাল বেলার সেই আবিষ্কার আতংক-গ্রস্ত করে তুলেছিল কিটীকে। এ যে সত্যি এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই আর। বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে ঐ কথাটাই ভাবছিল শুধু; কিন্তু তার মনের ভেতরটা যেন কেমন ফাঁকা, কিছুতেই চিন্তাসূত্রগুলোকে গুছাতে পারছিল না। হঠাৎ যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো কিটী। পায়ে জুতো, কাজেই বেয়ারাদের কেউ নয়। বুঝলো তার স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। বসবার ঘর থেকে তাকে ডাকছে শুনতে পেলো কিটী। জবাব দিলো না সে। একটুক্ষণ নীরব, তার পরেই দরজায় আঘাত।

—কে?

—ভেতরে আসবো?

বিছানা থেকে উঠে ড্রেসিং গার্উনটা পরে নিলো কিটী।

—এসো।

ভেতরে এলো ওয়ালটার।

—তোমার ঘুম ভেঙে দিইনি বোধ হয়? খুব আস্তে আস্তে দোরে টোকা দিয়েছি।

—আমি ঘুমোই নি।

একটা জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়ি উঠিয়ে দিলো ওয়ালটার। একটু উত্তপ্ত আলো ছড়িয়ে পড়লো ঘরটায়।

—কী ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? প্রশ্ন করে কিটী।

—সিসটারদের কাছে শুনলুম তুমি সুস্থ নও। তাই ভাবলুম, বাড়ি ফিরে কী হয়েছে দেখা দরকার।

কেমন একটা ক্রোধের কম্পন অনুভব করে কিটী তার শিরা-উপশিরায়।

—যদি কলেরাই হোত, কী করতে তুমি?

—তাই যদি হোত, নিশ্চয়ই আর বাড়ি ফিরে আসতে পারতে না।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে চিরুনি দিয়ে এলোমেলো চুলগুলো একটু গুছিয়ে নিলো কিটী। একটু সময় ক্ষেপনই তার উদ্দেশ্য। তারপর বসে একটা সিগারেট ধরালো।

—আজকে সকালে আমার শরীরটা বিশেষ ভালো ছিল না, তাই মাদার বাড়ি ফিরে আসতে বললেন। কিন্তু এখন বেশ ভালোই আছি। কাল থেকে আবার কনভেণ্টে যাবো।

—কী হয়েছিল তোমার?

—ওঁরা কি কিছু বলেন নি?

—না। মাদার বললেন তোমারই নাকি বলা উচিত।

কদাচিত সে যা করে তাই এবার করলো ওয়ালটার; পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সে কিটীর মুখের দিকে। ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়ে ব্যবসাগত মনোবৃত্তিই যেন প্রকট হয়ে উঠলো তার দৃষ্টিতে। একটু

ইতস্তত করে কিটী ; তারপর জোর করেই যেন ওর চোখে চোখে তাকালো সে।

—আমি সন্তান-সম্ভবা। বললো কিটী।

কোন কথার উত্তরে মনের আবেগ প্রকাশ না করে নীরব থাকবার একটা বিচিত্র অভ্যাস ওয়ালটারের, এ স্বভাবের সংগে পরিচয় ছিল কিটীর। কিন্তু আগে কোনদিনই এতটা ভয়ানক মনে হয়নি তার। কথাটা শুনে কিছুই বললো না ওয়ালটার, কোন অভিব্যক্তি নেই মুখের ওপর। কিটীর কথাটা শুনতে পেয়েছে কিনা তারও কোন প্রকাশ নেই তার নিকষ কালো চোখ দুটিতে। হঠাৎ ভয়ানক কান্না পেলো কিটীর। ভালোবাসার এমনি মুহূর্তেই তো একটা উচ্ছল আবেগে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু ওয়ালটারের এমনি নীরবতা অসহ্য মনে হোল কিটীর ; বললো :

—জানি না কেন আগে বুঝতে পারি নি। খুবই আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু......

—কবে থেকে......কনফাইনড হবে কখন? খুব কষ্টেই যেন বেরিয়ে এলো কথাগুলো। কিটী অনুভব করলো ওয়ালটারের গলাও তারই মতো শুকিয়ে গেছে। কী বিশ্রী! কথা বলতে গিয়ে তার ঠোঁট এত কেঁপে উঠেছে! নিতান্ত পাথর না হলে একটুখানি করুণাও আসা উচিত স্বামীর মনে।

—বোধ হয় দু তিন মাস।

—পিতৃত্বের দাবি কি আমারই?

কেমন আঁতকে ওঠে কিটী। স্বামীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে মৃদু কম্পনের আভাস। তার হিমেল আত্মসংযমের ওপর এই আবেগের মৃদু কম্পনটুকু মনে হোলে বড়ো ভীষণ, বড়ো মর্মান্তিক। কী জানি কেন হঠাৎ কিটীর মনে পড়ে গেল—হংকং-এ একটা যন্ত্র দেখেছিল ; সেই যন্ত্রটার ওপর মৃদু আন্দোলিত একটা ছোট্ট কাঁটা হাজার

হাজার মাইল দূরবর্তি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণঘাতী প্রলয়ংকর ভূমিকম্পের সংকেত, এই কথাটাই তাকে বুঝিয়েছিল সে-দিন। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিটী। মড়ার মতো ফ্যাকাশে সেই মুখের রঙ। আগেও দু-একবার এমনি ওয়ালটারের ফ্যাকাশে মূর্তি দেখেছে কিটী। ওয়ালটারের দৃষ্টি অবনত, একটু বাঁকা।

—কই, কিছু বলছো না যে!

হাত মুঠো হয়ে আসে কিটীর। সে তো জানে তার মুখের হাঁ উত্তরের কত মূল্য ওয়ালটারের কাছে। ওয়ালটার বিশ্বাস করবে সে কথা, অবশ্য বিশ্বাস করবে তাকে। কারণ, সে তাই চায়; তারপর ক্ষমা করবে কিটীকে। ওয়ালটারের মনের কোমল বৃত্তির সংগে গভীর পরিচয় আছে কিটীর। স্বভাবলাজুক হলেও তার মনের এই বৃত্তিটুকু প্রকাশ করতে কার্পণ্য করবে না সে এ কথাও জানে কিটী। শত্রুতা করতে জানে না ওয়ালটার। শুধু একটু মনোমতো সুযোগের অপেক্ষা, সে সুযোগ যদি দিতে পারে কিটী সর্বান্তকরণে ক্ষমা করবে ওয়ালটার। অতীতকে টেনে আনবে না, তার ওপর এ বিশ্বাসও আছে কিটীর। কঠোর হতে পারে ওয়াল-টার, মানসিক বিকৃতিও হয়তো আছে তার, কিন্তু নীচ নয়, হীন নয় ওয়ালটার। তাই কিটীর বিশ্বাস, তার মুখের শুধু ঐ একটি কথাই সব কিছু বদলে দেবে এক নিমেষে।

একট সহানুভূতির বড়ো প্রয়োজন কিটীর। মাতৃত্বের এই আশাতীত সম্ভাবনার অনুভূতি তার মনকে আবিষ্ট করে তুলে বিচিত্র আশা আর অজানিত কত কী কামনায়। বড়ো দুর্বল মনে হয় নিজেকে। আত্মীয় পরিজন সবাই থেকে দূরে, একাকী বড়ো ভয় হয় তার। মায়ের প্রতি কোন টান ছিল না কিটীর, তবু যেন সকালবেলা বড়ো একান্ত করে মন চাইছিল তাঁকে কাছে পেতে। একটুখানি সান্ত্বনা, কারও একটু সহায়তা আজ বড়ো প্রয়োজন তার। ওয়ালটারকে

ভালো সে বাসেনি,কোনদিন পারবে না তাও সে জানে। তবু আজ মনের গভীরে একটা আকাংক্ষা জাগে ওরই প্রশস্ত বুকের ওপর একটুখানি আশ্রয় পেতে : ইচ্ছা হয় ওরই বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওর দেহের সংগে নিজেকে লীন করে দিয়ে পুলকের কান্নায় ফেটে পড়তে। কিটীর মন চায় স্বামীর কণ্ঠে নিজের দু বাহু জড়িয়ে অনুভব করে উত্তপ্ত চুম্বনের মধুর স্পর্শ।

কান্না আসে কিটীর। কত মিথ্যাই তো সে বলেছে, কত সহজ হয়ে গিয়েছে মিথ্যা বলা তার কাছে, কিন্তু একটা মিথ্যা কথায় যদি আসে মংগল, কী ক্ষতি মিথ্যা বলতে ? মিথ্যা, মিথ্যা, কিন্তু কী সেই মিথ্যা ? হ্যাঁ বলা কত সহজ ! লক্ষ্য করে কিটী, সজল হয়ে উঠেছে ওয়ালটারের চোখ, তার দু বাহু প্রসারিত হয়ে আসছে কিটীর দিকে। বলতে পারলো না কিটী ; কেন জানে না, শুধু বলতে পারলো না কথাটা। গত কয়েক সপ্তাহের ঐ সব তিক্ত অভিজ্ঞতা, চার্লি আর তার নিষ্ঠুরতা, কলেরা, সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু, ঐ সব ভিক্ষুনী, আরো বিচিত্র ঐ মাতাল ওয়াডিংটন, এরা সব মিলে কেমন যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে তার ভেতর। নিজেই যেন চিনতে পরে না নিজেকে, এত বদলে গিয়েছে সে। এমনি চিত্ত-বিক্ষোভের ভেতরও যেন অনুভব করে তার গভীরতম আত্মায় কোন প্রহরী বুঝি ভীতি আর বিস্ময়ের সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে। বলতে হোল তাকে সত্য কথা। মিথ্যা বলার প্রয়োজনই যেন থাকলো না আর। তার ভাবনাগুলো যেন বিক্ষিপ্তভাবে ছুটতে লাগলো দিকবিদিক। হঠাৎ যেন দেয়ালের নিচে সেই মৃত ভিক্ষুকটার ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। কেন ওর কথা চিন্তা করছে কিটী ! কান্না থেমে গেল। তার বিস্ফারিত চোখ থেকে সহজে অশ্রুধারার ঢল নেমে এলো মুখ বেয়ে। প্রশ্নের জবাব দিলো সে অবশেষে। ওয়ালটার প্রশ্ন করেছে অনাগত শিশুর পিতা সে কিনা।

—জানি না। কিটী বললো।

খিক খিক করে হেসে উঠলো ওয়ালটার। সেই হাসিতে শিউরে উঠলো কিটী।

—একটুখানি অদ্ভুত কিন্তু শুনায় কথাটা, কেমন না?

খুব স্বাভাবিক উত্তর; ঠিক এমনি জবাবই তার কাছ থেকে আশা করতো কিটী; কিন্তু তার মনটা দমে গেল। কিন্তু ওয়ালটার কি অনুভব করতে পেরেছে কী কষ্ট পেয়েছে কিটী এই সত্য কথাটুকু বলতে! এ চিন্তাও আসে কিটীর মনে। পরক্ষণে আবার এও মনে হয় একটুও কষ্ট হয়নি তো তার, এই তো অবশ্যম্ভাবি! একটুখানি ধন্যবাদও কি ওয়ালটার তাকে দেয়নি মনে মনে! তার উত্তর 'জানি না' 'জানি না' বার বার যেন হাতুড়ি পিটতে লাগলো কিটীর মগজে। ফিরিয়ে নেবার কোনও উপায় নেই আর! ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মোছে কিটী। কোন কথাই আর বলে না তারা—উভয়েই নির্বাক নিশ্চল। বিছানার ধারে টেবিলের ওপর একটা কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিলো ওয়ালটার কিটীকে। গ্লাসটা নিয়ে গেল কিটীব কাছে, নিজেই খাইয়ে দিলো কিটীকে। কিটী লক্ষ্য করে কী সরু সরু ওয়ালটারের হাত দুটো। সুন্দর কোমল হাত দুটো, লম্বা লম্বা আঙুল কিছুই নেই আর অবশিষ্ট, শুধু চামড়া আর হাড়কটি; আঙুলগুলো বুঝি কাঁপছিল একটু একটু। মুখের ভাব সংযত রেখেছিল ওয়ালটার, কিন্তু হাত দুটোই বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

—আমার কান্নায় কিছু মনে করোনা। ও কিছু না; মাঝে মাঝে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জল আমি রোধ করতে পারি না। কিটী বললো।

জল খাওয়া হয়ে গেলে গ্লাসটা সরিয়ে নেয় ওয়ালটার। একটা সিগারেট ধরায় চেয়ারে বসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। এমনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে আগেও দু-একবার দেখেছে কিটী!

বার বারই যেন তার অন্তর মোচড় দিয়ে উঠেছে। জানালার বাইরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওয়ালটার ; তার দিকে লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেল কিটী। গত ক-হপ্তায় কী রোগা হয়ে গিয়েছে সে। এর আগে লক্ষ্য করেনি তো কিটী! চামড়ার ভেতর দিয়ে মুখের হাড় বেরিয়ে আছে, খাদে নেমে গিয়েছে কপালের দুই পাশ। গায়ে ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ছে জামা কাপড়, বুঝি আর কারো জামা পরেছে সে। রোদে-পোড়া মুখের ওপর কেমন এক সবুজ আস্তর পড়েছে যেন। দেখে মনে হয় বড়ো ক্লান্ত। কঠোর পরিশ্রম করছিল ওয়ালটার বিনিদ্র নয়নে, অনাহারে! নিজের দুঃখ এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যের ভেতরও কেমন একটু করুণা জাগে কিটীর মনে। কিছুই করতে পারলো না কিটী ওর জন্য।

কপালটা চেপে ধরে ওয়ালটার নিজের হাতে, বুঝি-বা মাথা ধরেছে। কিটীর মনে হোল, হয়তো ওর মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষেও ঐ একটা কথাই হাতুড়ি পিটছে—'জানি না, জানি না'! এই খেয়ালি, শীতল, লাজুক লোকেরও ছোট্ট শিশুর প্রতি এমনি মমতা বোধ, ভাবতেও যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকে। অনেকের তো নিজের শিশুদের জন্যই টান থাকে না। অথচ ঐ চীনা শিশুগুলোর ওপরই যদি তার এত দরদ, নিজের শিশুর জন্য কতই-না গভীর অনুভূতি হবে ওর মনে? মুগ্ধ প্রসন্ন মনে সিসটাররা একাধিকবার এই কথা বলাবলি করেছেন। কান্নার বেগ রোধ করতে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিটী।

ঘড়ি দেখে ওয়ালটার।

—আমাকে এক্ষুণি সহরে ফিরে যেতে হবে। অনেক কিছু করার আছে আজকে······এখন ভালো বোধ করছো তো?

—হ্যাঁ। আমার জন্য ভেবো না।

—সন্ধ্যায় আমার জন্য অপেক্ষা করো না। ফিরতে অনেক দেরি হতে পারে, কর্ণেল ইয়ু-এর ওখানেই দুটো কিছু খেয়ে নেবো।

—বেশ।

উঠে পড়লো ওয়ালটার।

—আমি হলে আজকেই কোন কিছু করতে চেষ্টা করতুম না কিন্তু। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারলেই ভালো হয়। কিছু দরকার আছে তোমার?

—না, অশেষ ধন্যবাদ। আমি বেশ থাকবো।

একটু থমকে দাঁড়ালো ওয়ালটার, বুঝি মনস্থির করতে পারে নি। তারপর হঠাৎ কিটীর দিকে না তাকিয়েই টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কম্পাউণ্ড পেরিয়ে চলে যাচ্ছে শুনতে পেল কিটী। এইবার ভীষণ একা মনে হোল নিজেকে। আত্ম-সংবরণের কোন প্রয়োজনই ছিল না আর, অশ্রুবন্যার আবেগের ভেতর ভাসিয়ে দিলো নিজেকে কিটী।

রাত্রিটা বড়ো গুমোট। জানালার ধারে বসেছিল কিটী। তার দৃষ্টি প্রসারিত চীনা মন্দিরগুলোর ছাদের ওপর। ওয়ালটার বাড়ি এলো সে সময়। কান্নায় চোখ ভারি কিটীর। কিন্তু মন শান্ত। উদ্বেগ ছাপিয়ে কেমন একটা প্রশান্তি যেন নেমে এলো তাকে ঘিরে, হয়তো অবসাদ।

—ভেবেছিলুম তুমি এতক্ষণ শুয়ে পড়েছো। ভেতরে আসতে আসতে বললো ওয়ালটার।

—ঘুম আসছিল না। জানালার ধারে বসে একটু ঠাণ্ডা বোধ করছিলুম। খেয়েছো তো কিছু?

—যতটুকু প্রয়োজন।

ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগলো ওয়ালটার—কিছু যেন বলতে চায় কিটীকে। কেমন একটু অপ্রস্তুত,

চঞ্চল বুঝতে পারে কিটী। ওয়ালটারের মনস্থির করবার অপেক্ষায় নিস্পৃহ ভাবে বসে রইলো কিটী। হঠাৎ বলতে সুরু করলো ওয়ালটার।

—তোমার কথাগুলোই আমি ভাবছিলুম। ভেবে দেখলুম, তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও তাহলেই বোধ হয় ভালো হয়। কর্ণেল ইয়ু-এর সংগে আলাপ করেছি, তোমার সংগে যাবার জন্য লোক দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। আয়াকেও সংগে নিতে পারবে। খুব নিরাপদেই যেতে পারবে।

—আমার যাবার মতো ঠাঁই কোথায় ?

—কেন, তোমার মার কাছে !

—তোমার কি ধারণা আমায় দেখে তিনি খুবই খুশি হবেন ?

ক্ষণিকের বিরতি ; একটু ইতস্তত ভাব, কী যেন চিন্তা করে ওয়ালটার।

—তাহলে হংকং যেতে পারো।

—ওখানে আমি কী করবো ?

—তোমার সেবা শুশ্রুষার প্রয়োজন। মনে হয় এ অবস্থায় তোমাকে এখানে আটকে রাখা মোটেই উচিত হবে না।

দুঃখেও হাসি রোধ করতে পারে না কিটী, একটা তিক্ত এবং কৌতুকের হাসির ঢেউ বয়ে গেল তার সারা মুখের ওপর। ওয়ালটারকে একনজর দেখে নিয়ে প্রায় হেসে ফেললো।

—জানি না আমার শরীরের কথা ভেবে কেন এতটা উতলা হচ্ছো তুমি।

জানালার ধারে এসে বাইরে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো ওয়ালটার। মেঘমুক্ত আকাশে এত নক্ষত্র সমাবেশ সে বুঝি আর দেখেনি কোনদিন।

—এমনি অবস্থায় মেয়েদের থাকবার জায়গা এটা নয়।

ফিরে তাকালো কিটী ওর দিকে। পেছনের অন্ধকার পটভূমিকায়

সাদাপোশাকে ওয়ালটারের নিখুঁত প্রোফাইল মূর্তি কেমন একটা ভীতিবিহ্বলজনক, অথচ আশ্চর্য, ভয় পেলো না কিটী এবার।

—আমাকে নিয়ে আসার জন্য যখন জেদ করেছিলে, হত্যা করাই কি ইচ্ছা ছিল তোমার? হঠাৎ প্রশ্ন করে কিটী।

এ প্রশ্নের উত্তর ওয়ালটার এড়িয়েই গিয়েছে এতকাল। কিটীর মনে হোল ওয়ালটার বুঝি শুনতেই পায়নি তার প্রশ্নটা।

—প্রথমে তাই ছিল।

কেমন কেঁপে ওঠে কিটী।

এই তো প্রথম স্বীকার করেছে ওয়ালটার। এই প্রথম প্রকাশ করেছে তার মনের গোপন কথা। কিন্তু কোন রাগ নেই কিটীর মনে। নিজের মনের এই অনুভূতিকে নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগে কিটীর। কেমন একটা গর্ব মেশানো কৌতুক বোধ হোল তার।

—বড় বেশি বিপদের ঝুঁকি তুমি ঘাড়ে নিয়েছিলে কিন্তু। তোমার ঐ স্পর্শ-কাতর বিবেক নিয়ে তুমি কি সত্যি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতে যদি প্রকৃতই মৃত্যু ঘটতো আমার? প্রশ্ন করে কিটী।

—কিন্তু সত্যিই তো তুমি মরনি; বরং এই বিপদের ভেতরই যে বেশ ভালো কাটিয়েছো তুমি।

—জীবনে এর চেয়ে ভালো আর লাগেনি আমার কখনো।

ওয়ালটারের সমস্ত ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের কাছে পরাভব মেনে নেবার আকুতি জাগে কিটীর। যে বিভীষিকার ভেতর দিন কাটছে তাদের তার ভেতর ঐ সব নগণ্য ব্যভিচারের চিন্তায় গুরুত্ব দেওয়া কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় তার। আনাচে কানাচে যেখানে মৃত্যুর উঁকিঝুঁকি, তারই ভেতর কে তার তুচ্ছ শরীর নিয়ে কতটুকু কী নোংরামি করেছে তারই ভাবনা যে বাতুলতা। যদি কিটী ওয়ালটারকে বুঝাতে পারতো চার্লির কতটুকু মূল্য আর আছে তার কাছে! এমন কি কল্পনায়ও যেন সে আর আনতে পারছে না চার্লির মূর্তি! যদি সে বুঝিয়ে দিতে পারতো চার্লির প্রতি

সব ভালোবাসা কবে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে তার মন থেকে! টাউনসেণ্ডের জন্য তার মনের কোণে এক বিন্দু ঠাঁই নেই বলেই বুঝি তার সংগে যত কিছু করেছে কিটী সব মূল্যহীন হয়ে গেছে আজ। কিটী ফিরে পেয়েছে তার মন, দেহের কতটুকু গিয়েছে কী যায়-আসে আর তাতে! ওয়ালটারকে বলতে ইচ্ছে করে তার, শোন, আমরা অনেকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি না? কী সব ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করছি বলতো? পরস্পরকে চুমু খেয়ে আমরা আবার বন্ধুত্বে ফিরে আসতে পারি না? প্রেমিক না হলেও বন্ধু বলে স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায়?

নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওয়ালটার। ল্যাম্পের আলো তার মুখের নিষ্ক্রিয় অভিব্যক্তিকে কেমন ভীতিজনক করে তুলেছিল। কিটী এখনো তাকে বুঝে উঠতে পারেনি। মিথ্যা কথা বললেও হয়তো তার হিম শীতল কাঠিন্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতো ওয়ালটার। তার অতি স্পর্শকাতরতার পরিচয় পেয়েছে এতদিনে কিটী, আর এও জানে ওর ঐ সব ঝাঁজালো ব্যঙ্গোক্তি আর কিছুই নয়, শুধু আত্ম-রক্ষার একটা ছদ্মবেশ মাত্র। ওয়ালটার তার অনুভূতির দুয়ার সহজে অর্গল বন্ধ করে দিতে পারে এও আর অজানা নেই কিটীর কাছে। ওয়ালটারের ঐ সব মূঢ়ভাবের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। নিজের অহমিকায় আঘাত সইতে পারে না ওয়ালটার,এইটাই বড়ো কথা; আর কিটীরও ধারণা ঐ আঘাতটাই ওয়ালটারের কাছে মর্মান্তিক। স্ত্রীর একনিষ্ঠা আর বিশ্বস্ততার ওপর পুরুষের এমনি একান্ত নির্ভরতা দেখে বড়ো অবাক লাগে কিটীর। চার্লির সংস্পর্শে গিয়ে কিটীর প্রথম মনে হয়েছিল হয়তো অদ্ভুত পরিবর্তন আসবে তার ভেতর; কিন্তু কোনও পরিবর্তনই তো সে অনুভব করেনি—একটু ভালোলাগা আর প্রাণশক্তির উন্মাদনা ছাড়া। তার গর্ভের সন্তান ওয়ালটারের এই কথাটা যদি সে বলতে পারতো ওয়ালটারকে! ঐটুকু মিথ্যায় কোন ক্ষতি হোত

না কিটীর, অথচ এই স্বীকারোক্তি কত শান্তি দিতে পারতো ওয়ালটারকে! কিন্তু আসলে কথাটা মিথ্যা নাও তো হতে পারে! কিন্তু কী অদ্ভুত!

তার মনের ভেতর কী-জানি-কী এইটুকু অনিশ্চয়তার সুযোগ নিতেও বাধা দিলো তাকে! পুরুষগুলো সত্যি কী বোকা! প্রজননে সক্রিয় অংশ কতটুকুই বা তাদের! মেয়েরাই তো দীর্ঘকাল গর্ভে ধারণ করে অসোয়াস্তি আর নিদারুণ কষ্টের ভেতর জন্ম দেয় সন্তানের ; অথচ ক্ষণিকের একটু সম্পর্কের জন্যই কতবড়ো দাবিই না করে পুরুষ। ঐটুকু সম্পর্কের অভাবেই শিশুটির প্রতি তাদের মনোভাব এমনি বদলে যায়! তারপর কিটীর চিন্তাস্রোত ধীরে ধীরে বয়ে গেল তার গর্ভের সন্তানের দিকে—মাতৃত্বের আবেগ নিয়ে নয়, নিছক একটা অলস কৌতূহল বশেই।

—আমি বলছি ব্যাপারটা আরো একটু ভেবে দেখা উচিত তোমার। নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে ওয়ালটার।

—কোন বিষয়?

ফিরে তাকালো ওয়ালটার—যেন অবাক বিস্ময়ে।

—তোমার যাওয়ার বিষয়।

—কিন্তু আমি তো যেতেই চাই না!

—কেন?

—কনভেন্টের কাজ আমার ভালো লাগে। আমার বিশ্বাস আমিও তাদের উপকারে আসছি। এখানে যতদিন তুমি থাকবে ততদিন আমারও থাকবার ইচ্ছা।

—শোন কিটী, তোমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় চারদিককার যে কোন রকম সংক্রমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই কথাটা তোমার জানা দরকার।

—এইটুকু সুবিবেচনার জন্য তোমায় অশেষ ধন্যবাদ, ওয়ালটার। একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলো কিটী।

—কিন্তু আমার জন্য নিশ্চয়ই তুমি থাকছো না ?

একটু ইতস্তত করলো কিটী। ওয়ালটার জানতো না, অপ্রত্যাশিত হলেও তার জন্য শুধু একটু করুণা ছাড়া অন্য কোন ভাবাবেগই ছিল না কিটীর মনে।

—না। তুমি আমায় ভালোবাস না। অনেক সময় মনে হয় তুমি বুঝি বিরক্ত হও আমাকে নিয়ে।

—এইসব কতগুলো নীরস সন্ন্যাসিনী আর চীনা শিশুগুলোকে নিয়ে তুমি এতটা মেতে উঠতে পারো—এ আমি ভাবতে পারি না।

একটু হাসির রেখা এলো কিটীর ঠোঁটের কোণে।

—দেখো,আমার সম্বন্ধে তোমার হিসাবের ভুলটুকুর জন্য আমাকেই তিরস্কার করা তোমার খুবই অন্যায়! তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি দায়ী নই!

—বেশ, একান্তই যদি তুমি থাকতে চাও, থাকো। কোন আপত্তি নেই আমার।

—সত্যি, তোমার উদারতা প্রকাশ করবার সুযোগ দিতে পাচ্ছি না বলে খুবই দুঃখিত, ওয়ালটার। সত্যি বলতে কি তোমার কথাই ঠিক ; শুধু ঐ অনাথ শিশুগুলোর জন্যেই আমি থাকতে চাইছি না। দেখতেই তো পাচ্ছো কী বিশ্রী পরিস্থিতির ভেতর পড়েছি। এই দুনিয়ার কোথাও একটি প্রাণী নেই যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। এমন কেউ-ই নেই কোথাও যে আমায় অবাঞ্ছিত মনে করবে না। বেঁচে আছি কি মরেছি এইটুকু ভাববার মতো কেউ আমার আছে এও জানা নেই আমার।

ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে এলো ওয়ালটারের। কিন্তু এই ভ্রূ-কুঞ্চন ক্রোধে নয়।

—ব্যাপারটা আমরা খুবই ঘোলাটে করে তুলছি, কেমন না? বলে ওয়ালটার।

—এখনো কি আমাকে ডাইভোস করার কথা ভাবছো? অবশ্য এতে আর আমার কিছু যায় আসে না।

—এইটুকু তোমার জানা উচিত কিটী, এখানে নিয়ে আসার পর তোমার সব অপরাধেরই স্খালন হয়ে গিয়েছে।

—আমি জানতুম না। আর এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাও নেই তেমন কিছু। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তাহলে আমরা কী করবো? আবার এক সংগেই থাকবো তো?

—ভবিষ্যতের হাতেই একে ছেড়ে দিতে পারো না, কিটী?

তার কণ্ঠে যেন মৃত্যুর হিম-শীতল অবসাদের কেমন একটা রেশ।

দু-তিন দিন পর। ওয়াডিংটন কনভেন্ট থেকে কিটীকে তার বাড়িতে নিয়ে এলো তার গৃহিণীর সংগে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে। মানসিক অস্থিরতা ভুলবার জন্য এর মধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছিল কিটী। ওয়াডিংটনের বাড়িতে আরো দু-একবার ডিনারেও এসেছে কিটী। চৌকো মতো সাদা রঙের বাড়ি; সারা চীন জুড়ে কাস্টমের কর্মচারীদের জন্য এমনি বাড়ি, একই ধরণের। খাবার ঘর আর বসবার ঘর যথারীতি আসবাবপত্রে সাজানো। বাড়িগুলো দেখতে কতকটা অফিস আর কতকটা হোটেলের মতো, বাসগৃহ বলে মনেই যেন হয় না এগুলোকে। দেখে মনে হয় পর-পর বাসিন্দারা বুঝি এসেছে গেছে ক্ষণস্থায়ী এলোমেলো অতিথির মতো। ওপর তলায় লুকিয়ে আছে রহস্য আর রোমান্স, মনেও হবে না একটু। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা ঘরের দরজা খুললো ওয়াডিংটন। একটা প্রশস্ত ফাঁকা ঘরে প্রবেশ করলো কিটী। ঘরের চুনকাম করা দেয়ালের গায় ঝুলছে বিচিত্র সব পট। একটা চৌকো টেবিলের ধারে কাঠের খোদাই করা আরাম

কেদারায় বসেছিল মাঞ্চু মেয়েটি। কিটী আর ওয়াডিংটন প্রবেশ করবার সংগে সংগেই উঠে দাঁড়ালো সে, কিন্তু এগিয়ে এলো না।

—ঐ সে, বলে ওয়াডিংটন। সংগে সংগে চীনা ভাষাতেও কী যেন বললো ওয়াডিংটন।

করমর্দন করলো কিটী। পাতলা ছিপছিপে গড়ন মেয়েটির। সূচিকাজ করা লম্বা গাউনে কিটীর চেয়েও ঢেঙা মনে হচ্ছিল তাকে। ফিকে সবুজ সিল্কের জ্যাকেট ওর গায়, আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত লম্বা। মাথায় কালো চুলের ওপর মাঞ্চু মেয়েদের মতোই শিরাভরণ। মুখে পাউডার, আর চোখ থেকে মুখ পর্যন্ত সারা গালে রুজ মাখা। ভুরুতে শুধু একটু সরু রেখার ইংগিত আর ঠোঁট ছুটো রক্তিমাভ। ঐ মুখোশের ভেতর দিয়ে ওর কালো বাঁকা বড় বড় চোখ তুটি টলমল করছিল হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের মতো। মানুষের চেয়ে পুতুলের সংগে এর সাদৃশ্য বেশি। চলার গতি অতি ধীর অথচ দৃঢ়। কিটীর মনে হোল একটু লাজুক তবে কৌতূহলী। ওয়াডিংটনের কথার সংগে সংগে কিটীর দিকে তাকিয়ে বারকয়েক মাথা নাড়লো মেয়েটি। কিটী লক্ষ্য করলো হাতছুটো অস্বাভাবিক লম্বা। কোমল মসৃণ। আইভরির মতো সাদা। সুন্দর নখগুলো ছুঁচলো। এমনি সুন্দর ছুটী হাত খুব কম দেখেছে কিটী। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যের পরিচয় উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করে আসছে যেন।

খুব কম কথা বলে মেয়েটি। ওর উঁচু কণ্ঠস্বর আপেল বনে বিহগ কাকলির মতো। বললো, কিটীকে দেখে খুবই খুশি হয়েছে। ওয়াডিংটন তর্জমা করে কিটীকে বুঝিয়ে দিলো। অনেক প্রশ্ন করলো ওয়াডিংটনের মারফত।

চৌকো টেবিলের ধারে সাধারণ চেয়ারে বসলো তারা তিনজন। চায়ের পাত্র নিয়ে এলো একটি ছেলে—ফিকে জেসমিনের গন্ধে ভরপুর। মাঞ্চু মহিলা কিটীর হাতে এগিয়ে দিলো 'থ্রি ক্যাসেল'

সিগারেটের একটা কৌটো। টেবিল আর চেয়ার ছাড়া আর বিশেষ কিছু আসবাব ছিল না ঘরটিতে। একটা চওড়া মাতুরের বিছানা পাতা ঘরের মেঝেতে। সূচিকাজ করা একটা বালিশ আর তুটো চন্দন কাঠের বাক্স।

—আচ্ছা সারাদিন উনি কী করে কাটান? জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—ছবি আঁকে আর কখনো-বা কবিতাও লেখে একটু-আধটু। কিন্তু বেশি সময় শুধু বসেই থাকে একলাটি। আফিমও টানে কখনো, তবে খুব কম এই যা রক্ষে; কারণ ওটার অবাধ ব্যবহার বন্ধ করাই যে আমার কাজ।

—আপনিও খান?

—কদাচিত। আপনাকে সত্যি কথা বলতে কি, হুইস্কিটাই আমার পছন্দ বেশি।

সারা ঘরময় কেমন একটা কটু গন্ধ, খুব অপ্রীতিকর নয়, তবে কেমন একটু অদ্ভুত বিদকুটে।

—ওঁকে বলুন ওঁর সংগে কথা বলতে পাচ্ছি না বলে সত্যি ভারি তুঃখিত। বলার মতো অনেক কথাই আমার ছিল।

কথাগুলো তর্জমা করবার সংগে সংগে চকিত দৃষ্টিতে মাঞ্চু মেয়েটি তাকালো কিটীর দিকে, সেই দৃষ্টিতে হাসির একটু ইংগিত। সুন্দর পোশাকে বড়ো সপ্রতিভ আর শোভন মনে হচ্ছিল ওকে। রঞ্জিত মুখে তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ, প্রশান্ত ও অতলস্পর্শী। ছবির মতোই অবাস্তব, অথচ কমনীয়। মুগ্ধ হতে হোল কিটীকে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যেখানে এসে পড়েছে কিটী, সেই চীন দেশে ঘৃণা বা করুণার দৃষ্টি ছাড়া সে কখনো তাকায়নি কারো দিকে। কিন্তু এখানেই যেন ব্যতিক্রম হোল তার। হঠাৎ যেন সুদূরের কোন এক রহস্যের ইংগিত ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। এই তো আদিম, আঁধারে ঘেরা অবোধ্য প্রাচী; ক্ষণিক দর্শনে এই অদ্ভুত ছোট্ট মানুষটির ভেতর প্রাচ্যের বিশ্বাস এবং আদর্শের

যতটুকু পরিচয় কিটী পেলো তার কাছে প্রতীচ্যের বিশ্বাস এবং আদর্শ যেন নিষ্প্রভ হয়ে এলো। এখানকার জীবন আলাদা, জীবনের মানও ভিন্ন। এই নিথর প্রতিমাটির রঙমাখা মুখ আর বাঁকা চোখের দিকে তাকিয়ে একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগলো কিটীর মনে। মনে হোল তার দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা সবই যেন অলীক অবাস্তব। ঐ রঙমাখা মুখোশের আড়ালেই বুঝি লুকিয়ে আছে প্রাচুর্য আর কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ঐ বিলম্বিত পেলব হাতদুটিতে বুঝি ধরে আছে অবোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠি।

—সারাদিন বসে বসে উনি কী ভাবেন, বলুন তো? আবার জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—কিছু না। হাসে ওয়াডিংটন।

—সত্যি কী চমৎকার ইনি! এঁকে বলুন এঁর হাতের মতো এমনি সুন্দর হাত আমি আর দেখিনি কখনো। আমি ভেবে অবাক হই, কী উনি দেখেছেন আপনার ভেতর!

মুচকি হাসতে হাসতে কথাগুলো তর্জমা করে শোনালো ওয়াডিংটন।

—ও বলছে আমি নাকি ভারি ভালো।

—যেন শুধু গুণের জন্যই নারী ভালোবাসে পুরুষকে! বিদ্রূপ করে কিটী।

একটিবারই হেসেছিল মাঞ্চু। কথাচ্ছলে ওর হাতের জেড-পাথরের ব্রেসলেটটার প্রশংসা করেছিল কিটী। সেটি খুলে সে কিটীর হাতে দিলো; কিটী পরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হাত ছোট হলেও কব্জির কাছে আটকে গেল ব্রেসলেটটা। শিশুসুলভ হাসিতে খিল খিল করে হেসে উঠলো মাঞ্চু। কী যেন বললো ওয়াডিংটনকে, তারপর আয়াকে ডাকলো। কী যেন নির্দেশ দিলো আয়াকে। পরক্ষণেই আয়া ফিরে এলো সুন্দর এক জোড়া মাঞ্চু-জুতো নিয়ে।

—আপনি যদি পরেন তাহলে এই জুতো জোড়াটা ও আপনাকে

উপহার দিতে চাইছে। দেখবেন, বেশ চমৎকার বেড-রুম স্লিপারের কাজ করবে। বলে ওয়াডিংটন।

—ঠিক হয়েছে কিন্তু, আমার পায়ে। পরতে পরতে বলে কিটী।

ওয়াডিংটনের চোখে মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি লক্ষ্য করলো কিটী।

—ওঁর পায়ে বড় হয় নাকি? জিজ্ঞাসা করে কিটী।

—বড় মানে!

হেসে ফেললো কিটী। তর্জমা করার সংগে সংগে হেসে উঠলো মাঞ্চু আর তার আয়া।

এর কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের পথে পাশাপাশি চলতে চলতে হাসি-মুখে ফিরে তাকালো কিটী ওয়াডিংটনের দিকে।

—ওর প্রতি আপনার এতটা ভালোবাসা, কই বলেননি তো আমায়?

—আপনি কী করে বুঝলেন?

—আপনার চোখেই সে পরিচয় পেয়েছি আমি। বড়ো অদ্ভুত, এ ভালোবাসা যেন কেমন এক স্বপ্নময় ঐন্দ্রজালিক। পুরুষকে বুঝা কঠিন, হিসাব করা যায় না তাদের। সবারই মতো আপনাকেও ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন আমি স্বীকার করছি আপনার গোড়ার কথাই বুঝতে পারিনি।

বাংলোর কাছাকাছি এসে সহসা প্রশ্ন করলো ওয়াডিংটন:

—আচ্ছা, আপনি ওকে দেখতে চেয়েছিলেন কেন বলুন তো!

উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করে কিটী।

—কিসের একটা সন্ধানে ফিরছি আমি, জানি না কী সেটা! কিন্তু এইটুকু জানি তার সন্ধান পাওয়া আমার একান্ত দরকার। সেই অজানা যদি ধরা দেয় আমার কাছে সব কিছু বদলে যাবে তখন। হয়তো-বা ভিক্ষুনীরা জানেন। ওদের কাছে যখনই থাকি মনে হয় যেন কী একটা গুপ্ত রহস্য আমার কাছে গোপন করছেন ওঁরা।

জানি না কেন আমার মনে এলো, আমি ভাবলুম যদি এই মাঞ্চু মহিলাকে দেখতে পাই তবেই বুঝি সন্ধান মিলবে আমার ঐ অজানা রহস্যের—হয়তো ওই বলে দেবে কী আমি চাইছি।

—কিসে বুঝলেন ওর কাছেই সন্ধান পাবেন?

একটু বক্রদৃষ্টিতে তাকালো কিটী ওর দিকে; কিন্তু জবাব দিলো না প্রশ্নের। বরঞ্চ আর একটা প্রশ্ন করলো সে।

—আচ্ছা, আপনি জানেন?

একটু মুচকি হেসে শুধু শ্রাগ করলো ওয়াডিংটন।

—'তা-ও'। এর সন্ধান কেউ করে আফিম-এ, কেউ-বা ঈশ্বরে, কেউ-বা খোঁজে হুইস্কির ভেতর, আবার কেউ-বা চায় ভালো-বাসায়। সবাই একই পথের পথিক, কিন্তু মেলে অশ্বডিম্ব।

আবার মেতে ওঠে কিটী তার দৈনন্দিন কাজে। ভোরের দিকে শরীর সুস্থ বোধ না করলেও মনোবলের প্রাচুর্য কাবু হতে দেয় না তাকে। কনভেণ্টের সবার কৌতূহলে কেমন বিস্ময় লাগে তার। সিসটারদের ভেতর যারা এতদিন দেখা হলে শুধু সুপ্রভাত জানিয়েছে, তারা এখন বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলেই ঘরে এসে তার খোঁজ নিয়েছে। গল্প গুজবে তাঁর সংগে শিশুসুলভ চঞ্চলতায় মেতে উঠেছে। সিসটার সন্ত জোসেফ একই কথা কতবার বলে তার বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে। অনেক দিন থেকেই নাকি কথাটা তার মনে হচ্ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, সন্দেহ করছিল মনে মনে।

তারপর তার ভ্রাতৃবধূর গর্ভধারণ সম্বন্ধে যে সব ভয়াবহ বিবরণ দিলো, কিটী বলেই সেগুলো হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সিসটার জোসেফ তার বাস্তব জীবনের সংগে (তার বাবার ফার্ম-হাউস ঘিরে

একটি ছোট্ট নদী ; তার তীরে সারি সারি মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত পপলার বীথি) ধর্মজীবন কী করে গড়ে উঠেছে তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিলো।

একদিন 'এনানসিয়েশনের' গল্প বলে সিসটার জোসেফ জানালো অবিশ্বাসীরা এর মূল্য কখনো বুঝবে না।

—সত্যি বলবো কি, পবিত্র গ্রন্থের এ-কটি ছত্র পড়ে কোনদিনই কান্না রোধ করতে পারিনি আমি। কেন জানি না, কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আসে আমার ভেতর।

তারপর কিটীর অবোধ্য ফরাসীতে বলে যায় :

তারপর নেমে আসে দেবদূত তাঁর কাছে এবং বলে, শোনো ওগো মহিমময়ী, স্বয়ং প্রভুর আবির্ভাব তোমার ভেতর। নারীকুলে বড়ো ভাগ্যবতী তুমি।

লতাকুঞ্জে শ্বেতশুভ্র ফুলের ওপর প্রবহমান মৃদু বাতাসের মতোই সারা কনভেন্টময় বয়ে গেল জন্ম রহস্যের একটা কোমল স্পন্দন। কিটীর সন্তান-সম্ভাবনার কথাটাই যেন উত্তেজনায় কেমন একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুললো এই সব ঊষর মেয়েগুলোর ভেতর। কখনো-বা ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে কিটী তাদের, আবার কখনো-বা মুগ্ধ হয় সবাই। কিটীর শারীরিক পরিবর্তনের কথাটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধিতেই মেনে নেয় তারা ; সবাই তো গ্রাম্য জেলে বা কৃষকের মেয়ে! কিন্তু তাদের শিশুসুলভ কোমল মনে কেমন একটা বিস্ময়ের বিহ্বলতা। কিটীর অন্তঃসত্ত্বার কথা ভেবে তারা বিচলিত হলেও আনন্দে উল্লসিত। সিসটার জোসেফ বলে তার জন্য তারা সবাই প্রার্থনা করছে। সিসটার সন্ত মার্থা আফসোস করে —কিটী কেন ক্যাথলিক হোল না! কিন্তু মাদার তাকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলেন তাতে কী হয়েছে! প্রোটেস্টান হলেও ভালো মা হওয়া যায়—আমরা সে ব্যবস্থাই করবো।

কিটীর মন স্পর্শ করে এরা সবাই। আশ্চর্য হয়ে যায় কিটী, এমনি

মিতাচারী সংযমনিষ্ঠ যে মাদার তিনিও যেন কেমন একটু স্নেহশীল হয়ে উঠেছেন কিটীর ওপর। প্রকাশ না পেলেও কিটীর প্রতি তাঁর দয়া সব সময়ই ছিল, কিন্তু এখন যেন তাঁর ব্যবহারে কোমল মাতৃ-সুলভ অভিব্যক্তি। তাঁর কণ্ঠে মৃদু মধুর নূতন সুরের রেশ, দৃষ্টিতে অদ্ভুত অন্তরস্পর্শী বাৎসল্যরস; যেন সে শিশুটি, তাঁর অন্তর যেন ঢেউয়ে দোদুল্যমান শান্তধূসর মহাসমুদ্র; গাম্ভীর্যের মহিমায় বিস্ময়-বিহ্বল, হঠাৎ একফালি সূর্যরশ্মিতে সচকিত ও উল্লসিত। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে এসে তিনি কিটীর পাশে বসেন।

—তুমি শ্রান্ত না হয়ে পড়ো সেদিকে আমার নজর রাখা দরকার, *mon enfont*। নিজেকেই যেন প্রবোধ দিয়ে বলছেন—নইলে ডাঃ ফেন কিছুতেই ক্ষমা করবেন না আমাকে। সত্যি কী অদ্ভুত ওই ইংরেজদের আত্মসংযম! ওদিকে আনন্দে ওর অন্তর ভরপুর, অথচ যখনই বললো কেউ একথা কেমন পাণ্ডুর হয়ে গেল তাঁর মুখের চেহারা। সত্যি ভারি অদ্ভুত!

কিটীর একটা হাত তুলে নিয়ে সস্নেহে চাপড়াতে লাগলেন তিনি।

—ডাঃ ফেন বলছিলেন তুমি এখান থেকে চলে যাও এই তাঁর ইচ্ছা; কিন্তু তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যেতে রাজি নও। সত্যি মা, এ তোমার অশেষ দয়া! আমি স্বীকার করছি আজকে, তোমার কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি আমরা। খুবই কৃতজ্ঞ আমরা; কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ওঁকে ছেড়ে যেতে চাও না। সত্যিই তো, তোমার আসল জায়গা ওঁরই পাশে, আর ওঁরও প্রয়োজন তোমাকে। জানিনা এই অদ্ভুত মানুষটিকে না পেলে কী করে চলতো আমাদের।

—খুবই খুশি হলুম শুনে, ও কিছুটাও অন্তত আপনাদের জন্যে করতে পেরেছে! বলে কিটী।

—শোনো লক্ষ্মীটি, ওঁকে তুমি অন্তর দিয়ে ভালোবেসো! উনি সত্যিই একজন মহাপুরুষ।

মুচকি হাসলো কিটী; কিন্তু বুকের ভেতর নিরুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস। এখন শুধু একটা কাজ করতে পারে সে ওয়ালটারের জন্য, কিন্তু কী করে করবে তাতো জানে না। কিটীর মন বলছে ওয়ালটারের কাছে ক্ষমা চাইতে, নিজের জন্য নয়, ওয়ালটারের জন্যই। কিটী অনুভব করে এতেই শুধু সান্ত্বনা পাবে ওয়ালটার, মনে তার আসবে শান্তি। কিন্তু তার কাছে ক্ষমা চাওয়া যে বৃথা; তার মনে একটু যদি সন্দেহ জাগে এ চাওয়া কিটীর নিজের জন্য নয়, এ চাওয়া তারই মংগলাকাংক্ষায়, তখনই তার কঠিন অহমিকা বোধ প্রত্যাখ্যান করবে। (কিন্তু আশ্চর্য এই অহমিকা বোধ আর বিরক্তি আনে না কিটীর মনে, ওটাই যেন এখন স্বাভাবিক মনে হয়। দুঃখবোধটা যেন আরো গভীর হয় কিটীর)। শুধু একটা আকস্মিকতাই বুঝি দিতে পারে সে সুযোগ। কিটী বুঝতে পারে শুধু একটা আবেগের বন্যাই মুক্তি দিতে পারে ওয়ালটারের মনের ভেতর বাসা-বাঁধা ঘৃণার ঐ পুঞ্জীভূত দুঃস্বপ্নকে। কিন্তু তার নিজের দুর্বুদ্ধিতার জন্যই সবেগে প্রতিরোধ করবে এও জানে কিটী।

ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের ভেতর পৃথিবীতে যেখানে দুঃখের এত ছড়াছড়ি, তার মাঝেও মানুষের এই যে অকারণ আত্মনিগ্রহ, সত্যি কী মর্মান্তিক!

যদিও মাদার সুপিরিয়রের সংগে কিটীর আলাপ তিন চারবারের বেশি নয়, তাও হয়তো দু-এক সময় মিনিট দশেকের জন্য, তবুও সে পরিচয় গভীর রেখাপাত করেছে কিটীর মনে। তাঁর চরিত্রের প্রসার যেন একটা দেশেরই মতো, প্রথম পরিচয়েই যাকে মনে হয় বিরাট অথচ আতিথ্য-বিমুখ; কিন্তু ধীরে ধীরে সেখানে

ফুটে ওঠে বিশাল পর্বতের পরিবেশ, বৃক্ষলতায় ভরা সমুজ্জ্বল ছোট ছোট গ্রামগুলো; আর তারই ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কল-কল নাদিনী নদী। এই সব মনোরম দৃশ্য বিস্ময় জাগায় আর বিশ্বাসই আনে শুধু মনে; কিন্তু তবুও যেন একে খুবই আপন বলে মনে হয় না। মাদারের সংগে ঘনিষ্ঠতা অসম্ভব। কনভেন্টের আর সবার, এমন কি কৌতুকপ্রিয় প্রগলভা সিসটার জোসেফের ভেতরও কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তিই অনুভব করছে কিটী,—বিশেষ করে এঁরই বেলায় যেন এই অভিব্যক্তিই একটা দুরতিক্রম্য বাধা। একটা বিচিত্র রোমাঞ্চে মন শিরশিরিয়ে ওঠে। ভাবতে বিস্ময় লাগে সবারই মতো সবারই সংগে একই স্তরে পার্থিব দুনিয়ায় বিচরণ করছেন তিনিও। কিটীকে তিনি বললেন একদিন :

—ধর্মে অনুরাগী যে, যীশুর প্রার্থনাই তার যথেষ্ট নয়। নিজের জীবন দিয়ে গড়ে তুলতে হবে তাকে একটা মূর্তিমান প্রার্থনা।

যদিও তাঁর কথাবার্তায় ধর্মপ্রসংগ জড়িত থাকতো কিটী লক্ষ্য করেছে, তবু অবিশ্বাসীর মনে প্রভাব বিস্তারের কোন প্রচেষ্টাই ছিল না তাঁর। কিন্তু এইটাই বড়ো আশ্চর্য লাগে কিটীর যে, তাঁর গভীর বদান্যতাবোধ সত্ত্বেও কিটীর ক্ষমাহীন অজ্ঞানতার প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি।

সেদিন বিকেলে তাঁরা দুজন বসেছিলেন। দিনগুলো ছোট হয়ে এসেছে, সন্ধ্যার স্তিমিত আলো প্রীতিকর ও কেমন বিষাদঘন হয়ে উঠেছে। মাদারকে মনে হচ্ছিল বড়োই ক্লান্ত। তাঁর সেই গম্ভীর মুখখানি কেমন ফ্যাকাশে সাদা; সুন্দর কালো চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ। ক্লান্তিতে কেমন একটা অপূর্ব আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ।

—জানো, আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। কেমন একটা স্বপ্নের ঘোর থেকে যেন জেগে ওঠে বললেন তিনি।

—এই দিনেই আমি দীক্ষা নেবার সিদ্ধান্ত করেছিলুম। দুটি

বছর চিন্তা করেও কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলুম না, অন্তরের অনুপ্রেরণার প্রতিক্ষায় ছিলুম। ভয় ছিল আবার যদি পার্থিব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ফিরে যেতে হয়! কিন্তু সেই সকালে প্রার্থনার সময়ে স্থির করলুম সেদিনই আমার সিদ্ধান্তের কথা মাকে জানাবো। তারপর পবিত্র কম্যুনিয়নের সময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানালুম মনের শান্তি ভিক্ষা করে। মনে হোল জবাব পেলুম—শান্তির আকাংক্ষা ত্যাগ করলেই মনে শান্তি আসবে।

অতীতেই যেন বিলীন হয়ে গেলেন মাদার।

—সেই দিনই আমাদের এক বন্ধু, মাদাম-দ্য-ভির্নো, আত্মীয় পরিজন কাউকে না বলেই বেরিয়ে গেলেন আত্মসন্ধানে। তিনি জানতেন সবাই এর বিরোধী; তিনি বিধবা, মনে করলেন নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করবার অধিকার আছে তাঁর। আমারই এক তুতো-বোন গিয়েছিলেন ওঁকে বিদায় দিতে, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারলেন না। খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মাকে তখনো বলিনি মনের কথা; তাঁকে কী করে বলবো কল্পনা করতেও কেমন যেন ভয় হোল আমার। তবু প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কৃতনিশ্চিত রইলুম। এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম বোনটিকে। মা তখন তাঁর নিজের কাজে ব্যস্ত, শুনছিলেন সবই। মনে মনে স্থির করলুম যদি বলতেই হয় আর একটা মিনিটও নষ্ট করলে চলবে না আমার।

—সত্যি কী আশ্চর্য, স্পষ্ট মনে ভাসছে আজকে সেদিনকার সেই চিত্রটি। আমরা সবাই বসেছিলুম টেবিলের চারধারে, লাল কাপড়ে ঢাকা গোল টেবিলটি, সবুজ সেড দেওয়া একটা আলো টেবিলের ওপর। আমার দুজন তুতো-বোনই তখন আমাদের বাড়িতে। ড্রয়িংরুমের চেয়ারগুলোর ঢাকনা সেলাই করছিলুম সবাই মিলে। কতদিন ও-গুলোর ঢাকনা পাল্টানো হয়নি; সেই চতুর্দশ লুইয়ের

আমল থেকে, যখন এ-গুলো প্রথম কেনা হয়। এত বিবর্ণ ও নোংরা হয়ে গিয়েছিল বলবার নয়। মা এজন্য প্রায়ই বকাবকি করতেন।

—কী করে কথাটা সুরু করবো, ঠোঁট যেন নড়তে চাইছিল না কিছুতেই। মিনিট কয়েক চুপচাপ কেটে গেল, হঠাৎ মা-ই আমাকে বলে উঠলেন—আমি কিন্তু তোমার বন্ধুর ব্যবহার ঠিক বুঝতে পারলুম না। প্রিয়জনদের কাউকে কিছু না জানিয়ে এমনি চলে যাওয়া মোটেই আমি পছন্দ করি না। ব্যাপারটা শুধু নাটুকেপনা নয়, রুচি বিগর্হিত। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষে এমন কিছু করা উচিত নয় যা নিয়ে কানা-ঘুসোর সুযোগ হবে। তাই এমনি ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ যদি তুমিও দাও কোনদিন, আশা করি এমন করে লুকিয়ে যাবে না যাতে লোকে মনে করবে তুমি কোন অন্যায় করছো।

—এই তো সুযোগ, কিন্তু এমনি দুর্বলতা পেয়ে বসলো আমায় যে আমি শুধু বললুম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, আমার অত সাহসই হবে না।

—কোন জবাব দেননি মা। নিজের মনের কথা খুলে বলবার সাহস পেলুম না বলে বড়ো অনুতপ্ত হয়েছিলুম। কিন্তু তখনই মনে হোল যেন শুনতে পেলুম সন্ত পিটারকে বলা প্রভু যীশুর সেই বাণী—**পিটার, সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাস ?** উঃ আমার কী দুর্বলতা, কী অকৃতজ্ঞ আমি! আমি চেয়েছি নিজের আরাম, ভালোবেসেছি নিজের জীবন যাত্রা, নিজের পরিবার আর নিজের আমোদ প্রমোদ। এমনি চিন্তায় তখন আমি জর্জরিত; একটু পরেই আলোচনার খেই ধরে মা বলে উঠলেন—তবু আমার বিশ্বাস, ওদেত, মৃত্যুর পূর্বে তুমিও চিরস্থায়ী একটা-না-একটা কিছু রেখে যাবেই।

—তখনো উৎকণ্ঠা এবং চিন্তায়ই ডুবেছিলুম আমি; আমার

বোনেরা আমার মানসিক চাঞ্চল্যের কিছুই জানতো না, আপন আপন কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ হাতের সেলাই রেখে অভিনিবেশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন—আমি জানি মা, তুইও যাবি ঐ পথেই!

—মা, সত্যি-সত্যি বলছো তুমি? এই যে আমার অন্তরতম আকাংক্ষা, একান্ত কামনা!

কথা শেষ করবার আগেই বোনরা চিৎকার করে উঠেছিল—*Mais oui!* গত দুটো বছর ওদেতের এই তো একমাত্র চিন্তা। আপনি ওকে অনুমতি দেবেন না কিন্তু, কখখনো না।

—কিন্তু কোন অধিকারে বাধা দেবো বলো? এই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়? মা বললেন।

—তক্ষুনি বোনেরা ব্যাপারটা হালকা করার জন্য এ-ও-তা নিজেদের কথা জিজ্ঞাসা করছিল আমায়। আমার জিনিসপত্রগুলোর কে কোনটা নেবে এ নিয়ে ঝগড়া সুরু করে দিলো। কিন্তু এই হালকা ভাবেরও মেয়াদ ছিল কয়েকটি মিনিট মাত্র। পরক্ষণেই কেঁদে ফেলেছিলুম আমরা সবাই। তখনই শুনতে পেলুম বাবাও ওপরে আসছেন।

একটু চুপ করলেন মাদার সুপিরিয়র। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁব বুক চিড়ে।

—কষ্ট হয়েছিল বাবারই বেশি। আমিই তাঁর একমাত্র মেয়ে। আর জানোতো, পুরুষদের সাধারণত কন্যা সন্তানের ওপরই টান থাকে একটু বেশি, পুত্র সন্তানের চেয়েও।

—সত্যি, হৃদয় বলে একটা পদার্থ থাকাটাই একটা বড়ো দুর্ভাগ্য। একটু হেসে বলে কিটী।

—আর এই হৃদয়ই যীশুকে যে সমর্পণ করতে পারে সে মহা ভাগ্যবান।

সেই সময় একটি ছোট্ট মেয়ে হাতে একটা অদ্ভুত পুতুল নিয়ে

মাদারকে দেখাতে এলো। তাঁর সুন্দর কোমল হাতটি রাখলেন মাদার শিশুটির কাঁধের ওপর। শিশুটিও তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তাঁর হাসিতে মুগ্ধ হয়ে গেল কিটী—কী মিষ্টি সেই হাসি, অথচ কেমন আসক্তিহীন।

—আপনার প্রতি শিশুদের এই শ্রদ্ধা দেখে অবাক হয়ে যাই মাদার। এর এক কণাও যদি পেতুম, ধন্য মনে করতুম নিজেকে। বলে কিটী।

আবার একটু হাসলেন মাদার, সেই নিস্পৃহ মিষ্টি হাসি।

—অপরের হৃদয় জয় করবার একমাত্র উপায়, যার ভালোবাসা চাইবে তার অন্তরের সংগে নিজেকে বিলিয়ে দেবে।

সেদিন ডিনারের সময়ও ফেরেনি ওয়ালটার! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কিটী। সহরে আটকা পড়লে কিটীকে খবর পাঠায় ওয়ালটার। অবশেষে একলাই খেতে বসলো কিটী। খাবার ভাণই করলো সে শুধু। টেবিলে সাজানো অনেক কিছু খাবারের আয়োজন। তাদের চীনা বাবুর্চি এই মহামারি ও নানা অসুবিধার ভেতরও সব কিছু জোগাড় রাখছে প্রতিদিন। ডিনারের পর জানালার ধারে চেয়ারে গা এলিয়ে নক্ষত্র-খচিত আকাশের সৌন্দর্যে সঁপে দিলো নিজেকে। চারদিকে স্তব্ধতা নেমে এলো। বই নিয়ে বসতেও ইচ্ছা হোল না কিটীর। লেকের নিথর জলের ওপর প্রতিবিম্বিত টুকরো টুকরো সাদা মেঘেরই মতো বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোও ভেসে বেড়াতে লাগলো তার মনের ওপর। এমনই ক্লান্ত যে, একটা সূত্র ধরে কোথাও মনকে নিবিষ্ট করতেও যেন ইচ্ছা করছিল না তার। আবছা ভাসছিল শুধু ভিক্ষুনীদের কথাগুলো মনের ফাঁকে ফাঁকে। এইটাই বিচিত্র, যদিও ওঁদের

জীবনযাত্রা কিটীকে মুগ্ধ করেছিল, তবু যে প্রেরণায় তাঁরা এ পথে নেমেছেন তার কোন স্পন্দনই উপলব্ধি করতে পারলো না সে। এই প্রেরণার অনুভূতি একদিন তার মনেও জাগতে পারে, এইটুকু সম্ভাবনার কথাও ভাবতে পারলো না। একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। সেই শ্বেত-জ্যোতির স্পর্শে তার অন্তরও যদি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতো তবেই হয়তো সহজ সরল হয়ে যেতো সব কিছু। কখনো কখনো মনে হয়েছে মাদারকে তার অন্তরের বেদনার কথা বলে, কিন্তু সাহস হয়নি। এই নিষ্ঠাবান মহিলার কাছে এতটুকুও ছোট হবার কল্পনা সহ্য করতে পারে না। এঁদের বিচারে সে তো মহাপাপী। কিন্তু সে নিজে একে নির্বুদ্ধিতা বা কদর্য কাজ ছাড়া আর কিছুই তো মনে করতে পারে না।

হয়তো মনের স্থূল ধারণা বশেই টাউনসেণ্ডের সংগে সম্পর্কটাকে শুধু জঘন্য পীড়াদায়ক বলেই মনে হয়েছে তার। এজন্য সে অনুতপ্ত নয়—বরং ভুলেই যেতে চায়। পার্টিতে গিয়ে হঠাৎ একটা অসংগত ও অশোভন আচরণ প্রকাশ কববার মতো পীড়াদায়ক হলেও তাতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যেমন বোকামি এও যেন কতকটা তাই। তবু চার্লির চেহারাটা মনে আসতে কেমন শিউরে উঠলো কিটী। তার সেই বিরাট দেহ, চিবুকের সেই অস্পষ্ট ইংগিত, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সেই দীপ্ত ভংগি, আর রক্তিম গণ্ডের লাল রক্তবাহী ধমনিগুলো তার উচ্ছল প্রকৃতির পরিচয়। সেই থোকা-থোকা ভুরু দুটি ভালোই লাগতো কিটীর। কিন্তু এখন কেমন যেন আরণ্যক এবং বিকৃষ্ট মনে হয়।

তারপর ভবিষ্যত? কী আশ্চর্য, ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেমন উদাসীন যেন মনে হয় নিজেকে। কী আছে সেই ভবিষ্যতের গহ্বরে কিছুই তো দেখতে পায় না কিটী। হয়তো শিশুর জন্মের সংগে সংগেই মৃত্যু হবে তার। তার বোন ডরিস তো তার চেয়েও স্বাস্থ্যবতী, অথচ সেও মরতে বসেছিল। (ডরিস তার কর্তব্য করেছে,

বংশের উত্তরাধিকারীর জন্ম দিয়েছে সে; তার মায়ের খুশিমুখ মনে করে একটু হাসি আসে কিটীর) ভবিষ্যত তার কাছে এতই অস্পষ্ট, হয়তো-বা ভবিষ্যতের সংগে পরিচয়ই হবে না তার কোনদিন! ওয়ালটার হয়তো শিশুটির পালনের জন্য তার মাকেই অনুরোধ করবে—অবশ্য শিশুটিও যদি বাঁচে। এইটুকু নিশ্চিন্ত কিটী যে, পিতৃত্ব সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহই থাক ওয়ালটারের মনে, নির্দয় হবে না সে কখনো; কিটীর এইটুকু আস্থা আছে ওয়ালটারের ওপর। এইটাই বড়ো দুঃখ, তার বহু গুণ, তার নিস্বার্থপরতা এবং সম্মান, তার বুদ্ধি এবং সহৃদয়তা সব কিছু সত্ত্বেও তাকে ভালোবাসতে পারলো না কিটী! তাকে ভয়ও আর করে না সে। কিন্তু দুঃখ হয় তার জন্য, আবার কেমন বিস্ময়ও লাগে কিটীর। আবেগের গভীরতার জন্যই খুব সহজেই নরম হয়ে পড়ে ওয়ালটার; আর কোনক্রমে যদি সেই গভীর অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে সে, নিশ্চিত জানে সাড়া পাবে তার কাছ থেকে; ক্ষমা করবে ওয়ালটার কিটীকে। কিটীর মনে এই চিন্তাটাই আন্দোলিত হচ্ছিল যে, এতে সে যদি একটুও শান্তি দিতে পারতো ওয়ালটারকে তবেই হয়তো তার মনোবেদনার স্খালন হোত কিছুটা। আরো দুঃখ, ওয়ালটারের রসজ্ঞানের একান্ত অভাব। কল্পনায় দেখতে পায় হাসবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তারা নিজেদের কী মর্মান্তিক ভাবেই না নিপীড়িত করছে।

বড়ো ক্লান্ত কিটী। আলোটা নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়লো। তারপর বিছানায় গিয়ে ডুবে গেল অঘোর ঘুমে।

দরজায় সশব্দ করাঘাতে ঘুম ভেঙে গেল কিটীর। জেগে ওঠেও স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাই প্রথমে শব্দটা বাস্তব

বলে বুঝতে পারছিল না। করাঘাত চলতে থাকে তেমনি। মনে হোল সদর দরজায় কে যেন আওয়াজ করছে। চারদিক ঘোর অন্ধকার; অনুপ্রভ ঘড়িতে দেখলো রাত আড়াইটা। নিশ্চয়ই ওয়ালটার ফিরেছে—কিন্তু এত রাত্তিরে! হয়তো বেয়ারাটা জাগেনি। করাঘাত তেমনি চলতে থাকে, ক্রমশ জোরে আরো জোরে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় সেই আওয়াজ ভয়ংকর মনে হচ্ছিল; করাঘাত থেমে গেল তারপর, হুড়কো খোলার শব্দ শুনতে পেলো কিটী। এত দেরি করে বাড়ি ফেরেনি তো ওয়ালটার কোনদিন! বেচারা! খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়! এত রাত্তিরে লেবরেটরিতে না গিয়ে এবার শুয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। অনেকগুলো গলার আওয়াজ শোনা গেল; লোকগুলো যেন আঙিনার ভেতর ঢুকেছে! বড়ো অদ্ভুত তো, ফিরতে দেরি হলে পাছে গোলমালে বিরক্ত হয় কিটী এজন্য ওয়ালটার সতর্ক থাকে সবসময়। দু-তিন জন লোক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো যেন! পাশের ঘরেই আওয়াজ শুনা গেল! ভয় পেয়ে গেল কিটী এবার। শ্বেতাংগবিরোধী দাঙ্গার ভয়টাই ছিল বেশি কিটীর মনে। সে রকম কিছু নয়তো! বুকের স্পন্দন দ্রুত হোল। কিন্তু তার মনে ঐ অস্পষ্ট আশংকা একটা রূপ নেবার আগেই কে যেন তার ঘরের দরজায় টোকা দিলো।

—মিসেস ফেন?

ওয়াডিংটনের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো কিটী।

—হ্যাঁ, কী ব্যাপার?

—এক্ষুনি উঠে আসুন। একটা কথা আছে আপনার সংগে।

বিছানা থেকে উঠে একটা ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে নিলো কিটী। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরে। চীনা ট্রাউজার ও কোট গায়ে ওয়াডিংটন দাঁড়িয়ে,বাড়ির বেয়ারাটার হাতে লণ্ঠন;

একটু দূরে পেছনে দাঁড়িয়ে খাকি-পোশাকে তিনজন চীনা সেপাই। ওয়াডিংটনের চোখেমুখে কেমন একটা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ দেখে আঁতকে উঠলো কিটী। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, এইমাত্র বুঝি বিছানা থেকে উঠে এসেছে।

—কী হয়েছে? কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কিটী প্রশ্ন করলো।

—অস্থির হবেন না। একটা মিনিটও নষ্ট করার সময় সেই। জামা কাপড় পরে নিয়ে এক্ষুনি আসুন আমার সংগে।

—কিন্তু কী ব্যাপার! সহরে কোন হাঙ্গামা বেঁধেছে নাকি?

সেপাইদের দেখেই কিটীর ধারণা হয়েছিল হয়তো দাঙ্গা বেঁধেছে, আর তার নিরাপত্তার জন্য এরা এসেছে।

—আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে তাঁর কাছে।

—এ্যাঁ, ওয়ালটার······আর্তনাদ করে ওঠে কিটী।

—অস্থির হবেন না মিসেস ফেন। আমিও ব্যাপারটা ঠিক জানি না। কর্ণেল ইয়ু এদের আমার কাছে পাঠিয়ে খবর দিয়েছেন, আপনাকে নিয়ে এক্ষুনি ইয়ামেনে যেতে হবে।

অপলক দৃষ্টিতে একমুহূর্তের জন্য ওয়াডিংটনের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিটী। বুকের ভেতরটা কেমন হিমেল হয়ে এলো তার। তারপর ভেতরে যেতে যেতে বললো:

—এই যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি এক্ষুনি।

—যেমন অবস্থায় ছিলুম তেমনি চলে এসেছি আমি। ঘুমিয়ে ছিলুম, কোন রকমে একটা কোট আর জুতো জোড়াটা চাপিয়েই ছুটেছি। ওয়াডিংটন বলে।

কিছুই শুনেনি কিটী কী বলছে ওয়াডিংটন। নক্ষত্রের আলোতে কাপড় বদলে নিলো—যা পেলো হাতের কাছে। হাতের আঙুলগুলোও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, কাপড় আঁটার

পিন খুঁজতেই কেটে গেল অনেকটা সময়। কাঁধের ওপর একটা চীনা শাল জড়িয়ে নিলো কিটী।

—টুপি নিলাম না কিন্তু। দরকার আছে কি?

—না। চলুন।

লণ্ঠনের আলো দেখালো বেয়ারা। দ্রুত পদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো তারা। তারপর আঙিনা পেরিয়ে বাইরে পৌঁছলো।

—দেখবেন পড়ে যাবেন না যেন। আমার হাত ধরে চলুন বরং। বলে ওয়াডিংটন।

সেপাইরা চললো তাদের পেছন পেছন।

—কর্ণেল চেয়ারও পাঠিয়েছেন; নদীর ওপারে তারা অপেক্ষা করছে।

দ্রুতপদে এগিয়ে চললো তারা পাহাড়ের উতরাই পথে। বারবার কথাটা ঠোঁটের গোড়ায় আসছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে উচ্চারণ করতে পারছিল না কিটী। না জানি কী শুনবে সেই ভয়েই চুপ করে রইলো। নদীর ধারে এসে পৌঁছে দেখলো একটা ছোট্ট আলো নিয়ে শাম্পান তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

—কলেরা হয়নি তো? অবশেষে প্রশ্নটা না-করে থাকতে পারলো না কিটী।

—বোধ হয় তাই।

একটা আর্তনাদ করে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো কিটী।

—খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। বলতে বলতে কিটীকে হাত বাড়িয়ে নৌকায় উঠতে সাহায্য করলো ওয়াডিংটন। ছোট্ট একটু-খানি নদী,জলও শুকিয়ে অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছে। গলুই-এর দিকটায় সবাই দাঁড়ালো। শাম্পান বেয়ে নিয়ে চললো একটি মেয়ে, কাঁধে পুঁটুলিতে বাঁধা ছোট্ট একটি শিশু।

—ডাক্তার আজকে বিকেল থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বলে ওয়াডিংটন।

—তক্ষুণি আমাকে খবর দেয়নি কেন ?

যদিও কিছু কারণ ছিল না তবু চুপিচুপি কথা বললো তারা। তার সংগীর মনের উৎকণ্ঠা কতটুকু গভীর অন্ধকারেও কিটী উপলব্ধি করলো।

—কর্ণেল ইয়ু খবর পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারই বারণ করলেন। কর্ণেল ইয়ু সব সময় তাঁর কাছে আছেন।

—তবুও আমাকে তাঁর খবর দেওয়া উচিত ছিল। খুবই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন।

—আপনার স্বামী জানতেন কলেরা রোগী দেখে আপনি অভ্যস্ত নন। সে এক ভীষণ অসহনীয় দৃশ্য। তাঁর ইচ্ছা ছিল না সে দৃশ্য আপনি দেখেন।

—তবুও তো আমার স্বামী! রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে কিটী।

কোনও উত্তর দিলো না ওয়াডিংটন।

—কিন্তু এখন আমায় আসতে বলা হোল কেন বলতে পারেন ?

ওয়াডিংটন নিজের হাত রাখে কিটীর হাতের ওপর।

—বুকে বল বাঁধুন, মিসেস ফেন। কঠিনতর আঘাতের জন্য প্রস্তুত করুন নিজেকে।

কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মুখ ফিরে দাঁড়ালো কিটী। চীনা সেপাই-কটিও তাকিয়ে ছিল তার দিকে। তাদের চোখের মণিতে কেমন একটা অদ্ভুত চকিত দৃষ্টি লক্ষ্য করলো কিটী।

—ওয়ালটার কি মৃত্যু পথে ?

—এঁদের মারফত কর্ণেল ইয়ু যতটুকু সংবাদ পাঠিয়েছেন সেইটুকুই শুধু আমি জানি। তবে যতদূর মনে হয় শেষ অবস্থা এসে গিয়েছে হয়তো।

—কোন আশাই কি নেই আর ?

—আমি ভীষণ দুঃখিত। কিন্তু আমরা অবিলম্বে যদি না পৌছই হয়তো জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবো না আর তাঁকে।

শিউরে উঠলো কিটী। গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো।
—জানেন তো কী ভীষণ খাটুনি চলছিল ওঁর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই নেই একটুও।
কেমন একটা বিরক্তিতেই যেন ওয়াডিংটনের হাতের চাপ থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলো কিটী। ওয়াডিংটনের উৎকণ্ঠিত চাপা স্বর যেন আর সহ্য করতে পারছিল না সে।
নদীর অপর পারে পৌঁছয় তারা। তীরে দাঁড়িয়ে তুইটি চীনা কুলি হাত বাড়িয়ে কিটীকে নামতে সাহায্য করলো। চেয়ার প্রস্তুত ছিল, চেয়ারে উঠে বসতে ওয়াডিংটন বললো:
—মন স্থির রাখতে চেষ্টা করুন। প্রচুর মনোবলের প্রয়োজন এখন আপনার।
—বেহারাদের তাড়াতাড়ি যেতে বলুন।
ওদের ওপব ঐ রকমই আদেশ আছে।
অফিসারের চেয়ার আগে চললো। তার ইংগিতে পেছনে কিটীর চেয়ার কাঁধে তড়িতগতিতে ছুটে চললো বেহারাগুলো। তারও পেছনের চেয়ারে ওয়াডিংটন। চড়াই পথ পেরিয়ে গেল তারা যেন এক দৌড়ে। প্রত্যেক চেয়ারের সংগে লণ্ঠনবাহী একজন পথ প্রদর্শক। ওয়াটার-গেটের কাছে টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে গেট-কিপার। অফিসারের আদেশের সংগে সংগেই ফটকের একটা পাল্লা খুলে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দিলো। ফটক পেরোবার সময় রক্ষীর প্রশ্নে বেহারাগুলো কী যেন বললো। ঐ নিশুতি রাত্তিরে বিদেশী ভাষার অবোধ্য কিচির-মিচির কেমন যেন ত্রস্ত-চকিত করে তুললো কিটীকে। সরু আঁকাবাঁকা পিছল রাস্তা,পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো বেহারাগুলো। সামনে একটি বেহারা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। অফিসারের ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল। সংগে সংগে শোনা গেল বেহারা-দের কর্কশ কণ্ঠের প্রত্যুত্তর। তারপর দ্রুত ধাবন সুরু হোল। সহরের বুকে তখন গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ,যেন মৃত্যুপুরী। একটা সরু

গলির ভেতর দিয়ে চলছিল তারা,একটু মোড় ঘুরে এক ছুটে কয়েক ধাপ উঠে গেল ওপরে। হাঁপিয়ে উঠেছিল বেহারাগুলো, এইবার দ্রুত পদক্ষেপে নীরবে এগিয়ে চললো। একজন একটা নোংরা রুমাল বের করে চলতে চলতে কপালের স্বেদধারা মুছে নিলো। আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার পথে এগিয়ে চললো ; কোথাও কোথাও রুদ্ধ-দ্বার দোকানগুলোর আওতায় আবছা মূর্তি শুয়ে আছে দেখা যায়—বোঝা কঠিন আবার ভোরে ঘুম ভেঙে উঠবে, না এই চির-নিদ্রা। নিস্তব্ধ শূন্যতায় ঐ অপরিসর গলিগুলোকে প্রেতায়িত মনে হচ্ছিলো। তারই ভেতর আকস্মিক কুকুরের চিৎকার কিটীর পীড়িত স্নায়ুকে আতংকে সচকিত করে তুলছিল। কোথায় চলেছে তারা, মনে হয় যেন শেষ নেই! আরো একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না কি! আরো একটু…আরো, সময় নেই, সব বুঝি শেষ হয়ে গেল।

ন্যাড়া লম্বা পাঁচিলের পাশ ধরে চলতে চলতে হঠাৎ একটা ফটকের কাছে এসে পৌছলো—ফটকের দুই ধারে প্রহরীর গুমটি। চেয়ার মাটিতে নামালো বাহকেরা।

ওয়াডিংটন তাড়াতাড়ি নেমে এসে কিটীর কাছে দাঁড়ালো।

কিটীও ততক্ষণে নেমে এসেছে চেয়ার ছেড়ে। অফিসারের ডাকাডাকি ও ধাক্কায় ফটকের দুয়ার খুলে গেল। তারাও আঙিনায় প্রবেশ করলো। আঙিনাটা বেশ বড় এবং চৌকোনা। ঝুলন্ত ছাদের আলিসার ঠিক নিচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে অনেকগুলো সেপাই কম্বল মুড়ি দিয়ে। একটু থেমে পাহারারত সার্জেনটের সংগে কথা বলে অফিসারটি কী যেন বললো ওয়াডিংটনকে।

—এখনো বেঁচে আছেন। একটু সাবধানে চলুন। নিচু গলায় বলে ওয়াডিংটন।

অগ্রগামী লণ্ঠনবাহীদের পিছু পিছু উঠোনের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল। কয়েকটা ধাপ উপরে উঠে একটা দরজার ভেতর দিয়ে আর একটা আঙিনায় এসে পৌঁছলো। উঠোনেরই এক পাশে একটা লম্বা কুঠরি, ভেতরে আলো দেখা গেল। ফানুসের মধ্যবর্তী ঐ আলোতে জাফরির সিলছুট দেখা যাচ্ছিল। পথপ্রদর্শক আঙিনা পেরিয়ে তাদের ঐ ঘরের দিকেই নিয়ে এলো। দরজায় মৃদু আঘাত করলো অফিসারটি। সংগে সংগেই দরজা খুলে গেল; কিটীর দিকে এক নজর তাকিয়ে পিছিয়ে এলো অফিসারটি।

—ভেতরে চলুন। বলে ওয়াডিংটন।

ঘরটা বেশ লম্বা, কিন্তু একটু নিচু। ল্যাম্পের ধোঁয়ায় চারদিক কেমন অশুভসূচক। তিন-চারটি আর্দালি দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর। দেয়ালের গা-ঘেঁষা একটা খাটের ওপর শায়িত একটি লোক; আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা। পায়ের কাছেই নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে একজন অফিসার।

ছুটে গিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে কিটী খাটের ওপর। শুয়ে আছে ওয়ালটার, চক্ষু মুদ্রিত, নিস্প্রভ আলোয় তার মুখের রঙ যেন মৃত্যু-ধূসর। নিথর হয়ে পড়ে আছে। কোন সাড়া শব্দ নেই।

—ওয়ালটার, ওয়ালটার...............সন্ত্রস্ত নিচু গলায় ডাকে কিটী।

একটু নড়ে ওঠে যেন দেহটা, অথবা নড়ার আভাস মাত্র। এত ক্ষীণ যে স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই যেন অনুভব করা যায় না, অথচ ওরই স্পর্শে স্থির জলের ওপর একটু লহরীর রূপ আনে।

—ওয়ালটার, ওয়ালটার, কথা কও।

চোখ খুলে গেল ধীরে ধীরে, যেন অসীম প্রচেষ্টায় উঠে এলো ঐ

ভারি চোখের পাপড়ি দুটি। কিন্তু তাকালো না ওয়ালটার। একটু দূরে দেয়ালের ওপর দৃষ্টি তার স্থির-নিবদ্ধ। কী যেন বললো অতি ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে, মৃদু হাসিরও যেন একটু অস্পষ্ট আভাস।

—কী বিশ্রী ব্যাপার! বলে ওঠে ওয়ালটার।

নিশ্বাস ফেলতেও ভয় হোল কিটীর। কোন আওয়াজ এলো না আর। কোন ইংগিতও নেই আর ওয়ালটারের চোখে। কিন্তু তার কালো শীতল চোখ-দুটির দৃষ্টি (না জানি কোন রহস্যের সন্ধানে) ঐ চুণকাম-করা দেয়ালের ওপর। উঠে দাঁড়ালো কিটী। একটা রুক্ষ-দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো তার পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে।

—নিশ্চয়ই এখনো কিছু করা সম্ভব। এ রকম হাতগুটিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে শুধু?

নিজের হাত মোচড়াতে থাকে কিটী। বিছানার পাশে দাঁড়ানো অফিসারটির সংগে কথা বলে ওয়াডিংটন।

—যতটুকু সম্ভব সবই করেছেন এঁরা। এই রেজিমেণ্টের ডাক্তারই দেখছেন। আপনার স্বামীর কাছেই শিখেছেন, তিনি নিজে যতটুকু করতেন ইনিও যথাসম্ভব তাই করছেন।

—ইনিই কি সেই সার্জন?

—না, ইনি কর্ণেল ইয়ু। আপনার স্বামীর পাশ থেকে ইনি একটি বারের জন্যও নড়েননি।

নিস্পৃহভাবে কর্ণেল ইয়ু-এর দিকে ফিরে তাকালো কিটী। লম্বাটে লোকটি, মেদবহুল ভারী দেহের গড়ন, খাকি ইউনিফর্মে কেমন বেমানান মনে হয়। কর্ণেল ওয়ালটারের দিকে তাকিয়েছিল, কিটী লক্ষ্য করলো সে দৃষ্টি অশ্রুভারাক্রান্ত। একটু বেদনাবোধ জাগলো কিটীর। কিন্তু এই পীত চ্যাপ্টামুখো লোকটির চোখে জল কেন? ক্ষেপে উঠলো সে।

—এ অসহ্য!

—সব যন্ত্রণারই বাইরে উনি এখন। ওয়াডিংটন বলে।

আবার ঝুঁকে পড়লো কিটী স্বামীর মুখের ওপর। ওয়ালটারের অপার্থিব শূন্য চোখের অপলক দৃষ্টি তখনো সামনে। সে চোখ সক্রিয় কিনা, তার কথা ওয়ালটার শুনতে পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলো না। ওয়ালটারের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিটী বললো :

—ওয়ালটার, তোমার জন্য কিছুই কি আর করতে পারি না ?

কিটী ভেবেছিল, হয়তো এমন ঔষধ আছে যার প্রয়োগে ওয়ালটারের জীবনস্রোতের এই ভাটার টান রোধ করা যাবে। নিস্প্রভ আলোতে এতক্ষণে সভয়ে কিটী লক্ষ্য করলো কেমন যেন ঝুলে পড়েছে ওয়ালটারের মুখটা। চেনাই যায় না যেন আর ওকে। ভাবতেই পারলো না, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এমনি বদলে গিয়েছে ওয়ালটার। জীবিত বলেই আব মনে হয় না। প্রাণহীন একটা শবদেহ যেন। ওয়ালটার কিছু বলতে চেষ্টা করছে মনে করে কিটী ওর মুখের কাছে কান পাতলো।

—কেন ভাবছো ? দুর্গম পথ তো কাটিয়েই উঠেছি—ভালোই আছি এখন।

ক্ষণিক অপেক্ষা করলো কিটী, কিন্তু ওয়ালটার নীরব ; তার এমনি নিশ্চলতা বেদনায় অন্তর বিদীর্ণ করে দিলো কিটীর। এমনি নিথর নিশ্চল দেখে বড়ো ভয় হোল ওকে। সে যেন কবরের নিস্তব্ধতার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে এরই মধ্যে। কে যেন, হয়তো সার্জন অথবা ড্রেসার,এগিয়ে এসে ইংগিতে একটু সরতে বললো কিটীকে। তারপর মৃত্যুপথ যাত্রীর মখের ওপর নুয়ে পড়ে নোংরা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে দিলো। কিটী উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াডিংটনেব দিকে হতাশভাবে তাকালো।

—কোনো আশাই কি নেই আর ? ফিস ফিস করে বলে কিটী।

মাথা নাড়ে ওয়াডিংটন।

—আর কতক্ষণ বাঁচবে ?

—কেউ বলতে পারে না। হয়তো-বা ঘণ্টাখানেক। আসবাব শূন্য কুঠরির চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলো কিটী, ক্ষণিকের জন্য যেন স্থির হয়ে দাঁড়ালো তার দৃষ্টি কর্ণেল ইয়ু-এর মেদবহুল দেহটির ওপর।

—একটু সময় ওর কাছে একা থাকতে দেবেন আমাকে ? শুধু এক মিনিটের জন্য ? কিটী জিজ্ঞাসা করে।

—নিশ্চয়ই !

কর্ণেলের কাছে গিয়ে কী যেন বললো ওয়াডিংটন। কর্ণেল মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালো। তারপর নিচু গলায় কী যেন আদেশ করলো।

—আমরা সিঁড়িতে অপেক্ষা করবো। ডাকলেই পাবেন। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে ওয়াডিংটন।

প্রতি ধমনিতে প্রবহমান তীব্র বিষের ক্রিয়ার মতো কেমন একটা অবিশ্বাস্য অনুভূতি যেন কিটীর সমস্ত চেতনাকে অকস্মাৎ অসাড় করে দিলো; বুঝতে পারলো ওয়ালটারের মৃত্যু অবধারিত। ওর আত্মার বিষের জ্বালা প্রশমিত করে কেমন করে ওর অন্তিম সময়টুকু সহজ শান্তিময় করে তুলতে পারে, শুধু এই ভাবনাটাই তার মনে জেঁকে বসলো। কিটীর মনে হোল তার জন্য যদি ওয়ালটারের মনে কোন অশান্তি না থাকতো তবে হয়তো বেশ শান্তিতেই মরতে পারতো। কিটী আর নিজের কথা ভাবে না, ওয়ালটারের চিন্তা তার সারা মন জুড়ে রইলো।

—ওয়ালটার,ক্ষমা কর আমায়। ওর ওপর একটু ঝুঁকে বলে কিটী। একটু মৃদু চাপও বুঝি সইতে পারবে না ওয়ালটার, সেই ভয়ে তাকে স্পর্শও করে না কিটী।

—তোমাকে দুঃখ দিয়ে মর্মান্তিক দুঃখ পাচ্ছি আমি। সত্যি আমি অনুতপ্ত। আবার বলে কিটী।

কোন সাড়া নেই ওয়ালটারের, বোধ হয় শুনতেই পায়নি। তবু কিটী না বলে থাকতে পারছিল না। তার একটা অদ্ভুত ধারণা হোল ওয়ালটারের আত্মা যেন ঘৃণার ভারে অবসন্ন হয়ে প্রজাপতির মতো পাখা ঝাপটাচ্ছে।

—ডার্লিং……

ওয়ালটারের শীর্ণ স্তিমিত মুখের ওপর যেন কিসের একটু আভা ভেসে উঠলো। একটু নড়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু কিটীর ওপর তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। ওয়ালটারকে এমনি ভাবে কিটী কোনদিন ডাকেনি ; হয়তো-বা ওর স্তিমিত মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষে একটা চিন্তার ঝলকই খেলে গেল ঐ কথায় -ও তো কিছু নয় শুধু একটা সম্বোধন, অতি সাধারণ, যে ভাবে কিটী তার পোষা কুকুর বেড়ালকে ডাকে। পরমুহূর্তে যা ঘটলো সেজন্য কিটী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ওয়ালটারের ভাঙা গাল বেয়ে দুটি অশ্রুধারা ধীরে ধীরে নেমে এলো। নিজেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংযত করতে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আনলো কিটী।

—ওগো, সত্যিই যদি তুমি একদিন আমায় ভালোবেসে থাকো—আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাসতে, ঘৃণায় ভরা ছিল শুধু আমারই মন—আজকে আমি ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। অন্তরের অনুতাপের জ্বালা প্রকাশ করার কোন সুযোগই যে নেই আর আমার। দয়া কর, ওয়ালটার। মিনতি করছি, ক্ষমা কর আমায়!

তারপর চুপ করে রুদ্ধশ্বাসে ওয়ালটারের জবাবের প্রতিক্ষায় তার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত নয়নে কিটী তাকিয়ে রইলো। মনে হোল কথা বলতে চাইছে ওয়ালটার। বুকের ভেতরটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো কিটীর। তার মনে হোল, ওয়ালটারের জীবনে সে যে দুঃখ এনেছে তার কিছুটা অন্তত ক্ষতিপূরণ হবে যদি আজকের এই অন্তিম মুহূর্তেও সে মুক্তি দিতে পারে ওয়ালটারকে তার অন্তরের ঐ

তিক্ততার কঠিন নিগড় থেকে। ওয়ালটারের ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠলো! কিটীর দিকে তাকালো না; প্রাণহীন দৃষ্টি ঐ চুণকাম-করা দেয়ালের ওপর ন্যস্ত। একটু ঝুঁকে পড়ে কিটী ওর কথা শুনতে চাইলো; অতি স্পষ্টস্বরে বলে উঠলো ওয়ালটার:

—ঐ তো মরা কুকুরটা!

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো কিটী, যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো। এ যে অর্থহীন প্রলাপ! এতক্ষণ তার একটি কথাও শুনতে পায়নি ওয়ালটার! এত অনড় স্থির, বেঁচে আছে বলে মনেই হয় না। তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো কিটী; ওয়ালটারের দুটি চোখ উন্মীলিত! নিশ্বাস বইছে কিনা বুঝতে পারছে না। কেমন আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়লো কিটী।

—ওয়ালটার, ওয়ালটার……চুপি চুপি সে ডাকে আবার।

তারপর চকিতে উঠে দাঁড়ালো কিটী। হঠাৎ ভয় পেয়ে দোরের দিকে ছুটে গেল।

—একবারটি ভেতরে আসবেন! ও যেন……

ভেতরে প্রবেশ করে সবাই। চীনা সার্জন এগিয়ে যায় রোগীর বিছানার কাছে। একটা বৈদ্যুতিক-টর্চ তার হাতে, সেটা জ্বালিয়ে ওয়ালটারের চোখ পরীক্ষা করলো। তারপর চোখের পাতা বন্ধ করে দিলো হাত দিয়ে। চীনা ভাষায় কী যেন বললো সে। বাহু দিয়ে কিটীকে জড়িয়ে ধরে বলে ওয়াডিংটন।

—সব শেষ হয়ে গিয়েছে!

কিটীর বুকচিড়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চোখ থেকে। ভেঙে পড়লো না, কেমন যেন বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল। চীনা ভদ্রলোক-কটি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে খাটের চারপাশ ঘিরে,কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় সবাই; ওয়াডিংটনও নীরব। একটু পরে চীনা ভদ্রলোক-কজন নিজেদের ভেতর চুপি চুপি কী যেন বলাবলি করতে লাগলো।

—চলুন বাংলোয় ফিরে যাই। ওঁকেও নিয়ে যাবে ওখানে। বলে ওয়াডিংটন।

অবসাদে হাতটা বুলিয়ে নিলো কিটী নিজের কপালের ওপর। আবার একটু এগিয়ে গেল খাটের কাছে। তারপর বিছানার ওপর একটু নুয়ে ছোট্ট একটু চুম্বনের স্পর্শ ছোঁয়ালো ওয়ালটারের ঠোঁটের ওপর। না, এখন আর তার চোখে জল নেই।

—অনেক দুঃখ দিয়েছি তোমায়, সেজন্য অনুতপ্ত আমি।

কিটীর নির্গমন পথে অভিবাদন জানালো উপস্থিত সৈনিকেরা, সসম্মানে মাথা নত করে তা গ্রহণ করলো সে। আঙিনা পেরিয়ে আবার গিয়ে চেয়ারে উঠে বসলো কিটী।

একটা সিগারেট ধরায় ওয়াডিংটন। একটুখানি ধোঁয়ার কুণ্ডলি মিলিয়ে যায় আকাশের অসীম মহাশূন্যে—মানুষের জীবনও তো এমনি !

ভোর হয়ে এলো ; এখানে ওখানে চীনা দোকানি ঝাপ খুলছে দোকানের। অন্ধকার নিরালায় ল্যাম্পের আলোতে হাত মুখ ধুইছে একটি মেয়ে। এক কোণে চায়ের দোকানে জনা-কয়েক লোক বসেছে প্রাতরাশে। উঠতি দিনের ধূসর আলো চুপি চুপি ঢুকছে যেন চোরের মতো, সরু সরু অলিগলিতে। নদীর ওপর কুয়াশার একটা ফ্যাকাশে আবরণ। নোঙর করা নৌকোর অস্পষ্ট মাস্তুলগুলোকে যেন অদৃশ্য সৈন্যবাহিনীর করধৃত বর্শার মতো মনে হচ্ছে। নদী পেরোবার সময় বেশ যেন ঠাণ্ডা মনে হোল। রঙিন শাল মুড়ি দিয়ে বসে রইলো কিটী। পাহাড়ের চড়াই পথে এগিয়ে যেতে যেতে নিচে ফেলে এলো কুয়াশার আবরণ। সূর্যের আলো ফুটে উঠলো নির্মেঘ আকাশে। অন্য দিনের মতো

আজকেও আকাশে তেমনি আলো—কোন তফাত তো নেই অন্য দিনের তুলনায়!

—আপনি একটু শোবেন না? বাংলোয় ফিরে জিজ্ঞাসা করে ওয়াডিংটন।

—না, একটু জানালার ধারটায় বসবো।

কত দিনই সে বসেছে এই জানালাটার ধারে গত কয়েক হপ্তার ভেতর। আর দূরের ঐ বিচিত্র রহস্যময় সুন্দর মন্দিরটা কত পরিচিত তার চোখে, যেন ওদিকে তাকালেই প্রশান্তি নেমে আসে তার অন্তরে। দুপুরের রুক্ষ আলোতেও ওটা এত অবাস্তব মনে হয় যে, জীবনের অতি বাস্তবতাও বুঝি সে ভুলে যায়।

—বয়দের বলেছি আপনাকে চা দিতে। আজকে সকালেই ওঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। সে সব ব্যবস্থাও আমি দেখছি।

—ধন্যবাদ আপনাকে।

ওয়ালটারকে সমাধিস্থ করা হোল ঘণ্টা তিনেক পরে। চীনা কফিনে রাখতে হোল বলে কিটীর বড়ো বিশ্রী লাগছিল। এই অদ্ভুত শয্যায় ওয়ালটার শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না—কিন্তু এ ছাড়া তো উপায়ও নেই! ওয়ালটারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীরা ডালিয়া ফুলের একটা ক্রুশ পাঠিয়েছেন, অতি সাধারণ মামুলি, অভিজ্ঞ মালাকারের হাতে তৈরি। চীনা কফিনের ওপর ঐ ফুলের ক্রুশটা কেমন বিশ্রী বেমানান মনে হয়। সব প্রস্তুত হবার পরও কর্ণেল ইয়ু-এর জন্য অপেক্ষা করতে হোল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকবার ইচ্ছা জানিয়ে ওয়াডিংটনের কাছে তিনি খবর পাঠিয়েছেন। একটু পরে তিনিও এসে পৌঁছলেন এডিকংকে সংগে নিয়ে। পাহাড়ের চড়াই পথে তারা চললো।

অর্দ্ধ ডজন কুলির কাঁধে শবাধার। পূর্বতন মৃত মিশনারি ডাক্তারের কবরের পাশে ছোট্ট এক ফালি জমিতে ওয়ালটার স্থান পেলো। মৃত মিশনারির জিনিসপত্রের ভেতরই ওয়াডিংটন একটা প্রার্থনা পুস্তক পেয়েছিল। কেমন স্বভাববিরুদ্ধ বিব্রত-ভাব নিয়ে নিচু কণ্ঠে শেষ-প্রার্থনা পাঠ করলো সে। হয়তো ঐ ক-টি ভীষণ কথা উচ্চারণ করতে করতে তার মনে হয়েছিল এমনি মহামারির কবলে পড়ে তাকেও যদি একদিন এই পথেই আসতে হয় সেদিন হয়তো এই মন্ত্র পাঠ করবার লোক আর কেউ থাকবে না। ধীরে ধীরে শবাধাব কবরের ভেতর নামানো হোল ; কবর খননকারীরা মাটি ফেলতে লাগলো শবাধারের ওপর।

এতক্ষণ অনাবৃত মস্তকে কর্ণেল ইয়ু কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। টুপিটা পবে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালেন কিটীকে। তারপর দু-এক কথা ওয়াডিংটনকে বলে চলে গেলেন এডিকং-এর সংগে। কুলিরাও খ্রিস্টিয়ান অন্ত্যেষ্টি দেখবার কৌতূহলে দাঁড়িয়ে-ছিল এতক্ষণ ; তারাও ভারযষ্টি হাতে গুটিয়ে নিয়ে ধীবে ধীরে দলবদ্ধ হয়ে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কবলো শুধু কিটী আর ওয়াডিংটন। কবব সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে ঢাকা পড়বার পর কাঁচামাটি-গন্ধবাহী ঢিপিটার ওপর ডালিয়া ফুলের ক্রুশটি স্থাপন করলো। কিটী একবারও কাঁদেনি, কিন্তু প্রথম এক কোদাল মাটি শবাধাবের ওপর পড়তেই কেমন খচ করে উঠেছিল তার বুকের ভেতবটা। ওয়াডিংটনকে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিটী বললো :

—আপনার কি খুবই তাড়া আছে, মিঃ ওয়াডিংটন ? এক্ষুনি আমি বাংলোয় ফিরে যেতে চাই না।

—না, না, কিচ্ছু তাড়া নেই। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা কবছি।

ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে দুজন বাঁধের ওপর দিয়ে। চলতে চলতে এসে পৌছয় পাহাড়ের মাথায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিরাট তোরণটি, কোন এক পুণ্যশীলা বিধবার স্মৃতি। কিটীর মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে এটি। এ যেন একটা প্রতীক, কিন্তু কিসের সেইটাই জানে না কিটী; বলতেও পারে না সে, কেনই-বা এটিকে ঘিরে আছে কেমন একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুর।

—একটু বসবেন এখানে? কতদিন আমরা এদিকে আসিনি। বলে কিটী।

সম্মুখে পড়ে আছে ঐ দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, ভোরের আলোয় কেমন শান্ত এবং স্নিগ্ধ এর রূপ।

—এই তো কয়েক হপ্তা আগেই এখানে এসেছিলুম, অথচ মনে হয় সে যেন এক যুগ।

কোন কথা বলে না ওয়াডিংটন। কিটীর মনের টুকরো টুকরো ভাবনাগুলো ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক খালি করে।

—আচ্ছা, আত্মা অবিনশ্বর আপনি মানেন? প্রশ্ন করে কিটী।

অবাক হয় না ওয়াডিংটন কিটীর এ প্রশ্নে।

—কী করে বলবো বলুন।

—এই তো একটু আগে, কফিনে রাখবার আগে যখন ওয়ালটারকে স্নান করাচ্ছিল, আমি তাকিয়ে ছিলুম। কী জানি কেন খুবই কচি দেখাচ্ছিল ওকে। মরবার বয়স হয়নি। আপনার সংগে প্রথম দিন বেড়াতে বেরিয়ে যে ভিখারীটাকে দেখেছিলুম সেটার কথা মনে আছে আপনার? মড়া বলে আমি ভয় পাইনি সেদিন, ভয় পেয়েছিলুম এইজন্যে যে, মানুষ বলেই মনে হয়নি

ওটাকে। মনে হচ্ছিল বুঝি একটা মৃত পশু। আর একটু আগে ওয়ালটারের দিকে তাকিয়ে কী মনে হয়েছিল আমার জানেন? মনে হয়েছিল যেন পড়ে আছে একটা বিকল যন্ত্র। ঐতেই বড়ো ভয় হয় আমার! দেহটা যদি শুধুমাত্র যন্ত্রই, তবে সব দুঃখ কষ্ট, অন্তরের সব জ্বালা, স্নেহ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, সবই যে অর্থহীন!

ওয়াডিংটন নিরুত্তর। তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় নিচে নৈসর্গমালার ওপর। সুন্দর রৌদ্রালি প্রভাতে সম্মুখে প্রসারিত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, অন্তর যেন ভরে দেয় আনন্দের উল্লাসে। দৃষ্টি যতদূর যায় ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ধানক্ষেতগুলো। তারই ভেতর কোথাও কোথাও মহিষ নিয়ে চাষকর্মে ব্যস্ত নীল-পোশাকি কৃষানরা। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

নিস্তব্ধতা ভংগ করে কিটী।

—কনভেন্টে যা দেখেছি তা থেকে কী মুগ্ধ যে আমি হয়েছি, আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ঐ ভিক্ষুনীরা সত্যি বড়ো চমৎকার, এদের পাশে নিজেকে মনে হয় একেবারে অপদার্থ। তারা ছেড়েছে ঘর, দেশ, স্নেহ প্রীতি, ভালোবাসা, সন্তান, স্বাধীনতা, ছেড়েছে সবকিছু; যে সব অতি সাধারণ জিনিস ছাড়তে কষ্ট বোধ হয় আমার—এই যেমন ফুল, একটুখানি খোলা মাঠ, মধুর শরতে একটুখানি ভ্রমণ, দুটো চারটে বই, একটু গান, একটু আরাম; তারা ছেড়ে এসেছে এইসব অতি সহজে। আর এর বিনিময়ে তারা বেছে নিয়েছে ত্যাগের জীবন, যে জীবনে আছে শুধু দারিদ্র্য, কর্তব্যপরায়ণতা, কঠোরশ্রম আর আছে শুধু প্রার্থনা। তাদের কাছে এই পৃথিবীটাই বুঝি সত্যিকারের একটা নির্বাসন। জীবন কিছু নয়, একটা ক্রুশ মাত্র; স্বেচ্ছায় বহন করে নিয়েছে তারা এ ভার। কিন্তু অন্তরে রয়েছে তাদের শুধু একটি কামনা—না, না, এ যেন কামনার চেয়ে আরও তীব্র কিছু।

এ যেন চাওয়া, অন্তর থেকে সকল উৎকণ্ঠা আর তীব্রতা দিয়ে চাওয়া ঐ মহামরণকে—যে তাদের অনন্ত জীবনের দিশারী।

নিজের হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বেদনার্ত ও জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে কিটী।

—কী? জিজ্ঞাসা করে ওয়াডিংটন।

—কিন্তু অনন্ত জীবন বলে যদি কিছু না থাকে, মৃত্যুতেই যদি সবকিছুর পরিসমাপ্তি, তাহলে বলবো এই ভিক্ষুনীরা শুধু শুধু পরিত্যাগ করেছে জীবনের সবকিছু। তারা ঠকেছে, প্রতারিত হয়েছে তারা।

ক্ষণিকের জন্য কী একটু চিন্তা করে ওয়াডিংটন।

—মাঝে মাঝে অবাক হই আমিও। বিস্মিত হই ভেবে যে, তবে কি ওদের ঐ যে লক্ষ্য তা শুধু মায়া! এমনিতে এদের জীবনযাত্রা সুন্দর। আমার বিশ্বাস পৃথিবীটাকে আমরা যে একটুখানি ভালোবাসি সে শুধু ঐ জন্যে যে, কখনো কখনো বিশৃংখলার ভেতরও মানুষ সৃষ্টি করে সুন্দরের। মানুষ ছবি আঁকে, সংগীতের সৃষ্টি করে, বই লেখে, জীবনকে উপভোগ করে—এরই জন্যে বুঝি মধুময় এই পৃথিবী। এর মধ্যে সুন্দরতম হোল মানুষের সুন্দর জীবন। ঐ তো সার্থক শিল্প।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিটী। ওয়াডিংটন যা বলেছে ঠিক বুঝতে পারে না—আরো শুনতে চায়।

—আপনি কখনো সিমফনি অর্কেস্ট্রা শুনেছেন? প্রশ্ন করে ওয়াডিংটন।

—হ্যাঁ। একটু মৃদু হাসে কিটী।—সংগীতের বুঝি না কিছু, তবু ভালো লাগে আমার।

—প্রত্যেক যন্ত্রী বাজায় তার নিজস্ব যন্ত্র, কিন্তু সব সমন্বয়ে সংগীতের যে মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে তার কতটুকু খোঁজ সে রাখে বলুন তো? সে শুধু মগ্ন তারই অংশটুকু নিয়ে। সে জানে

কী মধু ক্ষরে ঐ মূর্ছনায়, তাই শ্রোতা না থাকলেও মনের আনন্দেই বাজিয়ে চলে সে নিজের অংশটুকু।

—আপনি সেদিন বলছিলেন 'তা-ও'-এর কথা ; ওটা কী বলবেন? ক্ষণিক বিরতির পর বলে কিটী।

ছোট্ট একটু চাউনিতে তাকায় ওয়াডিংটন ; ইতস্তত করে একটু, তারপর মুখের কোণে একটু ফিকে হাসি এনে বলে।

—এটা পথ আর পথিক দুই-ই। এই অনন্তের পথে চলেছে জীবন ; এ পথ সৃষ্টি করেনি কেউ, স্বকীয় সত্তায় বিশিষ্ট সে পথ। এ-ই সব কিছু অথচ কিছুই নয়—পূর্ণ অথচ শূন্য। এ থেকেই সর্ব সত্তার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, আবার এতেই লয় সব কিছুর। এ যেন কোণহীন চতুর্ভুজ, এ যেন ধ্বনি অথচ আসে না শ্রুতিতে, এ যেন মূর্তি অথচ নিরাকার। এ বুঝি বিশাল এক জাল, প্রতি রন্ধ্র ওর সাগরের মতো পরিসর, অথচ কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না এর বন্ধন থেকে। এ যেন মনিকোঠা যেখানে ফিরে যায় সব কিছু শেষ আশ্রয়ে। এর অবস্থিতি নেই কোথাও অথচ এর সন্ধানে জানলা খুলে বাইরে তাকাতে হয় না। বাসনারে বাসনা না করা আর সব কিছু সহজভাবে গ্রহণ করাই এর শিক্ষা। দীনতা যে মেনে নেয় পূর্ণতা আসে তারই কাছে। বিনয়ে যে মাথা নত করে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সে-ই। ব্যর্থতাই তো সাফল্যের ভিত্তি, আবার সাফল্যের আনাচে কানাচেই ব্যর্থতার উঁকি ঝুঁকি। কিন্তু কে জানে, কে বুঝে কখন আসে সেই সন্ধিক্ষণ। কোমলতায় সে হবে শিশুপ্রতিম। বিনয় দেবে জয়, দেবে নিরপত্তা। আত্মজয়ী যে সেই তো প্রকৃত বীর!

—এর অর্থ?

—কখনো কখনো যখন আধ ডজন হুইস্কির বোতল সামনে নিয়ে মুক্ত আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি তখন মনে হয় এদের বুঝি সত্যিই কোন অর্থ আছে।

নিস্তব্ধতা নেমে এলো তাদের ঘিরে, কিটীই আবার সে নীরবতা ভাঙলো।

—আচ্ছা, বলুন তো, ঐ তো মরা কুকুরটা, এটা কি একটা উদ্ধৃতি? একটা মৃদু হাসির রেখা ভেসে ওঠে ওয়াডিংটনের ঠোঁটে; হয়তো তখন তার স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছিল। কিটীর দৃষ্টি যদিও অন্য দিকে তবু কী একটা ভাবের প্রকাশ দেখে জবাবটা দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো।

—হলেও, আমি জানি না। সতর্ক জবাব দেয় ওয়াডিংটন।

—কিন্তু কেন? জিজ্ঞাসা করে আবার।

—এমনি। হঠাৎ মনে এলো তাই। কেমন যেন পরিচিত শুনতে। আবার নীরব।

—আপনার স্বামীর কাছে যখন আপনি একলা ছিলেন তখন এই রেজিমেন্টের সার্জনের সংগে আলাপ করেছিলুম।

একটু পরেই ওয়াডিংটন আবাব বললো—মনে হোল, বিস্তাবিত সব জানা দরকার আমাদের।

—বলুন।

—তিনি সে সময় বড্ড বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ওঁর কথাগুলোও ঠিক বুঝতে পাবিনি। তবে যতটুকু বুঝেছি পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীনই বিজাণু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন আপনার স্বামী।

—পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তো ওর কাজ। ও তো ঠিক ডাক্তাব নয়, ব্যাকটিওলজিস্ট। ওর এখানে আসার উদ্দেশ্যও ছিল গবেষণা।

—কিন্তু সার্জনের কথা থেকে এইটাই আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, এটা নেহাত দুর্ঘটনা, না নিজের ওপরই তিনি পবীক্ষা করছিলেন।

কথাটা শুনে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কিটী। চমকে উঠলো সে। কিটীর হাতটা তুলে নিলো ওয়াডিংটন।

আবার ওয়াডিংটন অতি নম্রভাবে বলে :

—এ প্রসংগের অবতারণা করেছি বলে ক্ষমা করবেন আমায়। ভাবলুম হয়তো-বা এতে একটু শান্তি পাবেন আপনি। তবে আমি জানি এমনি সময়-উপযোগী কোন কথা বলা কী ভীষণ কঠিন। ভাবলুম হয়তো-বা এইটুকু সান্ত্বনা পাবেন আপনি যে, ওয়ালটার বিজ্ঞান এবং মনুষ্যজাতির হিতার্থেই শহিদ হয়েছেন আত্মবলি দিয়ে।

কেমন একটু অধৈর্য হয়ে উঠলো কিটী।

—ওয়ালটার মরেছে ভগ্ন হৃদয়ে। বলে কিটী।

কোন জবাব দেয় না ওয়াডিংটন। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো কিটী। স্থির আর সাদা হয়ে গিয়েছে ওর মুখ।

—ঐ তো মরা কুকুরটা, এই কথায় কী বলতে চেয়েছিল ওয়ালটার? কী এর অর্থ?

—এটা গোল্ডস্মিথের *Elegy*-র শেষছত্র।

পরদিন সকালেই কনভেন্টে গেল কিটী। যে মেয়েটি দরজা খুলে দিতে এলো বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল তাকে দেখে। তারপর কয়েক মিনিট কাজ করতে না-করতেই এলেন মাদার। কিটীর কাছে গিয়ে ওর হাতটা তুলে নিলেন নিজের হাতে।

—খুব খুশি হয়েছি তোমায় দেখে। এত বড়ো আঘাতের পর এত শিগগির এখানে আসা অপূর্ব মনোবলের পরিচয়। ভালোই করেছো, হয়তো কাজের ভেতর ভুলে থাকতে পারবে কিছুক্ষণ।

চোখ নত করে একটু আরক্ত হয়ে উঠলো কিটী। সে মাদারের কাছে তার অন্তরের দুয়ার খুলে দিতে চায় না।

—বলা বাহুল্য, তোমার জন্য আমরা সবাই সমবেদনা অনুভব করছি।

—আপনাদের অশেষ দয়া। বলে কিটী আস্তে আস্তে।

—সব সময়ই তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করছি সবাই মিলে। যাঁকে তুমি হারিয়েছ তাঁর আত্মার মংগলের জন্যও আমরা প্রার্থনা করছি।

কোন উত্তর দিলো না কিটী। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন মাদার। স্বাভাবিক কর্তৃত্বের সুরে কাজের ভার দিলেন কিটীর ওপর। দু-একটি শিশুর মাথায় মৃদু চাপড় দিলেন, মুখে একটুখানি মৃদু নিস্পৃহ হাসি। তারপর নিজের কাজে চলে গেলেন।

এক সপ্তাহ পরে। কিটী সেলাই করছিল। মাদার এসে তার পাশে বসলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিটীর কাজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

—সত্যি তোমার সেলাই কিন্তু অপূর্ব। আজকালকার দিনে তোমাদের মতো মেয়েদের কাছে এ গুণ আশা করা যায় না।

—এ গুণের অধিকারী আমি মার কাছ থেকে।

—তোমায় পেয়ে তোমার মা খুবই খুশি হবেন নিশ্চয়ই।

মুখ তুলে তাকালো কিটী। মাদারের বিশিষ্ট স্বভাবের দরুণ শুধু সৌজন্য বলে ধরে নেওয়া যায় না কথাটা। তিনি বলতে থাকেন :

—তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরও তোমায় কাজে আসতে দিয়েছিলুম এই ভেবে যে, কাজে থাকলেই মনকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে। এমনি অবস্থায় একা একা তোমার হংকং যাবার সামর্থ্য আছে বলে আমি মনে করিনি; আর বাড়িতে বসে একা একা নিজের এই ক্ষতির কথা ভাবতে দিতেও চাইনি। কিন্তু এমনি করে আট দিন তো কেটে গেল। এইবার তোমার যাবার সময় হয়েছে।

—আমি যেতে চাই না, মাদার। আমি এখানেই থাকতে চাই।

—তোমার তো এখানে আর থাকবার কথা নয়। তুমি এসেছিলে স্বামীর সংগে। তিনিও আর নেই। তারপর নিজেরও যে অবস্থা, তাতে খুব শিগগিরই দরকার হবে যত্ন ও সেবার। সে সব পাওয়া কঠিন হবে এখানে। লক্ষ্মী মা আমার, তোমার ওপর আর একটি জীবনের যে দায়িত্বভার দিয়েছেন ভগবান, তার মংগলের জন্যও যথাসাধ্য করা যে তোমার কর্তব্য।

একটু নীরব রইলো কিটী। দৃষ্টি তার অবনত।

—আমার ধারণা ছিল এখানে আমার থাকাটা একান্ত প্রয়োজন। এই ভেবেও যেন আমার আনন্দ হোত মনে। আশা ছিল মহামারি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই কাজে থাকতে পারবো।

—তুমি যতটুকু করেছো তার জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু মহামারি এখন কমে এসেছে, আর বিপদের কোনো আশংকাও দেখি না; তাই ক্যানটন থেকে দুই জন সিসটার এসে পৌঁছবার আশা করছি। খুব শিগগিরই হয়তো এসে পড়বে। এরা এলে পর তোমার সাহায্যের কোন প্রয়োজনই হবে না যে আর!

কিটী দমে গেল। মাদার আর কোন কথাই শুনবেন না, তাঁর কণ্ঠস্বর থেকেই বুঝতে পারলো কিটী। সে ভালোভাবেই জানে অনুরোধ উপরোধ বৃথা এঁর কাছে। এই যে যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে কিটীর কাছে এইটাই তাঁর কথার সুরে এমনি একটা ভাব প্রকট করে দিয়েছে যা ঠিক বিরক্তি না হলেও বিরক্তির কাছাকাছি।

মিঃ ওয়াডিংটনও পরামর্শ নিতে এসেছিলেন।

—আমাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবেন ইনি, আমি চাই না। বাধা দিয়ে বললো কিটী।

—তিনি জিজ্ঞাসা না করলেও আমিই হয়তো বলতুম কথাটা ওঁকে। (ধীর ভাবে বলেন মাদার) এ অবস্থায় মায়ের কাছে তোমার

থাকা দরকার। এখানটা মোটেই উপযুক্ত নয়। কর্নেল ইয়ু-এর সংগে সহযোগিতায় মিঃ ওয়াডিংটন তোমাকে নিরাপদে হংকং পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন—বেয়ারা এবং কুলির ব্যবস্থাও হয়েছে। একজন আয়াও যাবে তোমার সংগে, পথে থাকবার সব বন্দোবস্তও ঠিক আছে। মোট কথা তোমার সুবিধার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে।

কিটীর ঠোঁট দুটো দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হয়ে এলো। তারই ব্যাপারে কিছু স্থির করবার আগে তার সংগে অন্তত একটু আলোচনা করা উচিত ছিল এঁদের। পাছে শক্ত কোন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়েই কিটী নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নিলো।

—আমাকে কবে রওনা হতে হবে?

ধীর শান্ত রইলেন মাদার।

—যত তাড়াতাড়ি হংকং পৌঁছে ইংলণ্ড রওনা হতে পারো ততই ভালো তোমার পক্ষে। আমরা ভেবেছিলুম পরশু ভোরে রওনা হলেই বোধ হয় সুবিধে হবে তোমার।

—এত শিগগিরই!

কাঁদতে ইচ্ছা করছিল কিটীর। কিন্তু সত্যিই-তো, কোন অধিকারে সে থাকবে এখানে?

—মনে হচ্ছে আমাকে তাড়াতেই পারলেই সবাই বাঁচেন আপনারা! অভিমানভরে বলে উঠলো কিটী।

মাদারের কঠিন ব্যবহারে একটখানি শৈথিল্য অনুভব করলো কিটী। তার মনের নমনীয় ভাব বুঝতে পেরেই যেন মাদারের কণ্ঠস্বর আরো কোমল হয়ে আসে অজান্তেই। তীক্ষ্ণবোধশক্তি-সম্পন্ন কিটী বুঝতে পারলো সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনীরাও স্ব-স্ব প্রাধান্য ভুলতে পারে না। সংগে সংগে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

—মনে করো না তোমার এই কর্তব্যভার ছেড়ে যাওয়ার

স্বপ্রনোদিত অনিচ্ছা এবং এমনি মধুর মনোভাব আমি বুঝতে পারিনি। মাদার বললেন।

অপলক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো কিটী। কাঁধ দুটো একটু শ্রাগ করলো। সে জানে এত গুণপনার প্রশংসার যোগ্য নয় সে। সে থাকতে চায় যাবার কোন স্থান নেই বলেই। তার বাঁচামরা'র কথা ভাববার মতো কেই-বা আছে এই সংসারে!

-আমি বুঝতেই পারছি না তুমি দেশে ফিরে যেতে চাইছো না কেন। ধীর ভাবে আবার বলতে লাগলেন মাদার।—এখানে এমন বহু বিদেশী আছে যারা এমনি সুযোগ লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত

—কিন্তু আপনি নয় নিশ্চয়, মাদার?

—আমাদের কথা ছেড়ে দাও। এই পথে যখন আসি আমরা, জানি দেশে ফিরবার পথ চিরতরে বন্ধ আমাদের কাছে।

যে বিশ্বাসের বর্ম সকল স্বাভাবিক অনুভূতির বাইরে রাখে এই সব ভিক্ষুনীদের, তারই কোন ফাঁকে আঘাত দেবার একটা দুরন্ত বাসনা (দারুণ ঈর্ষা থেকেই বোধ হয়) জাগে কিটীর আহত মনের ভেতর। পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা হয় এতটুকু পরিমান মানবিক দুবলতার চিহ্নও আছে কিনা এই প্রধানার অন্তরে।

—আমি ভাবতুম হয়তো-বা কখনো কখনো আপনার মন কেঁদে ওঠে এবং ফিরে যেতে চান সেই সব অতি প্রিয় বস্তু আর পরিচিত পরিবেশে, যাব মাঝে আপনি গড়ে উঠেছিলেন।

একটু ইতস্তত করেন মাদার। কিন্তু লক্ষ্য করলো কিটী কোন অভিব্যক্তির ছায়াও নেই তাঁর সুন্দর সংযমশীল প্রশান্ত মুখখানার ওপর।

—কষ্ট আমার বুড়ো মার, কারণ আমিই তাঁর একমাত্র মেয়ে; আর মৃত্যুর পূর্বে একবার দেখতে পেলেও তিনি আন্তরিক খুশি হবেন।

এক একবার ইচ্ছে হয় ঐটুকু আনন্দও যদি তাঁকে দিতে পারতুম। কিন্তু সে হবার নয়,একমাত্র মরণের ওপারেই দেখা হবে আমাদের; এই প্রতীক্ষায়ই থাকবো আমরা।

—তবু প্রিয়জনের কথা চিন্তায় আসে যখন, তখন এ প্রশ্নও জাগে নিশ্চয়ই যে, এই যে আত্মবঞ্চনা, একি শুভ?

—এ পথে আসায় কখনো অনুশোচনা এসেছে কিনা এই কি তোমার প্রশ্ন?

মুহূর্তে কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাদাবের মুখমণ্ডল! তিনি বলেন.

—না, কখনো না। একটা অতি নগণ্য এবং তুচ্ছ জীবনেব বিনিময়ে আমি বেছে নিয়েছি ত্যাগ এবং প্রার্থনাব জীবন।

ক্ষণিকের জন্য মৌনতা নেমে আসে আবার। একটা হাসিব ঝলক খেলে যায় মাদাবেব চোখে মুখে।

—তোমার সংগে ছোট্ট একটা প্যাকেট দিয়ে দেবো, মার্সাই পৌঁছে ওটা আমাব হয়ে ডাকে দিয়ে দিয়ো। চীনা পোস্ট অফিসের জিম্মায় এ জিনিসটা দিতে চাই না। দাঁড়াও, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

—কালকেও তো দিতে পাববেন। বলে কিটী।

—কালকে এত ব্যস্ত থাকবে, এখানে আসবাবই হয়তো সময় পাবে না। আজকে বাত্তিরেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া তোমার সুবিধে।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। স্বভাবের হাজাব প্রকাশেও তাঁর সহজ মর্যাদা বোধ কিছুতেই চাপা থাকে না। ঘব থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই ঘরে এলো সিসটার জোসেফ কিটীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। কিটীর যাত্রা সুখের হোক এই আকাংক্ষাই প্রকাশ করে সিসটাব! কর্নেল ইয়ু প্রহরীর ব্যবস্থা করেছেন, বেশ নিরাপদেই যেতে পারবে কিটী। সিসটারদের অনেকেই অনেকবার যাতায়াত করেছেন এই পথে, কোনো ভয়

নেই। তারপর সমুদ্র কেমন লাগে কিটীর? *Mon Dieu*, ভারত মহাসাগরে ঝড়ের ভেতর আসতে তার যা অবস্থা হয়েছিল! কিটীর মা মেয়েকে পেয়ে খুবই খুশি হবেন নিশ্চয়ই। কিটী নিজেও যেন খুব সাবধানে থাকে; কেন না তার সত্তার ভেতর আর একটি জীবনেরও দায়িত্ব এসে মিশে গিয়েছে। তাদের উভয়ের মংগল-কামনায় সবাই মিলে প্রার্থনা করবে; ডাক্তারের আত্মার উদ্দেশেও প্রার্থনা জানাবে তারা। স্নেহ প্রীতির উচ্ছ্বাসে-ভরা তার কথাগুলো; তবু কিটীর মনে হয়, অনন্তের ধ্যানে মগ্ন এই সিসটারের কাছে সে কিছুই নয়, শুধু অবাস্তব নিরাকার একটা বস্তু বিশেষ। একটা দুরন্ত ইচ্ছা জাগে কিটীর মনে একবার এই মেয়েটার প্রস্তর কঠিন দেহটা সবলে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে—বুঝতে পারো না আমিও একটা মানুষ, যার শান্তি নেই, সুখ নেই, সংগী নেই; বোঝ না আমিও চাই একটু আরাম, একটুখানি সহানুভূতি, একটুখানি আশা! ওগো, একবার তোমার ঐ ভগবানের পাশ থেকে নেমে এসে একটুখানি মমতায় ভরে দিতে পারো না আমায়! আমি চাই না তোমার সেই খ্রিস্টিয়ানসুলভ অনুকম্পা, আমি চাই একটুখানি মানুষের প্রতি মানুষের মমতাবোধ। ভাবতে ভাবতে ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে একটুখানি হাসির রেখা। কী অবাকই না হবে সিসটার এই সব কথা শুনলে! নিশ্চয়ই তার মনের সন্দেহটা দূর হবে যে, প্রত্যেকটা ইংরেজ এক একটা সত্যিকারের আস্ত পাগল!

—সি-সিকনেস আমার হয়নি কখনো। জবাব দেয় কিটী।

একটা ছোট্ট পার্শ্বেল হাতে নিয়ে ফিরে এলেন মাদার।

– মার জন্য এই রুমালগুলো আমি করে রেখেছিলুম; নামগুলো সেলাই করেছে আশ্রমের মেয়েরা। বললেন তিনি।

সিসটার জোসেফ বললো রুমালের কাজগুলো নিশ্চয়ই ভালো লাগবে কিটীর। অনিচ্ছার সংগে মৃদু হেসে প্যাকেটটা খুলে

দেখালেন মাদার। খুব মিহি কাপড়ের রুমাল, প্রতিটা অক্ষর স্ট্রবেরিপাতার সূক্ষ্ম নকসায় আঁকা। সূচিকাজের প্রশংসা করে কিটী। মাদার প্যাকেটটা বেঁধে তুলে দিলেন কিটীর হাতে। *Eh bien, Madame, je vous quitte* স্বভাব-সুলভ বিনয় প্রকাশের পর চলে গেল সিসটার জোসেফ। এইবার তার বিদায় নেবার পালা বুঝতে পারে কিটী। অশেষ দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালো সে মাদারকে। আসবাবহীন চুনকাম করা সাদা শূন্য করিডর দিয়ে এগিয়ে গেল তারা।

—মার্সাই পৌঁছে পার্শ্বেলটা রেজিস্টারি করে পাঠাতে তোমার খুব অসুবিধা হবে না তো? বলেন মাদার।

—না, না। নিশ্চয়ই পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ঠিকানাটার ওপর। নামটা চমৎকার লাগলো তার কাছে। কিন্তু জায়গার নামটায় কেমন কৌতূহল জাগলো।

—জায়গাটা আমার পরিচিত মনে হচ্ছে। ঐ স্যাতো য় আমি গিয়েছি। বন্ধুদের সংগে ফ্রান্সে একবার মোটরে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।

—হতে পারে। সপ্তাহে দুদিন বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয়।

—আমি হলে কিছুতেই এমনি সুন্দর জায়গা ছেড়ে আসতে পারতুম না কিন্তু।

—আমাদের এ বাড়িটার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমার নিজের এ বাড়ির সংগে পরিচয় ছিল না খুব বেশি। মনে যদি খেদ থেকে থাকে তবে এটির জন্য নয়, সেটা অন্য এক ছোট্ট স্যাতো। সেখানেই ছেলেবেলাটা কেটেছে আমার। সেই বাড়িটা পিরেনিজ পর্বতের ওপর। আমি জন্মেছিলুম সমুদ্র গর্জন শ্রুতির ভেতর। তাই অস্বীকার করে লাভ নেই, কখনো কখনো পাহাড়ের

কোলে ঢেউয়ের প্রচণ্ড আঘাতের ধ্বনি শুনবার জন্য মন কেঁদে ওঠে।

কিটীর মনে হয় তাঁর এই স্মৃতিসমুদ্র মন্থন শুধু একটু কৌতুক মাত্র। ইতিমধ্যেই তারা পৌঁছে গেল কনভেণ্টের ফটকের কাছে। কিটীকে বিস্ময়ে অভিভূত করে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন মাদার। গাল দুটোতে তাঁর বিবর্ণ ঠোঁটের স্পর্শ, এমনি অপ্রত্যাশিত যে, কিটী রক্তিম হয়ে উঠলো এবং তার ভয়ানক কান্না পেলো।

—বিদায়, মা আমার, তোমার মংগল হোক।

আলিংগণে আবদ্ধ করে রাখলেন মাদার কিটীকে কিছুক্ষণ।

—মনে রেখো, কর্তব্যের দাবি পূরণ করাই বড়ো কথা নয়; কোন প্রকারে কর্তব্য শেষ করায়ও কোন কৃতিত্ব নেই। বড়ো কথা কর্তব্যে প্রীতি। যখনই কর্তব্য আর প্রেম হয় এক, সুন্দরের অনুভূতি আসে তখনই—তখনই আসবে অন্তরে অপূর্ব আনন্দের উপলব্ধি।

কনভেণ্টের দরজা শেষবারের মতো কিটীর পেছনে বন্ধ হয়ে গেল।

পাহাড়ের চড়াই ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে কিটীর সংগে চললো ওয়াডিংটন। যেতে যেতে পথের পাশে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ওয়ালটারের সমাধিটা দেখে শেষবারের মতো। স্মৃতি তোরণটির কাছে এসে ওয়াডিংটন বিদায় নিলো কিটীর কাছ থেকে। শেষবারের মতো ঐ তোরণটির দিকে তাকিয়ে কিটীর মনে হোল সেও বুঝি সমপরিহাসে ওটার বিসদৃশ রহস্যময় পরিহাসটুকুর জবাব দিতে পারে। চেয়ারে উঠে বসলো কিটী।

দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে। পথিপার্শ্বের চলমান দৃশ্য-গুলো তার চিন্তার পটভূমিকা রচনা করে। প্রতিটি দৃশ্য ভেসে ওঠে দুই প্রস্তে, স্টেরিওস্কোপে দেখা গোল ফ্রেমে আঁটা; মনে হয় প্রতিটি দৃশ্যেরই বুঝি আছে এক একটা বিশিষ্ট অর্থ। দৃশ্যগুলোর গায়-গায় লেগে আছে কয়েক সপ্তাহ আগেকার স্মৃতির টুকরোগুলো, যখন চলেছিল সে বিপরীত দিকে। বোঝার ভারে কুলিগুলোও পিছিয়ে পড়েছে বিশৃংখল ভাবে; দুজন তিনজন এক সংগে, কোথাও আবার একশ গজ দূরে একের পেছনে আর এক জন; তার পিছনে আরো দু-তিনজন; প্রতিহারী সৈনিকেরাও হেঁটে চলেছে দিনে পঁচিশ মাইল। দুই বাহকের কাঁধে আয়া, আর কিটীর চারজন—তার ওজনের জন্য নয়, সম্মানের খাতিরে। এখানে ওখানে দেখা হয় ভাবী বোঝা ঘাড়ে সারিবদ্ধ কুলি বাহিনী। আবার কোথাও-বা কোন চীনা অফিসার চেয়ারে বসে উৎসুক চোখে শ্বেতাংগিনী মহিলাকে লক্ষ্য করছে। কখনো আবাব দেখা হয় হেথা-হোথা বাজারের পথে কিষানেব সাবি, গায়ে ফিকে নীল জামা, মাথায় বিরাট এক একটি টপি; কোথাও-বা লোহার জুতো-আঁটা পা নিয়ে থপথপিয়ে চলেছে কোন বৃদ্ধা বা তরুণী। পেরিয়ে গেল ছোট ছোট পাহাড়ের চড়াই উতরাই, সাবি সারি প্রশস্ত ধানেব ক্ষেত আর বাঁশবনের আলিংগনে আবদ্ধ ছোট ছোট খামার বাড়ি। পশ্চাতে পড়ে রইলো তাদের রুক্ষ গ্রাম আব জনবহুল পাঁচিলে ঘেরা নগর। বড়ো ভালো লাগে প্রথম হেমন্তের মধুর রুপোলি রোদ; বেপথু ঊষার সলাজ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে ধান-ক্ষেতের ওপর ইন্দ্রজালের মধুচ্ছটা। সকালটা ঠাণ্ডা মনে হলেও পরে দিনের উষ্ণতা প্রীতিকর মনে হয়। কিটীর অন্তর এক অপূর্ব পুলকে ভরে ওঠে, নিজেকে সে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

অপরূপ রঙে রঙিন, অনাবিল বৈচিত্র্যে অভিনব, অদ্ভুত ঐ সুস্পষ্ট দৃশ্যগুলো যেন সামনে টাঙানো পর্দায় ভেসে উঠছে যেমনি

অদ্ভুত তেমনি রহস্যময়। এরই পটভূমিকায় ভেসে বেড়ায় কিটীর কল্পনার ছায়ামূর্তিগুলো। মনে হয় সবই বুঝি অলীক অবাস্তব। ঐ খাঁজকাটা-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মী-তান-ফু সহরটা যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের পটে আঁকা নগরের একটা দৃশ্য। ভিক্ষুনীরা, ওয়াডিংটন আর তার প্রেমিকা মাঞ্চু, এরা সবাই বুঝি ঐ মুখোশ নাট্যের এক একটি কুশীলব। বাকি সবাই, আঁকাবাঁকা গলিতে প্রবাহিত জনস্রোত আর যারা মরেছে, তারা নামহীন গোত্রহীন ভূমিকার অংশ। এ সবেরই তাৎপর্য আছে হয়তো ; কিন্তু কী সেই তাৎপর্য ? এ যেন কোন উৎসবের সম্মিলিত নৃত্য, খুবই জটিল অথচ প্রাচীন, কোন গূঢ় অর্থ আছে, কিন্তু জানা নেই এর সূত্রটুকু।

কিটীর বিশ্বাস হয় না (বাঁধের ওপর এক বৃদ্ধা মহিলা চলেছিল, গায়ে নীল পোশাক—সূর্যের আলোতে নীল পাথরের মতো চিক-মিক করছিল। অজস্র কুঞ্চন সারা মুখে, যেন আইভরির মুখোশ পরা, একটা কালো লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলছিল) বিশ্বাস হয়না সে আর ওয়ালটারও ঐ অলীক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছে ; অভিনয়ে বিশিষ্ট অংশও গ্রহণ করেছে উভয়েই। কিটীর নিজের জীবনও তো যেতে পারতো, কিন্তু গেল ওয়ালটারের। ও কি পরিহাস মাত্র ? হয়তো-বা সবটুকুই শুধু একটা স্বপ্ন ; একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হয়তো জেগে উঠবে সে হঠাৎ। কোন সুদূর অতীতে কোন এক সুদূর দেশে বুঝি ঘটেছিল এ ঘটনা। বড়ো অদ্ভুত ! বাস্তবের এই রুপোলি পটভূমিতে কী অলীকই মনে হয় এই নাটকের চরিত্রগুলোকে ! কিটী যেন একটা কাহিনী পড়ছে ; কোন সম্পর্ক নেই তার সংগে এই কাহিনীর। ওয়াডিংটনের পরিচিত মুখও বুঝি স্মরণ করতে পারে না আর সহজে।

সন্ধ্যায় তারা ওয়েস্টার্ণ রিভারের তীরবর্তি সহরে পৌঁছবে। সেখান থেকেই জাহাজ ধরবে কিটী। শুধু একটা রাত্রির ব্যবধান, তারপরই হংকং।

ওয়ালটারের আকস্মিক মৃত্যুতে একটুও কাঁদেনি বলে প্রথম-প্রথম খুবই লজ্জিত হয়েছিল কিটী। নিজেকে কী ভীষণ নির্লিপ্ত মনে হয়েছিল সেদিন! কিন্তু কেন! ঐ চীনা অফিসার কর্নেল ইয়ু-এর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল! স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে খুবই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল কিটী সন্দেহ নেই। বাংলোয় আর ফিরে আসবে না ওয়ালটার, ভোর বেলা স্নানঘরে আর স্নান করতে শুনবে না তাকে, এই কথাটা চিন্তা করতেও কেমন কঠিন মনে হয় কিটীর। এই তো দুদিন আগেও সে বেঁচে ছিল, আর আজ তার কোন অস্তিত্বই নেই! কিটীর খ্রিস্টিয়ানসুলভ ধৈর্যে কনভেন্টের সবাই অবাক হয়েছিল; এত বড়ো ক্ষতি সইবার অপূর্ব মনোবলের পরিচয় পেয়ে প্রশংসা করেছিল তাকে। কিন্তু ওয়াডিংটন চতুর; তার গভীর সহানুভূতি প্রকাশের ভেতরও কেমন যেন, ঠিক বুঝতে পারেনি কিটী, একটু চাপা মনে হোল তাকে। ওয়ালটারের মৃত্যুতে কঠিন আঘাত পেয়েছিল কিটী। তার মৃত্যু কখনোই সে কামনা করেনি। ভালো তাকে বাসতো না, ভালোবাসতে পারেনি কোনদিন; তবু দুঃখের প্রকাশই তো শোভন হোত! নিজের মনের স্বরূপ প্রকাশ করা যে আরো অশোভন আরো কুৎসিত! আত্ম-প্রবঞ্চনায় অনেক কিছু করেছে কিটী। গত কয়েক সপ্তাহে এইটুকু শিক্ষা সে লাভ করেছে যে, অন্যের কাছে মিথ্যা বলবার প্রয়োজন আছে; কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনার ক্ষমা নেই। ওয়ালটারের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত হয়েছে কিটী; কিন্তু তার এই দুঃখবোধ-টুকু শুধু একটা সাধারণ মানুষের দুঃখবোধের মতোই—একজন পরিচিতের মৃত্যুতে যতটুকু দুঃখ হয় শুধু ততটুকুই। ওয়ালটারের অশেষ গুণ স্বীকার

করছে কিটী, তবু ভালো তাকে লাগেনি কোনদিন ; অসহ্য মনে হোত তাকে। কিন্তু তারই মৃত্যুতে সে স্বস্তি পেয়েছে এ কথাও তো মনে করতে পারে না কিটী! শুধু তার একটি কথাতেই যদি ফিরে আসে ওয়ালটারের জীবন, সেটুকু করতেও প্রস্তুত কিটী। তবুও এই কথাটাই কেন বার-বার মনে হয় যে,এ মৃত্যু তার পথকে সহজ সুগম করে দিয়েছে! দুজনায় তারা সুখী হোত না কোনদিন, অথচ বিচ্ছিন্ন হওয়া ছিল আরো কঠিন। কিন্তু সংগে সংগেই নিজের এই উপলব্ধিতে চমকে ওঠে কিটী। যে শুনবে সেই তো তাকে নিষ্ঠুর তাকে হৃদয়হীন মনে করবে! যাক কেউ জানবে না কিছু। সত্যিই কি তাহলে সব মেয়েই অন্তরে এমনি গোপন লজ্জাকর কাহিনী অপরের কৌতুকদৃষ্টি এড়িয়ে পোষণ করে!

ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না কিটী—কোন পরিকল্পনা নেই তার। তবে এইটুকু জানে হংকংএ থাকবে না সে বেশি দিন। হংকং-এর কথা ভাবতেও যেন কেমন ভয়ে শিউরে ওঠে সে। ইচ্ছা হয় এই সদাহাস্যময় অতিথিপরায়ণ লোকগুলোর মধ্যেই চেয়ারে বসে ঘুরে ঘুরে উদাসীন নিস্পৃহ দর্শকের মতো জীবনের ছন্দ দেখে দেখে কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন, প্রতিটি রাত্রি কাটায় ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন আশ্রয়ে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতকে গ্রহণ না করে যে আর কোন উপায় নেই তার! হংকং-এ পৌঁছে সে উঠবে হোটেলে। বাড়িটা আর আসবাবপত্র সবকিছুর বিলিব্যবস্থা করবে এরপর। টাউনসেণ্ডের সংগে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন হবে না আর। কিটীর পথে আর না আসলেই ভালো করবে চার্লি। তবুও অন্তত একবারের জন্যও দেখা করবে কিটী ওর সংগে, শুধু এই কথাটাই জানিয়ে আসতে যে, কতটা ঘৃণাই-না আজ তাকে করে সে।

কিন্তু চার্লস টাউনসেণ্ডের কথা আবার কেন!

সিমফনির জটিল ছন্দের তলে তলে হারপ-এর তারে উচ্ছ্বসিত ঝংকারের অনুরণনের মতোই শুধু একটা কথাই যেন বার-বার

আঘাত দিলো কিটীর মনোতন্ত্রীতে। এই ভাবনারই স্পর্শে অপরূপ এক বিজাতীয়রূপে রূপায়িত হয়ে উঠলো ধানক্ষেতগুলো। এরই প্রভাবে কিটীর পাণ্ডুর ঠোঁটের সীমারেখায়ও ভেঙে পড়লো একটু-খানি হাসির মৃদু তরংগ, যখন দেখলো একটি মসৃনমুখো ছেলে তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে, দেহে তার উচ্ছ্বাসের ঢেউ চোখে মুখে ঔদ্ধত্যের ছায়া। এরই যাদু স্পর্শে দুর্বার জীবন জেগে উঠেছে সহরগুলোতে, যার ভেতর দিয়ে সে চলেছে। মহামারির কবলে অবরুদ্ধ কারানগরী হতে মুক্তি পেয়েছে সে! কী অপূর্ব আজ আকাশের ঐ নীলিমা! সে তো অনুভব করতে পারেনি এর আগে! কী আনন্দের ছোঁয়াচ লেগে আছে বাঁধের ওপর নুয়ে পড়া ঐ বাঁশবনগুলোর পাতায় পাতায়। মুক্তি! এই তো সেই সংগীত, যাতে মুখর হয়ে উঠেছে তার অন্তর; এই তো সেই যার মূর্ছনায় রামধনু রঙে রঙিন হয়েছে তার অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ। নদীর বুকে কুয়াশার আবরণের মতো যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে বালসূর্যের স্নিগ্ধ আলো। মুক্তি! এ মুক্তি শুধু বন্ধনের পীড়া থেকে নয়, নয় এ মুক্তি শুধু বন্ধুত্বের নিগড় থেকে; মুক্তি শুধু মরণের হাত থেকেও নয়, যে দেখার ভয়; মুক্তি ঐ প্রেমের হাত থেকেও, যে প্রেম নামিয়েছে তাকে নীচে; এ মুক্তি তার সকল অধ্যাত্ম বন্ধন থেকে, এ মুক্তি বিদেহী আত্মার মুক্তি। মুক্তির হাত ধরে দাঁড়িয়েছে সাহস, এসেছে ভবিষ্যতের প্রতি দুর্জয় অনাসক্তি।

স্টিমারের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কিটী দেখছিল নদীর বুকে সুন্দর সুন্দর নানা রঙের নৌকো আর যান-বাহনের আনাগোনা। হংকং বন্দরে নোঙর করার সংগে সংগে নিজের কেবিনে ঢুকে দেখতে গেল আয়া কিছু ফেলে না যায়। আরসিতে দেখে নিলো একবার নিজের চেহারা। তার পরণে কালো পোশাক। সন্ন্যাসিনীরাই এ পোশাকটা যোগাড় করে দিয়েছিল। শোক প্রকাশের জন্য এ পোশাক সে পরেনি, পরেছে অভূতপূর্ব যে সব অনুভূতি তার মনে জেগেছে সেগুলো ঢাকা দেবার একটা কার্যকরী ছদ্মবেশ হিসেবে। কেবিনের দরজায় নক করলো কে যেন। আয়া দরজাটা খুললো।

—মিসেস ফেন ?

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রথমে মুখ দেখে চিনতে পারেনি কিটী। পরমুহূর্তেই দপ করে ওঠে তার বুকের ভেতরটা,আরক্ত হয়ে ওঠে সে। ডরোথি টাউনসেণ্ড! এত অপ্রত্যাশিত যে কিটী বুঝতে পারলো না কী সে বলবে, কী সে করবে! কিন্তু মিসেস টাউনসেণ্ড কেবিনের ভেতর এসে আবেগের সংগেই বুকে টেনে নিলো কিটীকে।

—ও ডিয়ার, ডিয়ার! সত্যি বড়ো দুঃখিত আমি।

চুম্বনেও বাধা দেয় না কিটী। যাকে সে জানে নিষ্প্রাণ হিমশীতল বলে, তারই এতটুকু আবেগের উচ্ছ্বাসে কেমন বিস্মিত হয় কিটী।

—এ আপনার অশেষ দয়া। ধীরে ধীরে বলে কিটী।

—চলুন বাইরে ডেকে। জিনিসপত্র আয়াই গুছিয়ে নেবেখন। আর আমার লোকজনও সংগে আছে।

কিটীর হাত ধরে ডরোথি। বয়সের ছাপমারা ঐ শিষ্টমুখের ওপরও সত্যিকারের উদ্বেগের ছায়া লক্ষ্য করে কিটী।

—আপনার জাহাজ একটু আগেই এসে গিয়েছে মনে হয়।

আমারও দেরি হয়ে গিয়েছিল আর কি! সত্যি আপনার সংগে দেখা না হলে ভীষণ কষ্ট পেতুম।

—কিন্তু আমারই জন্য তো আপনি আসেননি? বলে ওঠে কিটী।

—আপনার জন্যই তো ।

—কিন্তু আমি আসছি জানলেন কী করে?

—মিঃ ওয়াডিংটন 'তার' করেছিলেন।

মুখ ফিরিয়ে নিলো কিটী। কিসে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার। কী আশ্চর্য! এমনি একটুখানি সহৃদয়তায় এতটা আবিষ্ট সে কেন! কাঁদবার ইচ্ছা ছিল না তার, মন বলছিল চলে যাক মিসেস টাউনসেণ্ড। কিন্তু কিটীর একটা হাত নিজেব হাতে তুলে নিয়ে চাপ দেয় মিসেস টাউনসেণ্ড। এই লাজুক মহিলাব এতটা আত্মপ্রকাশে কেমন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে কিটী।

—চার্লি ও আমাব একান্ত ইচ্ছা যতদিন হংকং-এ থাকবেন অনুগ্রহ করে আমাদের ওখানেই কাটাবেন।

কিটী নিজেব হাত ছাড়িয়ে নেয়।

—এ আপনাদের অসীম দয়া! কিন্তু সে হয় না, আমি পারবো না।

—কিন্তু পাবতেই হবে আপনাকে। নিজেব বাড়িতে এমনি একলা কিছুতেই থাকা চলে না আপনাব। এ অসম্ভব। আমি সব যোগাড় করে রেখেছি আপনাব জন্য। আপনার নিজের বসবার ঘবেরও আলাদা ব্যবস্থা করেছি। যদি ইচ্ছে হয় খাওয়াব ব্যবস্থাও আপনি পৃথক ভাবে কবতে পারবেন। আপনি আসুন এই আমাদের অনুবোধ।

—বাড়িতে ওঠার কথা অবশ্যি আমি ভাবিনি। ভেবেছিলুম হংকং-হোটেলে একটা ঘর নেবো ক-দিনের জন্য। অনর্থক আপনাদের অসুবিধায় ফেলতে চাই না।

এমনি প্রস্তাব খুবই অপ্রত্যাশিত মনে হয় কিটীর। কেমন সব গুলিয়ে যায় তার, একটু বিরক্তিও বোধ করে যেন। চার্লির যদি

একটুখানি শালীনতা-বোধও থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই তার স্ত্রী মারফত এমনি আমন্ত্রণ পাঠাতো না। তাদের দুজনার কাছে কিঞ্চিতমাত্রও কৃপার পাত্র হতে চায় না কিটী।

—আপনি হোটেলে উঠবেন এ তো ভাবতেই পারি না আমরা। আর হংকং-হোটেল এখন ভালোও লাগবে না আপনার। নানা রকমের লোকের আনাগোনা আর সারাক্ষণ বাজনার হট্টগোলের ভেতর অস্থির হয়ে উঠবেন। বলুন, আপনি আসছেন আমাদের বাড়িতে? আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি বা চার্লি কেউই একটুও বিরক্ত করবো না।

—বুঝতে পাচ্ছি না কেন এত দয়া আপনাদের আমার ওপর।

কোনো অজুহাতই যেন খুঁজে পায় না কিটী; সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও পারছে না। আবার বলে:

—বর্তমান অবস্থায় আমার সাহচর্য অপরিচিত কারো ভালো লাগবে না।

—কিন্তু আমরা তো আপনার কাছে অপরিচিত নই? সে আমি চাই না, আমি চাইছি আপনার বন্ধুত্ব।

কিটীর হাত চেপে ধরে ডরোথি, তার সরল স্পষ্ট কণ্ঠস্বর আবেগের কান্নায় যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল ক্ষণে ক্ষণে।

—সত্যি, বিশ্বাস করুন, আমি একান্ত চাইছি আপনি আসুন আমাদের বাড়িতে। দেখুন, আপনার ঋণ শোধ করতে চাই আমি।

বুঝতে পারেনি কিটী কথাটা। চার্লির স্ত্রীর কী ঋণ আছে তার কাছে!

—দেখুন, গোড়ায় সত্যি-সত্যি আপনাকে ভালো লাগেনি আমার। আপনাকে কেমন বাড়াবাড়ি মনে হোত যেন। স্বভাবতই আমি একটু প্রাচীন-পন্থী এবং বোধ হয় কিছুটা স্বভাব-অসহিষ্ণুও।

এক নজরে তাকায় কিটী ওর দিকে। ডরোথি হয়তো বলতে চাইছে গোড়াতে কিটীকে অসভ্য বলেই মনে হয়েছিল। মুখের

ভাবে প্রকাশ না পেলেও ভেতরে ভেতরে কেমন হাসি আসছিল কিটীর। ডরোথি তাকে কী মনে করেছিল তাতে কিছুই যায় আসে না।

—তারপর যখন শুনলুম একটুও ইতস্তত না করে স্বামীর সংগে স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়েছেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, নিজেকে আপনার কাছে বড়ো ছোট মনে হোল। আপনার অপূর্ব সাহস, অসীম মনোবলের কাছে আমরা সবাই হয়ে গেলুম অতি নিকৃষ্ট, মূল্যহীন।

ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল ডরোথির গাল বেয়ে।

—আমি বুঝাতে পারছিনা কী মুগ্ধ হয়েছি আমি, কী অসীম শ্রদ্ধা করি আপনাকে। জানি আপনার এই বিরাট ক্ষতির কোন একটুও পূরণ করতে পারবো না হয়তো, কিন্তু এইটকু অন্তত আপনাকে বুঝাতে চাই, কতটুকু সমবেদনা কতটকু সহানুভূতি আছে আপনার জন্য। তাই একটু কিছু করার সুযোগও যদি পাই নিজেকে আমি কৃতার্থ মনে করবো। আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম বলে সে শোধ নেবেন না আজ আমার ওপর। আপনার অসম সাহসিকতার তুলনায় আমি যে সত্যি অতি নগণ্য!

মাথা নিচু করে শুনছিল কিটী। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে। ডরোথির এই আবেগ অসহ্য। তার মন স্পর্শ করে সত্যি ; কিন্তু একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিল সে এই ভেবে যে, এই সহজ মেয়েটি সমস্ত মিথ্যাকে বিশ্বাস করে নিয়েছে।

--এই যদি সত্যি আপনার একান্ত ইচ্ছা, তবে চলুন খুশি মনেই যাবো আপনার বাড়িতে। বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিটী।

টাউনসেণ্ডদের বাড়ি 'পিকে'। সম্মুখে সমুদ্রের প্রসারিত দৃশ্য। সাধারণত লাঞ্চের সময় বাড়ি আসে না চার্লি। কিন্তু কিটীর হংকং পৌঁছবার দিন ডরোথি বলেছিল সে যদি চায় চার্লি লাঞ্চে হাজির থেকে স্বাগত জানাতে পারে তাকে। (তারা পরস্পরকে নাম ধরেই ডাকতে সুরু করেছে ইতিমধ্যে।) কিটী ভাবলো দেখা যখন হবেই শিগগির হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। চার্লি কতটুকু অপ্রতিভ হয় সেইটুকু দেখার ঔৎসুক্য নিয়েই প্রতীক্ষা করে কিটী! সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো তাকে এই আমন্ত্রণ জানাবার কথাটা এসেছে ডরোথিরই কল্পনায়,আর টাউনসেণ্ড নিজের ভিন্ন মনোভাব সত্ত্বেও সায় দিয়েছে বিনা প্রতিবাদে। নিজের কাছে যে কাজ ঠিক বলে ধারণা সেইটাই করা চার্লির স্বভাব, এটা জানতো কিটী; আর কিটীকে এমনি সনিবন্ধ আতিথেয়তায় আমন্ত্রণ জানানো তখনকার অবস্থায় স্বাভাবিক এইটুকুও বুঝতে পারলো সে। মনে কোন ক্ষোভ না রেখে তাদের শেষ সাক্ষাতের দিনটির কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আনতে পারবে না চার্লি। চার্লির মতো এমনি দাম্ভিক লোকের মনের ভেতর নিশ্চয়ই সেদিনকার কথাগুলো দুষ্ট-ক্ষতের মতো এখনও খচ খচ করছে—এ ক্ষত শুকুবেও না কোনদিন। যত আঘাত কিটী পেয়েছে চার্লির কাছে, ততটুকু আঘাত সেও দিতে পেরেছে চার্লিকে এইটুকুই আজ কিটীর সান্ত্বনা। নিশ্চয়ই চার্লি ঘৃণা করবে কিটীকে এবার। কিন্তু এই কথাটা ভেবেও কিটীর আনন্দ যে, সে চার্লিকে আজ ঘৃণা করে না আর, করে অবজ্ঞা। কেমন একটা অদ্ভুত তৃপ্তিতে মন ভরে উঠলো তার। মনে যাই থাক না কেন, আজকের দিনে কিটীর ওপর সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাবে চার্লি। কিটী তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার পর সেইদিন চার্লি হয়তো স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল, আর কোনো দিন কিটীর দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না।

আজ কিন্তু তারই অপেক্ষায় বসে রইলো কিটী ডরোথির সংগে।

ড্রয়িং-রুমের নিষ্প্রভ জৌলুসের ভেতরও নিজের অন্তরের পুলক অনুভব করলো কিটী। একটা আর্ম-চেয়ারে বসে আছে, এখানে ওখানে সুন্দর ফুলের ছড়াছড়ি; দেয়ালের গায়ে সুন্দর চিত্রের শোভা; ছায়া সুনিবিড় শীতল ঘরটি বড়ো প্রীতিদায়ক। মিশনারির বাংলোর সেই শূন্য নির্জন পার্লারের কথা স্মরণ করতেও সর্বাংগে একটা অস্পষ্ট শিহরণ অনুভব করে কিটী। সেই কাঠের চেয়ার, রান্নাঘরে কাপড়ে ঢাকা দেওয়া খাবার টেবিল, নোংরা তাকগুলোতে সস্তা দামের কতকগুলো উপন্যাস আর জানলার সেই ফ্যাকাশে লাল পর্দা। কী বিশ্রী দেখতে! এত অসোয়াস্তিকর মনে হোত! ডরোথি নিশ্চয়ই এ সব কল্পনাও করতে পারে না।

একটা মোটরের আওয়াজ কানে এলো এবং চার্লি ঘরে ঢুকলো।

—আমার দেরি হয়নি তো? তোমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি বোধ হয়? গভর্নরের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলুম, একটু দেরি হয়ে গেল।

কিটীর কাছে গিয়ে ওর দুটি হাত নিজের হাতে তুলে নিলো চার্লি।

—খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন। ডরোথি নিশ্চয়ই বলেছে যতদিন ইচ্ছে আপনি থাকুন এখানে। নিজের বাড়ি বলে মনে করলেই খুশি হবো। নিজের তরফ থেকে বিশেষ করে বলছি, আপনার জন্য কিছু একটু করতে পারলেও খুব আনন্দিত হবো আমি।

চোখে তার ঐকান্তিকতার দীপ্তি। কিন্তু কিটীর চোখের বিদ্রূপটুকু চার্লি বুঝতে পেরেছে কিনা কে জানে।

—সব কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। অযথা চেষ্টা করে বোকা বনেও লাভ নেই। তবে এইটুকু বলছি, আপনার স্বামীর মৃত্যুতে আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছি। বড়ো অদ্ভুত ভালো মানুষ ছিলেন ওয়ালটার ফেন, আর তাঁর অভাব সবাই এখানে বোধ করবে। এ আমি জোর করেই বলছি।

—থাক চার্লি, কিটী নিশ্চয়ই সব বুঝেছে······এখন এসো, ককটেল তৈরি। ডরোথি বললো।

বিদেশী আভিজাত্যের রীতি অনুসারে দুটি কেতা-দুরস্ত বেয়ারা ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো ককটেল নিয়ে। অসম্মতি জানালো কিটী।

—সে কী, আপনি নিন। নিজের স্বাভাবিক সৌজন্যের সংগে ঐকান্তিক অনুরোধ জানলো টাউনসেণ্ড।—আপনার ভালো লাগবে, হংকং ছাড়বার পর এমন জিনিস নিশ্চয়ই আপনি পাননি। মী-তান-ফুতে বরফ পেতেন না বোধ হয়।

—না। কিটী বললো।

ক্ষণিকের জন্য তার মানস নয়নে ভেসে উঠলো সেই মৃত ভিখারীটার মূর্তি—ছেঁড়া কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আছে শুকনো জির জিরে হাত পা, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, কম্পাউণ্ডের দেয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া।

লাঞ্চের টেবিলে চার্লিই কথা সুরু করলো। দু-একটা সমবেদনার কথা জানিয়ে চার্লি হালকা প্রসংগের অবতারণা করলো। এত বড়ো একটা বিপদের ঝড় বয়ে গেছে কিটীর ওপর দিয়ে সে ভাবের কোনো আভাস দিলো না তার কথায়; বরং এপেনডিসাইটিস অপারেশনের পর কিটী যেন এসেছে সাংহাই থেকে হাওয়া বদলাতে। এখন তার উৎফুল্ল থাকা দরকার এবং চার্লি সাহায্য করতে প্রস্তুত এমনি ভাব তার প্রতিটি কথায়। কিটীকে স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করতে দেওয়ার সেরা উপায় হোল তাকে পরিবারভুক্ত বলে মেনে নেওয়া। চতুর লোক চার্লি। রেস আর পলোর গল্প নিয়ে সে সুরু করলো। বললো যে হারে তার ওজন বাড়ছে পলো খেলা তাকে

ছাড়তেই হবে হয়তো শেষ পর্যন্ত। তারপর আজই সকালে গভর্নরের সংগে অনেক কথা হয়েছে তার। এডমিরালের ফ্ল্যাগ-সিপে একটা বিরাট পার্টির গল্পও করলো চার্লি। তারপর ক্যানটনের অবস্থা, লুসনের কথা, এমনি কত কী! কিছুক্ষণের ভেতরই কিটীর মনে হোল, খুব বেশি দিনের জন্য বাইরে যায়নি সে! কিন্তু কী অদ্ভুত, এখান থেকে মাত্র দু-শত মাইল দূরে (লণ্ডন থেকে এডিনবড়ার দূরত্বটুকু মাত্র) নারী পুরুষ আর শিশুগুলো মরছে মশা মাছির মতো! অল্পসময়ের ভেতরই কিটীও এ আলোচনায় যোগ দিলো। কার কলার-বোন ভেঙেছে পলো খেলায়, মিসেস অমুক দেশে চলে গিয়েছেন কিনা, মিসেস তমুক এখনো টেনিস খেলছে তো—এমনি আরো কত কী! একটু হাস্য-পরিহাসও করে চার্লি, তাতেও যোগ দিলো কিটী মুচকি হেসে। ডরোথির উন্নাসিকতা (এখন আর কিটীর বিরক্তির কারণ হয় না—বরং বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে) কলোনির সাধারণ লোকদের আলোচনায় ব্যঙ্গ প্রকাশ করলো। ক্রমেই সজীব হয়ে উঠলো কিটী।

—এই দেখ না এরই মধ্যে কত বদলে গেছেন মিসেস ফেন! টিফিনের আগেও এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল যে আমি চমকে গিয়েছিলুম একেবারে। এতক্ষণে একটু রঙ ফিরে এসেছে ওঁর গালে। চার্লি তার স্ত্রীকে বললো।

কিন্তু এই হাস্য-উজ্জ্বল কথাবার্তায় প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ যোগদানের (কারণ ডরোথি বা চার্লি কেহই সুক্ষ্ম শিষ্টাচার নিয়ে এটা বরদাস্ত করতে পারতো না) ভেতরও কিটীর লক্ষ্য ছিল গৃহ-কর্তার ওপর। গত কয় সপ্তাহে চার্লির ওপর নিদারুন প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠলেও চার্লির একটা স্পষ্ট মূর্তি ধরা ছিল তার মনের মুকুরে। চার্লির মাথায় ঘন লম্বা কোঁকড়ানো চুল, বেশ সুবিন্যস্ত পরিপাটি; কেশ পক্কতার আভাস গোপন প্রয়াসে অতিরিক্ত তৈল মাখে মাথায়; মুখ অত্যধিক রক্তিমাভ, রক্তবাহী ধমনির রক্তিম আত্ম-

প্রকাশ সারা কপোলে, চোয়ালের কাঠিন্য প্রস্ফুট ; চিবুক সুস্পষ্ট. শুধু চোখের ওপর বাঁদরের মতো ঘন থোকা-থোকা ভুরু দুটিই খারাপ লাগে কিটীর। চলনে কেমন দৃপ্ত-ভঙ্গিমা ; খাদ্য সম্বন্ধে সাবধানতা আর পরিমিত ব্যায়াম কিছুই রোধ করতে পারেনি ওর দেহের মেদবৃদ্ধি ; দেহে হাড়ের কোন চিহ্নও পড়ে না চোখে, তবে প্রতিটা গাঁটে মধ্যবয়সের রুক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। পোশাক একটু আঁটসাঁট, একটু বেশি রকম যুবোজনোচিত।

কিন্তু লাঞ্চের অব্যবহিত পূর্বে যখন চার্লি ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করলো, আশ্চর্য হয়ে গেল কিটী, (হয়তো এইজন্যই তাকে বেশি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল) তার কল্পনা যেন তাকে ছলনা করলো। কই তার কল্পনার সংগে তো মেলেনি চার্লির মূর্তি ! মনে মনে না হেসে থাকতে পারলো না কিটী। চার্লির চুল পাকেনি তো আদৌ ; কপালের ওপর দু একটা দেখা যায় বটে, তবে সবে সুরু হয়েছে মাত্র ; তার মুখ তো রক্তিম নয়, রোদে-পোড়া তামাটে ! ঘাড়ের ওপর মাথাটা সুবিন্যস্ত : খুব বলিষ্ঠ তো নয়, বার্ধক্যের ছায়াই বা কোথায় ; বেশ তো দোহারা শরীর, পরিপাটি গঠন ! আর এর জন্য যদি একটু গরিমাই থেকে থাকে ওর, কী ই-বা ক্ষতি তাতে ? ওকে যুবক বলতেই-বা দোষ কী ? আর পোশাক কী করে পরতে হয় তা সে জানে ; পরিষ্কার পরিপাটি ছিমছাম দেখতে, অস্বীকার করার তো উপায় নেই ! এমনি কত কী ভাবনা পেয়ে বসেছিল কিটীকে। সত্যিকার সুপুরুষ চার্লি। ভাগ্যিস সে যে কত বড়ো অপদার্থ তা টের পেয়েছে কিটী। চার্লির কণ্ঠে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ। কিছুই তো বদলায়নি এ ক দিনে। এই কণ্ঠস্বরই তার প্রতিটা কথার অসত্যতার সাক্ষর বয়ে উষ্মা জাগিয়ে তুলে মনে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের প্রাখর্য এবং উত্তাপ এখন কেমন মিথ্যার সাক্ষর নিয়ে কানে বাজে ভেবে কিটী অবাক হয়ে যায়। কী করেই বা একদিন এই কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছিল সে ! চোখ দুটোও চার্লির

অদ্ভুত সুন্দর। চার্লির সকল মাধুর্য বাসা বেঁধেছে ওর ঐ চোখ দুটিতে—এমনি কোমল নীলাভ জ্যোতির স্ফুরণ ও-দুটিতে। আজেবাজে কথায়ও তার চোখের দীপ্তি এত সুন্দর হয়ে ওঠে, মুগ্ধ না হয়ে যে উপায় নেই!

বেয়ারা কফি নিয়ে এলো; চুরুট ধরালো চার্লি। তারপর ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালো।

—হ্যাঁ, এইবার কিন্তু তোমাদের একলা ফেলে উঠবো। অফিসে ফেরবার সময় হয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে প্রীতিপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতে তাকালো কিটীর দিকে, বললো:

—দু একদিন বিশ্রাম না নেওয়া পর্যন্ত আমি আর বিরক্ত করবো না আপনাকে। তবে আপনার সংগে গুটিকতক কাজের কথা আছে কিন্তু।

—আমার সংগে?

—আপনার বাড়িটার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে, তারপর ফারনিচারগুলোও রয়েছে।

—ও, কিন্তু এ কাজের জন্য তো উকিলই আছে। এ সব ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

—উকিলের পেছনে অযথা পয়সা খরচ করতে দেবো ভেবেছেন নাকি? যা করবার সব আমিই করবো; কিছুই ভাবতে হবে না আপনাকে। তারপর জানেন না বোধ হয়, আপনি একটা পেনশানও পাবেন; আমি এ সম্বন্ধে গভর্নরের সংগেও কথা বলবো। আর এ ছাড়া আরও কিছু পাওয়া সম্ভব কিনা চেষ্টা করে দেখবো। আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। কিন্তু এক্ষুণি এ সব নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আপনি ধীরে-ধীরে একটু সুস্থ হয়ে উঠুন এই আমরা চাই, কী বলো ডরোথি?

—নিশ্চয়ই।

একটু মাথা নুয়ে অভিবাদন জানিয়ে স্ত্রীর চেয়ারটার পাশ দিয়ে এসে কিটীর হাতটা তুলে নিয়ে চার্লি চুম্বন করলো। মেয়েদের হস্তচুম্বন করতে গিয়ে অধিকাংশ ইংরাজদের কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়; চার্লি কিন্তু সহজ সুন্দর ভাবেই কাজটা সারলো।

টাউনসেণ্ডের বাড়িতে স্থির হয়ে না বসা পর্যন্ত কিটী বুঝতে পারেনি কতটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তার মন। এ বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য আর অনভ্যস্ত সুযোগ সুবিধাই বুঝি তার এতদিনকার জীবনের সবটুকু ক্লান্তি মুছে দিলো মন থেকে। সে তো ভুলেই গিয়েছিল আরাম সম্ভোগের সুখ, সে তো ভুলেই গিয়েছিল মধুর পরিবেশের কী অপূর্ব দোলা, পরিচর্যার কী অনুভূতি। একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস নিয়ে যেন প্রাচ্যের এই বিলাসিতার উচ্ছ্বাসে ডুবে যায় কিটী আবার। সে যে সমবেদনার পাত্র এই অনুভূতিটাও বুঝি খুবই অপ্রীতিকর মনে হয় না তার। এই সদ্য-শোকের ভেতর কোন রকম আদর আপ্যায়ণ সম্ভব নয় বলেই কলোনির বিশিষ্টা মহিলারা (হিজ-একসেলেনসির পত্নী, এডমিরাল এবং চীফ জাস্টিস-এর পত্নীরাও) শুধু একটু চা খেতে এসেছেন তার কাছে। হিজ-একসেলেনসির স্ত্রী বলেছেন তাঁর স্বামী কিটীর সংগে সাক্ষাৎ করতে খুবই ব্যগ্র, তাই কিটী যদি রাজ-ভবনে একদিন একটু সাধারণ লাঞ্চে আসে (পার্টি ঠিক নয়, এই ধরুণ শুধু আমরা থাকবো, আর কজন এডিকং) খুবই খুশি হবেন তাঁরা। এদের কাছে কিটী বুঝি একটি পোর্সিলেনের পাত্র —যেমনি দামি তেমনি ঠুনকো। এঁরা সবাই তাকে মনে করেছে একজন বীর রমণী এও তার লক্ষ্য এড়ায়নি। তার রসবোধ আছে বলেই শিষ্টতার সংগে নিখুঁত অভিনয় করে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ওয়াডিংটন যদি এখানে থাকতো তাহলে তার বিদ্রুপাত্মক সুক্ষ্মবুদ্ধি নিয়ে বেশ উপভোগ করতো এখানকার

পরিস্থিতির মজাটুকু। তারা দুজন হাসতে পারতো প্রাণখুলে। ডরোথির কাছে চিঠি দিয়েছিল ওয়াডিংটন। কনভেন্টের কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেক কথাই সে জানিয়েছিল তাকে; কিটীর মনের দুর্জয় সাহস আর আত্মবিশ্বাসের কথাও বাদ দেয়নি সে চিঠিতে। বেশ একহাত নিয়েছে দুষ্টুটা!

একটা মুহূর্তের জন্যও চার্লির সংগে একা থাকবার সুযোগ ঘটেনি কিটীর; কিন্তু এটা ঘটনাচক্র, না পূর্ব পরিকল্পিত ঠিক বুঝতে পারেনি সে। অদ্ভুত বুদ্ধি এই চার্লির। সংবেদনশীল, অমায়িক, দয়াশীল। শুধু সাধারণ পরিচয়ের বাইরে তাদের ভেতর আরো কোন সম্পর্ক ছিল কখনো কেউ বুঝতেও পারেনি। কিন্তু একদিন বিকেলে শোবার ঘরের বারান্দায় সোফায় গা এলিয়ে একটা বই পড়ছিল কিটী। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে একটু দাঁড়ালো চার্লি।

—কী পড়ছো? জিজ্ঞাসা করে সে।

—বই।

উপহাস দৃষ্টিতে তাকায় কিটী। মুচকি হাসে চার্লি।

—রাজভবনে গার্ডেন পার্টিতে গিয়েছে ডরোথি।

—জানি। তুমিও যাওনি যে?

—ভালো লাগেনি। ভাবলুম ফিরে এসে তোমায় একটু সাহচর্য দিই। বাইরে গাড়ি আছে, দ্বীপের চারদিকে চল না একটু ঘুরে আসি?

—না থাক, ধন্যবাদ।

যে শোফায় কিটী শুয়েছিল তারই নিচে বসে পড়ে চার্লি।

—তোমার এখানে আসার পর নিরিবিলি দুটো কথা বলার সুযোগ পাইনি এ পর্যন্ত।

একটা শীতল ঔদ্ধত্য নিয়েই যেন কিটী সোজা তাকালো চার্লির চোখের দিকে।

—নিরিবিলি বলার মতো কোন কথা আছে কী আমাদের?

—আছে, অনেক।

পা-টা সরিয়ে নেয় কিটী, যাতে স্পর্শ না লাগে চার্লির গায়।

—এখনো তোমার রাগ আছে আমার ওপর? জিজ্ঞাসা করে চার্লি। ঠোঁটের কোণে হাসির একটু ছায়া, চোখের দৃষ্টি তরল।

—একটুও না। হেসে ওঠে কিটী।

—আমার মনে হয় রাগ না থাকলে এমনি তুমি হাসতে না।

—তুমি ভুল করছো। তোমার প্রতি এত বেশি অবজ্ঞা যে রাগ করবার প্রশ্ন আসে না।

চার্লি অসংক্ষুব্ধ রইলো।

—তুমি অকারণ কঠিন হচ্ছ আমার ওপর। পেছনের দিকে ধীরভাবে তাকিয়ে দেখো আমি যা করেছিলুম ঠিকই করে-ছিলুম।

—তোমার মতে অবশ্য……

—ডরোথির সংগে তোমার পরিচয় হয়েছে ; নিশ্চয়ই স্বীকার করবে সে কত ভালো মেয়ে।

—নিশ্চয়ই। তার সদয় ব্যবহারের জন্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।

—ও হাজারে একজন। আমাদের ছাড়াছাড়ি হলে এক দণ্ডের জন্যও আমি শান্তি পেতুম না। ওর সংগেও একটা বিশ্রী ছলনা করতে হোত। তাছাড়া, ছেলেদের কথাও ভাববার ছিল ; ওরাও যে অসুবিধায় পড়তো!

চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিটী। অনুভব করে সমস্ত পরিবেশ তার আয়ত্বের ভেতর।

—গত একটা সপ্তাহ খুবই গভীরভাবে লক্ষ্য করছি তোমাকে।

বুঝতে পারছি ডরোথিকে সত্যিই তুমি খুব পছন্দ কর। কিন্তু কখনো ভাবতে পারিনি তোমাকে দিয়েও এতটা সম্ভব।

—এই কথা তো আমি তোমাকে বলেছি। ওর একটুও অশান্তি হয় এমন কিছুই আমি করতে পারবো না কখনো। স্ত্রী হিসাবে সে সত্যি অদ্বিতীয়।

—কিন্তু তার প্রতি কোন আনুগত্য ছিল কি তোমার?

—ঘটে যা চোখের অগোচর, সে ব্যথা দহে না অন্তর। বলে মুখ টিপে হাসে চার্লি।

—তুমি অতি জঘন্য। শ্রাগ করে বলে কিটী।

—না, আমি মানুষ। জানিনা তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলুম বলে কেন তুমি আমায় এতটা নীচ মনে করছো। তুমি তো জানো, এতটা গড়াবে আমি চাইনি।

চার্লির এই কথা কয়টি বুকের তন্ত্রীগুলোতে কেমন যেন একটা তীব্র মোচড় দিলো।

—হ্যাঁ, তোমার খুব সহজ শিকার ছিলুম আমি। একটু তিক্ততার বিষ মিশিয়ে বলে কিটী।

—এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমরা জড়িয়ে পড়বো, আগে ভাবতে পারিনি।

—আর এইটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধিও তোমার ছিল যে, বিপদ যদি আসেও তোমাকে ছোঁবে না।

—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। যাহোক, সে সব তো চুকে-বুকে গেছে এখন; অন্তত তোমার বোঝা উচিত আমি যা করেছিলুম উভয়ের মংগলের জন্যই করেছিলুম। তুমি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, কিন্তু ভাগ্যকে ধন্যবাদ আমি হারাইনি। তুমি কি মনে কর তোমার নির্দিষ্ট পথে এগোলে সার্থক হোত সে প্রচেষ্টা? ভাজা কড়ায় পড়েই অস্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত ছিল না আমাদের, কিন্তু এর চেয়ে প্রীতিকর হোত কি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে? আর তোমার ক্ষতিও

হয়নি কিছু তাতে। এসো না কেন আবার বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনি আমরা।

প্রায় হেসে ফেলে কিটী।

—করুণার এক কণিকাও অন্তরে স্থান না দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তুমিই আমাকে ঠেলে দিয়েছিলে, এই কথাটা ভুলে যাই আমি এই প্রত্যাশাই করো নাকি ?

—কী যা-তা বলছো, কিটী ? আমি তো বলেইছিলুম সাবধানে থাকলে কোন ভয় নেই সেখানে। যদি নিশ্চিত না জানতুম তবে কি একটা মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ওখানে যেতে দিতুম ?

—তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে, কেননা এ তোমার প্রয়োজন ছিল। তুমি ঐ সব ভীরুদেরই একজন, যারা নিজেদের লাভটুকু ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

—দেখ, পুডিং-এর স্বাদ খেলে পর। তুমি ফিরে এসেছো, আর ঐ অপ্রিয় কথাটা বললে যদি কিছু মনে না কর তবে বলবো, তুমি ফিরে এসেছো কিন্তু আরো সুন্দর হয়ে।

—আর ওয়ালটার……… ?

সরস জবাবটা কিছুতেই সংবরণ করতে পারলো না চার্লি। হেসে বললো :

—কালো পোশাকে তোমায় চমৎকার মানিয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক নজর তাকালো কিটী চার্লির দিকে। অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটি। কান্নার বেগ আর রোধ করতে পারলো না কিটী। তার সুন্দর মুখটা গভীর শোকের ছায়ায় বিকৃত হয়ে উঠলো সংগে সংগে। লুকোবার চেষ্টা আর করে না সে, দুই হাত এলিয়ে পড়ে দেহের দুই পাশে।

—দোহাই তোমার, অমন করে কেঁদো না। তোমাকে আঘাত দেবার জন্য ও-কথা আমি বলিনি। আমি পরিহাস করছিলুম। তুমি জানো তোমার এই শোকে আমিও কতটুকু মুহ্যমান।

—থাক, থাক, রাখো তোমার ঐ সব বকুনি।

—ওয়ালটারকে ফিরে পেতে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত।

—তার মৃত্যুর জন্য দায়ী তুমি আর আমি।

কিটীর হাতটা তুলে নেয় চার্লি, কিন্তু ছাড়িয়ে নেয় কিটী।

—দয়া করে যাও এখন। (ফুঁপিয়ে ওঠে কিটী) এইটুকু উপকার কর। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার চেয়ে অনেক উঁচুতে ওয়ালটারের স্থান; আর আমি এমনি বোকা সেইটুকু বুঝতে পারিনি। যাও, যাও এক্ষুনি।

চার্লি কথা বলতে উদ্যত বুঝেই লাফিয়ে উঠলো কিটী। তারপর নিজের ঘরের ভেতর চলে গেল। পেছনে পেছনে চার্লিও গেল। ঘরে ঢুকে কেমন একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই চার্লি খড়খড়িটা টেনে দিলো; তাদের চারদিকে অন্ধকার ঘিরে এলো।

—এ ভাবে তোমায় ছেড়ে যেতে পারি না, কিটী। কিটীকে বাহুবন্ধনে টেনে নিয়ে বললো—বিশ্বাস করো, তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি আমি।

—ছুঁয়ো না আমায়। দোহাই তোমার, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সবলে চার্লির আলিংগন মুক্ত হতে চেষ্টা করলো কিটী, কিন্তু চার্লি ছাড়লো না তাকে। উচ্ছল কান্নায় ফেটে পড়লো কিটী।

—ডারলিং, জানো না—আমি তোমায় কত ভালোবাসতুম, এখন আরো বেশি ভালোবাসি। চার্লি তার সেই মনভোলানো কণ্ঠস্বরে বললো।

—এত বড়ো মিথ্যা কথা তুমি বলছো কী করে? ছেড়ে দাও আমায়। তুমি জাহান্নমে যাও, ছেড়ে দাও বলছি।

—কিটী, লক্ষীটি, নিষ্ঠুর হয়ো না। জানি তোমার সংগে পশুর মতো ব্যবহার করেছি, তবু আমায় ক্ষমা কর।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার বেগে থর থর কাঁপছিল কিটী। আলিংগন

থেকে নিজেকে মুক্ত করবার দুর্বার চেষ্টায় উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল ; কিন্তু বাহুবন্ধনের এই নিবিড় পেষণ তার সারাটা দেহ ঘিরে কেমন যেন একটা আরামের ক্ষীণ রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলছিল। এতকাল এই বন্ধনের স্পর্শটুকুর জন্যই বুঝি ব্যাকুলিত হয়েছিল তার মন। সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগলো। ভীষণ দুর্বলতা যেন অবশ করে দিলো কিটিকে। তার দেহের সবগুলো অস্থি বুঝি দ্রবীভূত হয়ে গেল,আর ওয়ালটারের প্রতি দুঃখবোধ যেন নিজেরই প্রতি রূপান্তরিত হয়ে এলো।

—উঃ, কী করে এমনি নির্দয় হতে পাড়লে তুমি ? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে কিটী।

—তুমি কি জানো না অন্তর থেকে কতটুকু ভালো আমি বাসতুম তোমায় ? যত ভালো আমি বেসেছি, তেমনি কি কেউ বেসেছে তোমায় কখনো ?

—ডারলিং……চুমু খায় চার্লি বার বার।

—না, না……আর্তনাদ করে ওঠে কিটী।

কিটীর মুখ খুঁজে বেড়ায় চার্লি, কিন্তু কিটী ফিরিয়ে নেয় তার মুখ। কিটীর অধর স্পর্শ খুঁজে চার্লি। লালসার তীব্র জ্বালায় টুকরো টুকরো কী কথা বলে চার্লি তাকে বুঝতে পারে না কিটী। তার বাহুবন্ধন আরো নিবিড় হয়ে আসে ধীরে ধীরে, মনে হয় কিটীর, হারানো-শিশু ফিরেছে তার নিরাপদ আশ্রয়ে। ক্ষীণ গোঙানি বেরিয়ে আসে কিটীর কণ্ঠ থেকে। চোখ মুদ্রিত, অশ্রু ধারার প্লাবন সারা মুখ জুড়ে। খুঁজে পায় চার্লি অবশেষে তার বাঞ্ছিত সেই অধর-সৈকত। যখনি নেমে আসে তার কামনার প্রবল বন্যা ঐ দুই অধর-সংগমে অপার্থিব জ্যোতিঃশিখার উত্তাপের শিহরণ খেলে যায় কিটীর দেহের প্রতি স্নায়ুকোষে, রক্তবাহী প্রতিটি অববাহিকায়। এ যেন তীব্র পুলকের একটা অনুভূতি, তারই উত্তাপে ছাই হয়ে যায় তার সবটুকু সত্তা,শুধু বুঝি পড়ে থাকে

দেহবিবর্তনে একটা জ্যোতির আভা। স্বপ্নে, শুধু স্বপ্নেই-তো সে অনুভব করেছে পুলকের এই উদ্দাম অনুভূতি! কী করছে তাকে নিয়ে চার্লি এখন? কিছুই জানে না কিটী! সে তো আর শুধুমাত্র মানবী নয়, যেন দ্রবীভূত হয়ে গেছে তার সর্বসত্তা; কিছুই নেই আর—সে শুধুমাত্র একটা কামনা! চার্লি তার দেহটা তুলে নিলো ওর বাহুতে; কী হালকা মনে হয় নিজেকে! প্রাণপণে জড়িয়ে থাকে সে, বিমুগ্ধ হৃতধী। তারপর বালিশে আশ্রয় নেয় তার মাথাটা, আব চার্লির ওষ্ঠেব নিবিড় নিষ্পেষণ তার অধরে।

দুই হাতে মুখ লুকিয়ে খাটের ধারে বসে রইলো কিটী।

—একটু জল খাবে?

মাথা নাড়লো কিটী। বেসিনের কাছে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনলো চার্লি।

—এসো, একটু জল খেলেই সুস্থ বোধ করবে।

গ্লাসটা তুলে ধরলো মুখের কাছে, এক চুমুকে জলটা খেয়ে ফেললো কিটী। ভয়কাতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কাছেই দাঁড়িয়ে চার্লি, দৃষ্টি অবনত, কিন্তু পূর্ণ-পরিতৃপ্তিব ঝলক সেই চোখে।

--সত্যিই কি আমি এতটা খারাপ যা তুমি ভাবছিলে? জিজ্ঞাসা করে চার্লি।

কিটীর দৃষ্টি অবনত।

--হ্যাঁ; কিন্তু এটাও সত্যি, আমিও তোমার চেয়ে কোন অংশে ভালো নই। ছিঃ, কী নির্লজ্জ আমি!

—তুমি বড়ো অকৃতজ্ঞ, কিটী।

—এবার তুমি যাবে কিনা বলো?

—হ্যাঁ, এইবার যেতে হবে আমায়। ডরোথি ফিরে আসবার আগেই সব গুছিয়ে নিইগে, যাই।

দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

খাটের ধারে তেমনি বসে থাকে কিটী, অথর্বের মতো নিশ্চল। মনটা একেবারে ফাঁকা। কেমন একটা শিরশিরানি অনুভব করলো শিরায় শিরায়। অতি কষ্টে উঠে ধীরে ধীরে গিয়ে বসে পড়লো ড্রেসিং-টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে। আরসিতে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকালো একবার; চোখে ভ্রূকুটি, অশ্রুর উচ্ছ্বাসে চোখ ভার; মুখটা কলংক মলিন, গালের এক পার্শ্বে একটু রক্তিম ছোপ, চার্লির পাশবিক উচ্ছ্বাসের একটু চিহ্ন। আতংকে শিউরে উঠলো কিটী নিজের দিকে তাকিয়ে। পদস্খলনের গভীর চিহ্ন দেখতে পাবে মুখে এই আশাই তো করেছিল।

নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে উষ্মায় ফেটে পড়ে কিটী।

—হতভাগা! শুয়োর……

হাতের তেলোতে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ফেটে পড়লো কিটী।

ধিক! ধিক! কিসে পেয়ে বসেছিল তাকে! কী জঘন্য! চার্লি ও নিজের প্রতি তার ঘৃণা জাগলো। এই তো মোহাচ্ছন্নতা! উঃ, কী জঘন্য তার প্রবৃত্তি! ওর মুখের দিকে তো আর তাকাতে পারবে না কিটী! ঠিক বলেছিল চার্লি। তাকে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে ঠিক করেছিল সে! একটা অপদার্থ, বেশ্যার চেয়েও কম সে কিসে? উঃ, ভাবতে পারে না কিটী! সে যে বেশ্যার চেয়েও অধম—এই হতভাগ্য মেয়েগুলো দেহ বিক্রয় করে শুধু তো রুটির জন্য! আর সে বিকিয়েছে নিজেকে এই বাড়িতেই যেখানে তার চরম দুঃখে অসহায় অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছে তাকে ডরোথি! কান্নার উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে কিটী। সব শেষ হয়ে গিয়েছে তার। ভেবেছিল পরিবর্তন এসেছে, ভেবেছিল শক্তি ফিরে এসেছে তার মনে; ভেবেছিল হংকং-এ ফিরেছে আত্মবিশ্বাস নিয়ে। রোদের

আলোতে হলদে প্রজাপতির ঝিকিমিকির মতোই কত না নতুন নতুন আইডিয়া খেলছিল তার মাথায়; ভবিষ্যতের কত রঙিন স্বপ্নই না জেগেছিল মনে, আলোর দূতেরই মতো মুক্তি তাকে ডেকেছিল হাতছানি দিয়ে—পরিসর প্রান্তরের মতোই মনে হয়েছিল সারাটা পৃথিবী, যার বুকের উপর দিয়ে ছুটে যাবে সে চঞ্চল চরণে মাথা উঁচু করে। ভেবেছিল মুক্তি পেয়েছে সে কামনা আর লালসার ক্লেদাক্ত বন্ধন থেকে, মুক্ত-জীবনের স্বাদ বুঝি সে পেয়েছে এত দিনে! গোধূলির আবছা আলোয় ধানক্ষেতের ওপর ইতস্তত উড়ন্ত ঐ পতংগগুলোর মতোই মুক্ত মনে হয়েছিল নিজেকে। আর এখন হয়েছে সে ঐ লালসা আর প্রবৃত্তিরই দাস! বড়ো দুর্বল মনে হোল নিজেকে। সব নিঃশেষ হয়ে গেছে তার, কোন আশাই নেই আর, বৃথা চেষ্টা।

ডিনারে গেল না কিটী। ডরোথির কাছে খবর পাঠালো ভীষণ মাথা ধরেছে, ঘর থেকে আর বেরুবে না আজ। ডরোথি এসে কিটীর চোখ লাল আর মুখ ভার দেখে এটা-ওটা দু একটি কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিলো। ওয়ালটারের কথা ভেবে সে কাঁদছিল এই কথা মনে করেছিল ডরোথি—বুঝতে কষ্ট হয় না কিটীর। আদর্শ স্ত্রী হিসেবে সান্ত্বনা দিয়েছে কিটীকে, সমবেদনা জানিয়েছে তার অনিবার্য দুঃখে। যাবার আগে বলে গেল:

—খুবই দুঃখ পাচ্ছ, বুঝতে পারছি, কিন্তু সাহসে বুক বাঁধো। তোমার স্বামীর শোকে দুঃখ পাও তাঁর এ ইচ্ছা ছিল না নিশ্চয়ই।

পরদিন খুব ভোরেই পাহাড়ে উৎরাই পথে ট্রামে বেবিয়ে পড়লো কিটী, ডরোথিকে লিখে রেখে গেল বাইরে যাচ্ছে জরুরি কাজে। রাস্তায় মোটর, রিকশা, চেয়ার, ইউরোপীয় আর চীনাদের

অগণিত ভিড় কাটিয়ে পি-এণ্ড-ও কোম্পানির অফিসে গিয়ে হাজির হোল। দুদিনের ভেতরই একটা জাহাজ ছাড়ছে এই বন্দর থেকে, কিটী আসবার পর এই প্রথম জাহাজ। যে করেই হোক এই জাহাজেই যাবে কিটী। কোন বার্থ নেই জানতে পেরে সে দেখা করলো চীফ-এজেণ্টের সংগে। স্লিপ পাঠাবার সংগে সংগেই এজেন্ট নিজে এসে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল কিটীকে। কিটীর দুর্ভাগ্যের কথা তার শোনা ছিল, তাই কিটীর ইচ্ছা জানতে পেরেই আরোহীদের তালিকা চেয়ে পাঠালো। তারপর বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল তালিকার ওপর।

—দয়া কবে, যে করেই হোক, একটা ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরোধ জানালো কিটী।

—দেখুন, মিসেস ফেন, আপনার জন্য যথাসাধ্য করবে না এমন কেউ এই কলোনিতে আছে বলে তো আমার জানা নেই।

তারপর কেরানির কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে বললো :

—কাউকে অন্য তারিখে সিফট করে দিচ্ছি। আপনি দেশে ফিরছেন,কাজেই আমার সাধ্যমতো যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়ই করবো। একটা ছোট্ট কেবিনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোন অসুবিধা হবে না নিশ্চয়।

ধন্যবাদ জানিয়ে প্রফুল্লচিত্তে বেরিয়ে এলো কিটী। যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। প্রত্যাবর্তন সংবাদ জানিয়ে তার করলো বাবাকে। ওয়ালটারের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিল আগেই। তাবপর টাউনসেণ্ডের বাড়ি ফিরে এসে ডরোথিকে সে সংবাদ দিলো।

—তোমার অনুপস্থিতি আমার ভয়ানক বাজবে। তবে বুঝতে পারছি মা বাবার কাছে ফিরে যেতে তোমার মন একান্তই চাইছে। সহৃদয়া ডরোথি বললো।

হংকং-এ ফিরে নিজের বাড়িতে ঢুকতে বার-বারই ইতস্তত করছিল

কিটী। ভয় ছিল ঐ বাড়িটার ভেতর ঢুকলেই আবার পুরানো সব স্মৃতির সংগে মুখোমুখি হতে হবে তাকে! কিন্তু এখন আর কোন গত্যন্তর নেই। আসবাবপত্রগুলোর বিক্রির ব্যবস্থা টাউনসেণ্ড করেছে। বাড়িটা লিজ দিয়ে দেওয়ারও বন্দোবস্ত হয়েছে; কিন্তু তার নিজের আর ওয়ালটারের পোশাক-পরিচ্ছদ সবই তো রয়ে গেছে। মী-তান-ফু যাবার সময় কিছুই সংগে নেয়নি তারা। তাছাড়া বই, ছবি আরও টুকিটাকি অনেক কিছু রয়েছে। এ সবের প্রতি কোন আসক্তি নেই কিটীর। অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে চায় মন থেকে। কিন্তু আর সব কিছুর সংগে এ গুলোও যদি নিলাম ঘরে গিয়ে ওঠে, কলোনির সবারই আত্মসম্মানে হয়তো আঘাত পড়বে। ওগুলো প্যাক করে দেশে পাঠাবারই ব্যবস্থা করবে সে। টিফিনের পর নিজের বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল কিটী। তাকে সাহায্য করবে বলে ডরোথিও সংগে যেতে চাইলো। কিটী আপত্তি জানিয়ে বললো একাই পারবে সে; অবশেষে ডরোথির ছুটো বেয়ারার সাহায্য নিতে রাজি হোল।

বেয়ারার তত্ত্বাবধানে ছিল তাদের বাড়িটা। সে দরজা খুলে দিলো কিটীকে। নিজের বাড়িতে অপরিচিত আগন্তুকের মতোই প্রবেশ করলো কিটী। বাড়িটা তখনো তেমনি তকতকে ঝকঝকে। সব কিছু তেমনি আছে যথাস্থানে, তারই ব্যবহারের অপেক্ষায়।

রৌদ্র-উজ্জ্বল দিনের উত্তাপের ভেতরও কেমন একটা শৈত্যভাব অনুভব করে কিটী নিস্তব্ধ ঘরের ভেতরটায়। আসবাবপত্রগুলো আছে তেমনি স্ব-স্ব স্থানে; ফুলদানিগুলোও তেমনি আছে, শুধু ফুল নেই সেগুলোতে। একটা বই কখন খুলে উবুড় করে রেখেছিল কিটী মনে নেই, ঠিক তেমনি পড়ে আছে সেটা। যেন একমিনিট আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সে অথচ সেই একটা মিনিটই বিলীন হয়ে গেছে অনন্তকালের বুকে—হাসি আর কথার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হবে না আর কোনদিন। পিয়ানোটায় যেন একটা সুরের

রেশ লেগে আছে তখনো ; শুধু একটু স্পর্শের অপেক্ষা, অথচ মনে হয় চাবি টিপলেও বুঝি কোন সুর ধ্বনিত হবে না। ওয়ালটারের ঘরও তেমনি আগের মতো সাজানো গোছানো। দেরাজের ওপর কিটীর দুটো বড় বড় ফটো, একটি সুসজ্জিত পোশাকে, অন্যটি বিয়ের পরিচ্ছদে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করে কিটী। এক-একটা করে সব বাক্স পেটরা গুছোয় বেয়ারাগুলো। আর দুটো দিন মাত্র সময়, এর মধ্যেই সব গুছিয়ে নিতে পারবে কিটী। আর ভাবনাব কিছু নেই, সময়ও নেই। হঠাৎ পেছনে কার পায়ের শব্দ—ফিরে দেখে চার্লস টাউনসেণ্ড। বুকের ভেতরটা কেমন হিমেল হয়ে এলো তার।

—কী চাই তোমার ? কিটী জিজ্ঞাসা করলো।

—একটু বসবার ঘরে আসবে ? দুটো কথা আছে তোমার সংগে।

—আমি ভীষণ ব্যস্ত।

—মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নেবো তোমার।

আর কিছু না-বলে বেয়াবাদের নির্দেশ দিয়ে পাশের ঘরে গেল চালির সংগে। অত্যন্ত বাস্ত এইটুকু বোঝাবার জন্য দাঁড়িয়েই রইলো। বিবর্ণ মুখে দুরু-দুরু বুকে ধীর শান্তভাবেই চার্লির মুখোমুখি দাঁড়ালো—চোখে প্রতিকূল দৃষ্টি।

—কী বলবে বলো ?

—এই মাত্র ডবোথির কাছে শুনলুম তুমি চলে যাচ্ছ পরশুদিন। বললো তুমি এখানে এসেছ সব গোছগাছ করতে ; তোমায় যদি কিছু সাহায্য করতে পারি এই ভেবে ডরোথিই পাঠিয়ে দিলো আমায়।

—অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ; কিন্তু আমি নিজেই বেশ পারবো।

—আমারও তাই ধারণা। কিন্তু সে জন্য আমি আসিনি। আমি

জানতে এসেছি কালকের ঘটনার সংগে তোমার এই হঠাৎ চলে যাওয়ার কোন যোগাযোগ নেই তো!

—তোমার এবং ডরোথির কাছ থেকে যথেষ্ঠ সদয় ব্যবহার পেয়েছি। তারই সুযোগ নিয়েছি এই কথাটা তোমরা ভাববে আমি ইচ্ছা করি না।

—উত্তরটা খুব সহজ হোল না, কিটী।

—কিন্তু তাতে কী যায় আসে তোমাব ?

—অনেক। এ আমি ভাবতে পারি না যে, আমারই জন্য তুমি চলে যাচ্ছ এমনি করে।

টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছিল কিটী। দৃষ্টি অবনত। নজর পড়লো 'স্কেচ' পত্রিকাটার ওপর। এক মাসের পুরনো কাগজ। সেই কাগজটা, যার ওপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছিল ওয়ালটাবের সেই ভীষণ সন্ধ্যায় যেদিন······আর আজ ওয়ালটার······চোখ তুলে তাকায় কিটী।

—জানো, নিজেকে বড়ো হীন মনে হচ্ছে আমাব। আমি নিজেকে যতটুকু ঘৃণা করি হয়তো ততটুকু ঘৃণা তুমিও কর না।

—কিন্তু আমি তো ঘৃণা করি না তোমায়, কিটী। গতকাল তোমায় যা কিছু বলেছি তার প্রতিটা বর্ণ সত্যি। এমন করে পালিয়ে যাওয়া কেন, বলতে পারো? বুঝতে পারছি না কেন আবার পরস্পরের বন্ধু হতে পারি না আমরা। তোমাব সংগে একটুখানিও দুর্ব্যবহার করেছি আমি এ যে ভাবতেও পারি না।

—কেন আমায় বিরক্ত করছো ?

—চুলোয় যাক সব। আমি পাথরও নই, কাঠও নই। তোমার কথাবার্তার কোন মানে হয় না। কেমন অস্বাভাবিক কথা বলছো। ভেবেছিলুম কালকের ঘটনার পর আরো অনুরক্ত হবে আমার প্রতি। আমরা মানুষ তো!

—না, মানুষের আর কোন অনুভূতিই নেই আমার। পশু বলেই

মনে হয় নিজেকে। একটা শুয়োর একটা খরগোস বা একটা কুকুরেরই সামিল আমি। তোমাকে কোন দোষ দিই না, আমিও তো তোমারই মতো! তোমাকে কামনা করেছিলুম বলেই তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। কিন্তু সেই কি আমার সত্যিকার পরিচয়! সেই ঘৃণ্য, বন্য, কামুকাকে মেনে নিতে রাজি নই। তোমার করুণাময়ী স্ত্রী যাকে আশ্রয় দিয়েছেন, যার স্বামীর মৃতদেহ কবরের নিচে শীতল হবার আগেই কামার্ত হয়ে তোমার শয্যাসংগিনী হয়েছে, সে তো আমি নই! আমারই ভেতরকার একটা পশু, কালো কুৎসিৎ প্রেত-যোনির মতোই বীভৎস এবং ভয়ংকর। আমি তাকে স্বীকার করি না, ঘৃণা করি অন্তর থেকে। মনে পড়লেই ভেতরকার সবগুলো অন্ত্র যেন পাকিয়ে ওঠে, বমি আসে।

ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে চার্লির। কেমন একটু অসোয়াস্তি ভাব।

—দেখ, মনের প্রসারতা আমার অনেক; কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি সব কথা বেরিয়ে আসে তোমার মুখ থেকে যা শুনে সত্যি আঘাত পাই।

—সে জন্য খুবই দুঃখিত। তুমি এবার যাও। তুমি একটা অতি সাধারণ লোক, তোমার সংগে এ সব আলোচনা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

নিরুত্তর রইলো চার্লি কিছুক্ষণ। কিন্তু তার নীল চোখের ছায়ায় ক্রোধের আভাস কিটী লক্ষ্য করলো। এইবার চতুর চার্লি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে, সসৌজন্যে শেষবারের মতো বিদায় দেবে। কী বলে তারা শিষ্টভাবে পরস্পরে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাবে এই কথাটা ভাবতেও বেশ মজা লাগলো কিটীর। কিন্তু হঠাৎ চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল চার্লির।

—ডরোথি বলছিল তুমি নাকি মা হতে যাচ্ছ?

লজ্জায় রঙিন হয়ে উঠলো কিটী, কিন্তু নিজেকে সামলাবার কোন চেষ্টাই করলো না।

—হ্যাঁ।

—ভাবী সন্তানের পিতা কি আমিই?

—না, না, এ ওয়ালটারের সন্তান!

কথাটায় বিশেষ রকম জোর না দিয়ে পারেনি কিটী; কিন্তু বলেই বুঝতে পারলো তার কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়ের অভাব রয়েছে।

—ঠিক তো? (মুখে ধূর্তামির মুচকি হাসি) দু-বছর বিয়ে হয়েছে তোমার অথচ এর মধ্যে কিছুই ঘটেনি কিন্তু। সময়ও বেশ মিলে যাচ্ছে দেখছি। আমার মনে হয় তোমার ভাবী সন্তান ওয়ালটারের না হয়ে আমারই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

—আমি মরে যাবো, তবুও তোমার সন্তান ধারণ করবো না কোনদিন।

—ছিঃ, কী যা তা বলছো তুমি। আমি খুবই খুশি হবো এতে। জানো, মেয়ে সন্তান হলেই ভালো হয় বেশ। ডরোথির কাছে শুধু ছেলেই পেয়েছি কটি। যাক, সন্দেহ থাকবে না বেশিদিন। আমার সব-কটা ছেলেই কিন্তু দেখতে আমারই মতো।

আবার খুশি-মেজাজে ফিরে এলো চার্লি। ভাবান্তরের কারণ বুঝতে পারলো কিটী। সন্তান যদি তারই হয়, চার্লির সংগে আর দেখা না হলেও পরিত্রাণ পাবে না সে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চার্লির অপ্রতিহত শক্তি অদৃশ্যভাবে প্রভাবান্বিত করে তুলবে।

—আমার দুর্ভাগ্য তোমার মতো এমনি দাম্ভিক অপদার্থ লোকের সংগে পরিচয় হয়েছিল।

জাহাজ মার্সাই বন্দরে ঢুকবার সংগে সংগে রৌদ্র-ঝলমল উঁচু-নিচু মনোরম সমুদ্রের তটরেখার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কিটীর কুমারী মেরীর স্বর্ণ প্রতিমূর্তির দিকে নজর পড়লো। 'সন্ত-মেরী-দ্য-লা-গ্রেস'-এর গির্জার ওপর সমুদ্রগামী নাবিকদের নিরপত্তার প্রতীক-রূপে দাঁড়িয়ে আছে। মী-তান-ফু প্রবাসী সিসটারদের কথা মনে পড়লো। দেশ ছেড়ে যাবার সময় নীলাকাশের অসীম দিগন্তের গায় দূরে বিলীয়মান মূর্তিটিকে একটুখানি সোনালি শিখার মতোই মনে হয়েছিল তাদের। হাঁটু গেড়ে দুই হাত তুলে তারা প্রার্থনা জানিয়েছিল যেন বিচ্ছেদের জ্বালা ভুলতে পাবে। অজানা এক মহাশক্তির উদ্দেশে কিটীব মাথা আপনি নত হয়ে এলো।

এই সুদীর্ঘ নিরাপদ যাত্রার পথে কিটী অবিরত চিন্তা করেছে, ঘটনাব কী ভয়াবহ আবর্তেই না জড়িয়েছে তার জীবন! নিজেকেই যেন সে বুঝতে পারেনি; সবই যেন কী করে কী সব ঘটে গেল। কী তাকে পেয়ে বসেছিল সেদিন! মনের এত ঘৃণা, এত ধিক্কার সত্ত্বেও কেন সে আত্মসমর্পন করেছিল চার্লির ঐ পংকিল আলিংগনে? ক্রোধে ভরে উঠলো মন, বিতৃষ্ণায় বিষাক্ত করে দিলো তার সর্ব সত্তাকে। জাবনে এই চরম অপমান সে ভুলতে পারবে না। কান্নায় ভেঙে পড়লো কিটী। কিন্তু হংকং-এর দূরত্ব যতই বেড়ে উঠছে যেন আবছা অস্পষ্ট হয়ে আসছে মনের বিতৃষ্ণা! যা কিছু ঘটেছে সবই বুঝি আর কোন ভিন্ন এক জগতের কথা! হঠাৎ পাগল-হয়ে-যাওয়া লোক যেমন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরে এসে বিভ্রান্তির অস্পষ্ট স্মৃতিতে লজ্জায় সংকোচে মুষড়ে পড়ে কিটীরও নিজেকে তেমনি মনে হোল। প্রকৃতিস্থ লোকটি জানে সে যা করেছে সজ্ঞানে করেনি তাই সহজে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু কিটীর মনে এলো খুব উদার হৃদয় ছাড়া কেউ তাকে অনুকম্পার চোখেও দেখবে না। নিজের আত্মবিশ্বাস এমনি ভেঙে টুকরো টুকরো হতে দেখে বুক চিরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে

এলো। সম্মুখে ছিল তার উন্মুক্ত সহজ সরল পথ, আর আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে পথ দুর্গম—এখানে ওখানে খানা-ডোবা পথ আগলে রয়েছে। ভারত মহাসাগরের বিশাল বিস্তৃতি ও তারই বুকে বিষাদমগ্ন সুন্দর সূর্যাস্ত শান্ত করেছে কিটীর মন। কোন অজানা দেশে যেন পৌঁছে গেছে যেখানে চরম মুক্তির মধ্যে ফিরে পাবে তার পরম সত্তাকে। চরম সংগ্রামের বিনিময়েও যদি ফিরে পায় তার আত্মসম্ভ্রম, দুর্জয় সাহসে সে-দ্বন্দের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত সে।

ভবিষ্যত সহায়হীন, কঠিন, নির্মম। পোর্ট সৈয়দে এসে মার চিঠি পেলো তার কেবল-এর উত্তরে। সুদীর্ঘ চিঠি, ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা। নিতান্ত সেকেলে ধরণে। চিঠির ছত্রে ছত্রে আশংকার প্রাচুর্যতায় মনের অসারল্যের প্রকাশ। ওয়ালটারের মৃত্যুতে মিসেস গারস্টিন দুঃখ প্রকাশ করেছেন,কিটীর শোকে যথাযথ সমবেদনাও জানিয়েছেন। আশংকা প্রকাশ করেছেন হয়তো নিঃসম্বল অবস্থায়ই ফিরছে কিটী, তবে এ ভাবও প্রকাশ করেছেন যে উপনিবেশ অফিস নিশ্চয়ই একটা পেনসনের ব্যবস্থা করবে। কিটী আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসছে জেনে খুবই খুশি হয়েছেন; ছেলে না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই মা বাপের কাছেই এসে থাকবে। তারপর কতকগুলো উপদেশ, ডরিসের ছেলে হওয়ার সময়কার বিস্তৃত কাহিনী। শিশুর ওজন এত বেশি হয়েছিল যে ওর ঠাকুরদা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—এমনি ওজন নাকি তিনি আর কোনদিন দেখেন নি। আবার সন্তান হবে ডরিসের, পুত্র সন্তানই আশা করছে সবাই—ব্যারনেসির নিশ্চিন্ত উত্তরাধিকার আরো নিরাপদ করবার জন্য।

কিটী লক্ষ্য করলো তার মার চিঠির আসল কথা তাঁদের কাছে তার থাকার সীমা নির্দেশ। নিঃসম্বল বিধবা কন্যার ভার নেওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা নেই মিসেস গারস্টিনের। আরো বিস্ময় লাগে

যখন মনে পড়ে সে তার মায়ের অতি আদরের পুত্তলি ছিল একদিন; আর আজ সে-ই অবাঞ্ছিত তাঁর কাছে! কী বিচিত্র এই মাতাপিতা আর সন্তানের বন্ধন! শৈশবে সন্তানকে নিয়ে মাতাপিতার সে কী উৎকণ্ঠা; সন্তানেরও মাতাপিতার প্রতি সে কী স্নেহ আর শ্রদ্ধার আকর্ষণ। কয়েক বছর পর, শিশু বড় হলে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পিতামাতার চেয়েও যাকে বেশি প্রয়োজন সে হয়তো সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। অতীতের অন্ধ এবং স্বপ্রণোদিত স্নেহের স্থলে আসে অবজ্ঞা আর অনাসক্তি। পরস্পরে দেখা সাক্ষাতে আসে শুধু একঘেয়েমি আর বিরক্তি। একমাসের বিচ্ছেদের ভাবনাই যেখানে অসহণীয় ছিল, সারা জীবনের ছাড়াছাড়িতেও আর আসে না কোন ভাববিবর্তন। ভাবনার কোন কারণ নেই তার মায়ের; যত শিগগির সম্ভব নিজেকে সামলে নেবে নিজেই। কিন্তু তার একটু সময়ের প্রয়োজন; সবই যেন এখন অস্পষ্ট তার কাছে। ভবিষ্যতের কোন আকারই রূপায়িত করতে পারছে না এখন। প্রসবকালে মরেও তো যেতে পারে সে; সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায় তাহলে।

জাহাজ বন্দরে নোঙর করবার সংগে সংগেই তার হাতে এলো দুখানা চিঠি। তার বাবার হস্তাক্ষর চিনতে পেরে বিস্মিত হোল কিটী; তাঁর কোন চিঠি পেয়েছে কখনো মনে পড়ে না। কোন বাহুল্য নেই। লিখেছেন—তার মা অসুস্থ হয়ে অপারেশনের জন্য নার্সিং-হোমে আছেন, তাই তাঁর বদলে তিনিই লিখছেন। কিটী যেন ভয় না পায়। সমুদ্র পথে ঘুরে আসাই ভালো। স্থলপথে খরচ বেশি, তাছাড়া তার মার অনুপস্থিতিতে হ্যারিংটন গার্ডেনের বাড়িতে হয়তো কিটীর অসুবিধায়ও হবে অনেক। অন্য চিঠি ডরিসের। লিখেছে—কিটী ডারলিং, বিশেষ স্নেহ বশেই এই সম্ভাষণ জানায়নি ডরিস, পরিচিত সবাইকে এমনি করে লেখাই তার অভ্যাস।

কিটী ডারলিং।

বাবার চিঠি পেয়েছো নিশ্চয়ই। মার অপারেশন হবে। গত একটা বছর ভুগেছেন উনি। আর তুমি জানোইতো ডাক্তার দেখানো ওঁর স্বভাবের বাইরে। যত সব পেটেণ্ট ঔষধ খেয়েছেন এতকাল। অসুখটা যে কী তা অবশ্য আমিও সঠিক জানি না, কারণ ব্যাপারটা গোপন রাখাই তাঁর ইচ্ছা: কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে আবার রেগে আগুন। অবস্থা খুবই খারাপ মনে হচ্ছে ক-দিন। আমি হলে যে করে হোক মার্সাই নেমে চলে আসতুম; তুমিও চলে এসো তাড়াতাড়ি। কিন্তু তোমায় স্থলপথে আসতে লিখছি এই কথাটা প্রকাশ করো না যেন; কেননা মার ধারণা তাঁর কিছুই হয়নি আর তিনি বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এসে পৌঁছও এটাও তাঁর ইচ্ছে নয়। ডাক্তারদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছেন এই বলে যে এক হপ্তার ভেতরই ছুটি দেবে তাকে। ভালোবাসা জেনো।

—ডরিস

পুনঃ—ওয়ালটারের জন্য আন্তরিক দুঃখিত। সত্যি ভারি বিশ্রীরকম বিপদে পড়েছো তুমি। তোমায় দেখবার জন্য অস্থির হয়ে আছি। এ কিন্তু ভারি মজা যে আমাদের দুজনারই ছেলে হবে একই সময়ে। আমরা হাত ধরাধরি করে চলতে পারবো।

চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কিটী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ডেকের ওপর। মা অসুস্থ কল্পনাও করতে পারে না। মাকে কোনদিন অক্ষম ব পীড়িত দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তিনি বরং অপরের অসুস্থতায়ই অস্থির হয়ে পড়েছেন। সেই সময় একজন স্টুয়ার্ড একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এলো কিটীর কাছে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, আজকে সকালে তোমার মা মারা গিয়েছেন।

বাবা

হ্যারিংটন গার্ডেন-এর বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কলিং-বেল টিপলো কিটী। খবর পেলো বাবা পড়ার ঘরে আছেন ; ওখানে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললো কিটী। চুল্লির ধারে বসে সান্ধ্যপত্রিকা পড়ছিলেন মিঃ গারস্টিন। ফিরে তাকালেন কিটীর ঘরে প্রবেশ করবার সংগে সংগেই। একটু হকচকিয়ে কাগজটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

—আরে, কিটী ! এ ট্রেণে আসবে আশা করিনি !

—স্টেশনে যেতে অসুবিধে হবে তোমার, তাই পোঁছবার সময় জানাইনি।

নিজের কপোল এগিয়ে দিলেন কিটীকে চুমু খেতে, কিটীর মনে পড়ে এই তাঁর অভ্যাস।

—খবরের কাগজটায় একটু চোখ বুলোচ্ছিলুম। গত দুটো দিন পড়তেই পারিনি। তিনি বললেন।

কিটী লক্ষ্য করলো, দৈনন্দিন সাধারণ কাজে মনঃসংযোগের জন্য আজ তার বাবা অজুহাত খোঁজার প্রয়োজন বোধ করছেন।

—তুমি বোধ হয় খুব মুষড়ে পড়েছো। বুঝতে পারছি মার মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেয়েছো।

আগের চেয়েও অনেক বেশি রোগা মনে হচ্ছে তাঁকে। আরো যেন বেশি বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে তাঁর চোখে মুখে। জীর্ণ শীর্ণ ছোট্ট ফিটফাট মানুষটি।

—বাঁচবে বলে কোন আশাই দেয়নি ডাক্তার। গত একটা বছর এমনি ভুগছিল তোমার মা, অথচ কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চায়নি। ডাক্তার বলছিল গত একটা বছর নিশ্চয়ই খুব যন্ত্রণা ভোগ করেছে ; কিন্তু আশ্চর্য এতদিন কেমন করে সহ্য করেছে !

—মা কি কখনো কিছু বলেনি ?

—শুধু বলতো শরীর ভালো না। কিন্তু ব্যথা-বেদনার কথা বলেনি কোনদিন।

তারপর একটু থেমে কিটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ;

—এত রাস্তা এসে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো নিশ্চয় !

—না, তেমন কিছু না।

—ওপরে তোমার মাকে দেখতে যাবে ?

—এখানেই আছে নাকি ?

—হ্যাঁ। নার্সিং-হোম থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে।

—যাবো।

—তোমার সংগে যাবো ?

পিতার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যার জন্যে চকিতে ফিরে তাকালো কিটী। এক পাশে মুখটা ফিরিয়ে রেখেছিলেন পাছে কিটীর চোখে তাঁর চোখ পড়ে। অপরের মনের কথা বুঝবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আয়ত্ব করেছিল কিটী। প্রতিটি কথা, প্রতিটি অংগ-ভঙ্গির ভেতর থেকে স্বামীর অন্তরের গভীব গোপন কথা আবিষ্কার করতেই তো নিয়োগ করেছিল তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিনের পর দিন। তাই তার বাবা তার কাছে কী গোপন করতে চাইছেন সে বুঝতে পেরেছে। রেহাই পেয়েছেন তিনি, সীমাহীন স্বস্তি ; কিন্তু ভয়ও হয় ওঁব নিজেকে। গত সুদীর্ঘ ত্রিশটা বৎসর সবার কাছে তাঁব পরিচয় ছিল বিশ্বস্ত স্বামী বলে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন কথাই উচ্চারণ করেননি তিনি কোনদিন ; আর আজও তার জন্য শোক প্রকাশ করতে হবে। তাঁর কাছে যতটুকু প্রত্যাশা সবার ততটুকুই তিনি করেছেন সব সময়। তাই একটু চোখের পলকে, একটু কথার ইংগিতেও যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে শোকার্ত স্বামীর অনুভূতি নেই তাঁর মনে, তাহলে সেটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

—না আমি একাই বরং যাচ্ছি। বলে কিটী।

উপরে প্রশস্ত এবং অসোয়াস্তিকর পারিপাট্যে সাজানো মায়ের শোবার ঘবটিতে প্রবেশ করলো কিটী। বিরাট বিরাট মেহগনি

কাঠের আসবাব আর দেয়ালের গায় মার্কাস-স্টোনের অনুকরণে খোদাই দেয়ালচিত্র, সবই চিনতে পারলো কিটী। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর সবগুলো জিনিস তেমনি নিখুঁতভাবে সাজানো আছে এখনো। এমনি পারিপাট্যের ওপর চিরকাল ঝোঁক মিসেস গারস্টিনের। মার ঘরে ফুলগুলো বড়ো বেমানান ঠেকছিল কিটীর কাছে। শোবার ঘরে ফুল রাখা অস্বাস্থ্যকর এবং রুচিহীনতার পরিচয় বলে মনে করতেন মিসেস গারস্টিন। তার মার ঘরের সেই অতি সুপরিচিত সদ্য-কাচা কাপড়ের কড়া গন্ধ ফুলের সুবাসেও ঢাকা পড়েনি। এই ঝাঁঝালো গন্ধটা মায়ের ঘরের বৈশিষ্ট্য, কিটীর মনে পড়লো।

বিছানার ওপর মিসেস গারস্টিনের দেহ প্রসারিত। বুকের উপর জড় করা হাতদুটো। জীবিত অবস্থায় এতটা নম্রতায় ধৈর্যচ্যুতি আসতো হয়তো তাঁর। দীর্ঘ রোগ ভোগে গাল দুটো গর্তে ঢুকে গিয়েছে, কপালের দুই পাশে দুটি গভীর খাদ। তবু তাঁর বলিষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ গঠনের জন্যই তখনো মনে হচ্ছিল অদ্ভুত সুন্দর, এমন কি বিস্ময় উদ্দীপকও। মৃত্যুর হিমস্পর্শে হীনতার ছাপ মুছে গিয়ে তাঁর মুখের ওপর চারিত্রিক দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠেছে। রোমান সম্রাজ্ঞীর মতোই মনে হচ্ছিল তাঁকে।

কিটী অবাক হয়ে যায়, এতকাল যতগুলো মৃতদেহ দেখেছে একমাত্র মায়ের এই অবিকৃত মুখখানি দেখে মনে হোল এই নশ্বর দেহটাই ছিল একদিন আত্মার আশ্রয়। শোকের কোন অনুভূতিই ছিল না কিটীর মনে; পরস্পরের প্রতি মনোভাবের তিক্ততার আধিক্যের জন্যই স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠবার সুযোগ পায়নি কোনদিন। তাই অতীতের ছেলেবেলার দিনগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে এই কথাই মনে হোল, এই মা-ই তাকে সে ভাবে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু ঐ কঠিন, কর্তৃত্বাভিমানী, দুরাকাংক্ষী মহিলা স্থির নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে মৃত্যুর ক্রোড়ে, যার আশা-আকাংক্ষা

ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিটী তার বুকের ভেতর কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করে। পরিকল্পনা আর ষড়যন্ত্রই করেছে তার মা সারাটা জীবন, কামনা করেছে যা কিছু নগন্য অতি সাধারণ। অন্য কোন জগত থেকে মা তার ফেলে-আসা জীবনের কৃতকর্মের দিকে তাকিয়ে আতংকে শিউরে উঠবে কিনা কে জানে!

ডরিস প্রবেশ করলো।

—আমি ভেবেছিলুম এই গাড়িতেই তুমি আসবে। মনে করলুম দেখা করে যাই তোমার সংগে! সত্যি, কী ভীষণ, না? বেচাবা মা!

কান্নার আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডবিস কিটীর দুই বাহুব ভেতব। চুম্বন করলো কিটী তাকে। কিটীব মনে পড়লো, অতি সাধাবণ-ভাবে চলাফেবার জন্য তার মা এই ডরিসকে কতই হেনস্তা করতেন। আশ্চর্য! সত্যিই কি মায়ের মৃত্যুতে এতটা দুঃখ হয়েছে ডরিসের! কিন্তু ডরিস বরাবরই একটু বেশি প্রক্ষুব্ধ। কিটীরও ইচ্ছে হচ্ছিল সেও যদি কাঁদতে পারতো এমনি। ডরিস তাকে নিশ্চয়ই ভয়ংকর নিষ্ঠুব মনে কববে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে হোল লোক দেখানো শোক প্রকাশ তো অনেক হয়েছে আর কেন!

—বাবার সংগে দেখা করবে?

কান্নার বেগ প্রশমিত হবার পব জিজ্ঞাসা করলো কিটী। ডরিস চোখ মুছলো। কিটী লক্ষ্য করলো পোয়াতী ডরিস যেন কেমন ঢ্যাপসা হয়ে গেছে। শোকের কালো পোশাকে আরো জবুথবু মনে হচ্ছিল তাকে।

—না, থাক। আবার কান্না আসবে তাহলে। বেচারা বাবা! অদ্ভুত সহ্যগুণ!

বোনকে বাড়ির বাইরে অবধি এগিয়ে দিয়ে কিটী ফিরে এলো

তার বাবার কাছে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, হাতে খবরের কাগজটা সযত্নে ভাঁজ করা। তিনি আর কাগজ পড়ায় মন দেননি—কিটীকে তাই বোঝাতে চাইছিলেন।

—ডিনারের জন্য পোশাক বদলাইনি। দরকারই-বা কী! তিনি বললেন।

ডিনার সারা হোল।

মিঃ গারস্টিন স্ত্রীর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর বিস্তৃত বিবরণ জানালেন কিটীকে। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই চিঠি দিয়ে সমবেদনা জানিয়েছে সে খবরও শুনলো কিটী। (টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত সমবেদনাসূচক চিঠি, এ সবের জবাব দিতে হবে ভেবেও হাঁপিয়ে উঠলেন গারস্টিন।) অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থার কথাও হোল। তারপর আবার দুজনে ফিরে এলেন পড়ার ঘরে। এ বাড়িতে চুল্লি আছে শুধু এই ঘরটিতেই। চিমনির ওপর থেকে পাইপটি তুলে নিলেন মিঃ গারস্টিন। তামাক পুরতে পুরতে কেমন একটু সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে, আবার কী মনে করে রেখে দিলেন পাইপটা।

—পাইপটা রেখে দিলে যে, বাবা? খাবে না?

—ডিনারের পর পাইপের গন্ধ তোমার মা পছন্দ করতেন না, আর যুদ্ধের পর থেকে সিগার খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি।

কথা কয়টা কেমন একটু মোচড় দিলো কিটীকে। ষাট বৎসরের বৃদ্ধও ইতস্তত করছেন নিজের ঘরে বসে ধূমপান করতে—কেমন অদ্ভুত লাগে কিটীর।

—পাইপের গন্ধ আমার ভালো লাগে, বাবা। তুমি খাও।

একটু হেসে বলে কিটী।

তৃপ্তির একটুখানি ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠলো মিঃ গারস্টিনের মুখে। পাইপটা তুলে নিয়ে ধরালেন। আগুনের কাছে মুখোমুখি হয়ে বসলেন তারা দুজন। কিটীর কথাই বলা উচিত, ভাবলেন মিঃ গারস্টিন।

—পোর্ট সৈয়দে তোমার মার চিঠি পেয়েছিলে বোধ হয়। বেচারা ওয়ালটারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দুজনাই খুব মর্মাহত হয়েছিলুম। বড়ো ভালো লাগতো আমার ওকে।

কিটী বুঝতে পারে না উত্তরে কী বলবে।

—তোমার মা বলেছিলেন তুমি নাকি সন্তান-সম্ভবা ?

—হ্যাঁ।

—কবে আশা করছো ?

—মাস চারেকের ভেতর।

—যাক, কিছুটা শান্তি পাবে তুমি এতে। ডরিসের ছেলেকে দেখতে যেয়ো। বেশ ছেলেটি হয়েছে।

হঠাৎ দেখা আগন্তুকের চেয়েও দূরত্বের ব্যবধান রেখে যেন কথা বলছিল তারা। অপরিচিত হলে হয়তো আরো একটু আগ্রহ দেখাতেন উনি, কিন্তু উভয়ের পরিচিত-অতীতই যেন ঔদাসীন্যের একটা বিরাট পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়েছিল তাদের মাঝখানে। কিটী ভালোভাবেই জানতো পিতার স্নেহ অর্জনের জন্য সে কিছুই করেনি কোনদিন। এ বাড়িতে তাঁর বিশেষ কোন মূল্যই তো ছিল না। পরিবারের বিলাসিতার প্রাচুর্য দিতে পারেননি তিনি, তাইতো বিদ্বেষই ছিল তাঁর প্রাপ্য। কিটীর ধারণা ছিল সন্তান বলে তার প্রতি অবশ্যই স্নেহ আছে তাঁর। কিন্তু আঘাত পেলো যখন বুঝলো তার প্রতি বাবার একটুও দরদ নেই। এইটুকু জানতো যে সবার কাছে তিনি ছিলেন অপ্রিয় ; কিন্তু তাদের কেউ-ই তাঁর কাছে প্রিয় ছিল না এ খোঁজ তারা কেউ নেয়নি কোনদিন। তিনি এখনো তেমনি দয়ালু,

তেমনি নম্র ; কিন্তু দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কিটী তারই মাপকাঠিতে বিচার করে বুঝতে পারে, মনে প্রাণে তিনি কিটীকে কতটা অপছন্দ করেন। একথা তিনি যদিও স্বীকার করেননি এবং করবেনও না কোনদিন।

ধোঁয়া আসছিল না পাইপ থেকে। খোঁচাবার জন্য একটা কিছু খুঁজতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ গারস্টিন। হয়তো-বা মনের চাঞ্চল্যটুকু গোপন করবার এও একটা অছিলা মাত্র।

—তোমার মার ইচ্ছা ছিল ছেলে না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক। সেজন্য তোমার নিজের ঘরটাও গুছিয়ে রেখেছিলেন।

—জানি। কিন্তু কোন রকম অসুবিধায় ফেলতে চাই না তোমাদের, বাবা।

—আরে না, তা বলছি না আমি। এমনি অবস্থায় তুমি তোমার বাবার কাছে আসবে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হচ্ছে কী বাহামার প্রধান বিচারপতির পদের জন্য আহ্বান পেয়েছি ; নিতে রাজিও হয়েছি।

—সত্যি, বাবা! ভারি খুশি হয়েছি। অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে।

—কিন্তু আহ্বানটা এলো বড়ো দেরিতে, তোমার মাকে খবরটা দিতে পারিনি। খুব সন্তুষ্ট হতেন তিনি।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! জীবনের সব প্রচেষ্টা, সব ষড়যন্ত্র আর সকল অপমানের পরেও মৃত্যুর পূর্বে এই কথাটা জেনে যেতে পারলেন না মিসেস গারস্টিন যে, তাঁর ব্যর্থ উচ্চাভিলাষ ফলবতী হয়েছে আংশিকভাবেও।

—আসছে মাসের গোড়ার দিকেই রওনা হচ্ছি বোধ হয়। এ বাড়িটা এজেন্টের হেপাজতেই থাকবে, তবে আসবাবগুলো বিক্রি করে দেবো ভাবছি। খুবই দুঃখিত এ বাড়িতে তোমাকে আর থাকতে দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে কোন একটা ফ্ল্যাট-বাড়িতে

আসবাবপত্রগুলোর যদি তোমার দরকার হয় তবে সানন্দে রেখে যাবো।

চুল্লির আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো কিটী। বুকের ভেতরটা কেমন দপদপ করে উঠলো। খুবই আশ্চর্য, হঠাৎ এতটা নার্ভাস হয়ে পড়লো কেন! অবশেষে নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বললো; কিন্তু কণ্ঠস্বরে মৃদু কম্পন।

—বাবা, তোমার সংগে আমিও যেতে পারি না কি?

—তুমি? ওঃ ডিয়ার কিটী........

মুখটা কেমন ঝুলে পড়লো তাঁর। এই কথাটা পিতার মুখে আরো কতবার শুনেছে কিটী, শুধু একটা কথার-কথা বলেই মনে হয়েছে এতকাল। জীবনে সে এই প্রথম যেন এই কথার মানে এবং প্রতিক্রিয়া অনুভব করলো। এই ছোট্ট কথাটার প্রবল ধাক্কায় সে চমকে উঠলো।

—কিন্তু তোমার সব বন্ধু বান্ধব এখানে, ডবিসও এখানে! লণ্ডনে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকলে খুবই খুশি হবে এই তো আমার ধারণা ছিল। তোমার আর্থিক অবস্থা কেমন তা অবশ্য জানি না, তবে বাড়ি ভাড়াটা আমিই দেবো মনে করেছি।

—না, বাবা, সে প্রয়োজন হবে না। আমার যা আছে নিজের জন্য যথেষ্ট।

—একটা অপরিচিত নতুন জায়গায় যাচ্ছি। সেখানকার হালচাল কিছুই তো জানি না।

—অপরিচিত পরিবেশে থেকে আমি অভ্যস্ত। লণ্ডনের ওপর আমার আর কোন মোহ নেই। এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠছি, বাবা।

মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন তিনি। কিটীর মনে হোল বুঝি কেঁদে ফেলবেন। একটা তীব্র বিষাদের ছায়া নেমে এলো তাঁর মুখে। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো কিটীর। ঠিকই

বুঝেছিল কিটী, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন তিনি। অবাঞ্ছিত অতীতের কাছ থেকে রেহাই পাবার এই সুবর্ণ সুযোগে চিরমুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন তিনি। সুখের মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে এতদিন পরে নতুন জীবনের সম্ভাবনা সম্মুখে প্রসারিত দেখতে পেয়েছেন। গত সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের বুকভরা দুঃখের নির্যাতন যেন অস্পষ্ট দেখতে পেলো কিটী। অবশেষে চোখ খুললেন তিনি। বুক চিরে বেরিয়ে-আসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস সংবরণ করতে পারলেন না।

—সত্যি যদি আমার সংগে যেতে চাও খুবই খুশি হবো।

বড়ো করুণ শুনালো এই কথাটুকু। ক্ষণস্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের পর কর্তব্যবোধের কাছে এমনি আত্মসমর্পণ! সব আশা ভরসা যেন মিলিয়ে গেল কোথায় এই কটি-কথার অন্তরালে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো কিটী। পিতার কাছে গিয়ে তাঁর দুটি হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো পায়ের কাছে। মুখ লুকোলো তাঁর কোলের ভেতর।

—না, বাবা, তুমি মন থেকে না চাইলে কিছুতেই যাবো না আমি। জীবনভোরই তো বঞ্চিত করেছো নিজেকে! আর নয়। একা যেতেই যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তোমার, তাই যাও বাবা। একটুও ভেবো না আমার জন্য।

মিঃ গারস্টিন একটা হাত ছাড়িয়ে নিলেন কিটীর মুঠোর ভেতর থেকে। তারপর ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন কিটীর সুন্দর চুলগুলোর ওপর।

—তোমায় চাই বই কি, মা! আমি যে তোমার বাবা! আর তুমি আজ বিধবা, সম্পূর্ণ একা। আমার কাছে থাকতে চাইলে আমি কি তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারি মা?

—কিন্তু তাহলেও, মেয়ে বলে কোন দাবিই তো নেই আমার তোমার ওপর।

—ও কী বলছো, মা !

—না, কোন দাবি নেই আমার। পুনরাবৃত্তি করে কিটী সজোরে। আজকে ভাবতেও মন ভেঙে পড়ে বাবা, সারাটা জীবন কতভাবে নিংড়ে নিয়েছি আমরা তোমাকে, অথচ প্রতিদানে দিইনি কিছুই কোনদিন। একটু স্নেহ পর্যন্তও না। জীবনে সুখ তুমি পেলে না কোনদিন। অতীতের সব ত্রুটি সব ব্যর্থতার একটুও পুরণ কববার সুযোগ কি দেবে না, বাবা, আজ?

কপাল কুঞ্চিতও হয়ে এলো তাঁর। কিটীর আবেগের উচ্ছ্বাস কেমন অপ্রতিভ করে তুললো তাঁকে।

—আমি বুঝতে পাবছি না, মা, কী বলছো তুমি। কোন অভিযোগ তো নেই আমাব তোমার বিরুদ্ধে, মা!

—বাবা, বহু দুঃখ আমি পেয়েছি—সুখেব মুখ দেখিনি একটুও কোনদিন। সেদিন যে কিটী গিয়েছিল তোমাদেব কাছ থেকে, সে কিটী আব নেই আজ। আজকে আমি বড়ো দুর্বল; কিন্তু সেদিনকার সেই কুৎসিত অপদার্থ কিটী নই। একটু সুযোগও কি দেবে না আমায়, বাবা? তুমি ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ যে আর নেই আমার! তোমাকে ভালোবাসবাব এতটুকু অধিকারও কি পেতে পারি না আমি? বাবা, আজ আমি বড়ো একা, বড়ো দুঃখিনী; তোমার স্নেহ যে বড়ো প্রয়োজন আমাব।

পিতার কোলে মুখ লুকিয়ে অঝোর বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লো কিটী।

—কিটী, কিটী মা আমার……

মুখ তুলে তাকালো কিটী, তারপব দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরলো তাঁর।

—বাবা গো, দয়া করো আমায়।

আবেগের উচ্ছ্বাসে চুমু খেলেন মিঃ গারস্টিন কিটীর ঠোঁটের ওপর। কিটীর চোখের জলে তাঁর গাল ভেসে গেল।

—নিশ্চয়ই তুমি আমার সংগে যাবে মা।

—তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাও? সত্যি চাও, বাবা?

—হ্যাঁ।

—আ-হ্। বড়ো কৃতজ্ঞ থাকবো আমি।

—লক্ষ্মী মা আমার, অমন কথা বলতে নেই। বড়ো বিশ্রী লাগে আমার।

রুমাল বের করে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন কিটীর। মিষ্টি হাসির ঝলক খেলে গেল তাঁর চোখে মুখে, এমনি হাসি দেখেনি কোনদিন কিটী। আবার দু-বাহু দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো সে।

—সত্যি বাবা, দেখো কী সুন্দর দিনগুলো আমাদের কাটবে সেখানে।

—কিন্তু ভুলে যেয়ো না মা, ছেলে হবে তোমার।

—ভাবতে কী যে আনন্দ! আমার মেয়ে আসবে উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে, সমুদ্রের গুরু গম্ভীর ডাকের শ্রুতিসীমায়।

—ছেলে না মেয়ে এর ভেতরই ঠিক করে ফেলেছো দেখছি। একটু নিরস হাসি হেসে বললেন।

—আমি মেয়েই চাই বাবা; কারণ একে আমি এমন করে মানুষ করতে চাই যেন আমার মতো ভুল না করে কোনদিন। ছেলেবেলার কথা যখনই মনে পড়ে আমার ধিক্কার দিই নিজেকে। কিন্তু কোন সুযোগই যে আমি পাইনি কোনদিন। তাই নিজের মেয়েকে এমনি গড়ে তুলবো যেন নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ের ওপর। এমন সন্তানের আমি জন্ম দেবো না এবং স্নেহ দিয়ে এমন করে গড়ে তুলবো না যে শুধু দুমুঠো অন্ন আর আজীবন ভরণ পোষণের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করবে যে কোন পুরুষের শয্যাসংগিনী হয়ে।

তার বাহু বন্ধনের ভেতর পিতার সর্ব শরীর যেন আড়ষ্ট হয়ে

উঠছে, বুঝতে পারলো কিটী। অমন কথা তাঁর মুখ দিয়েও আসেনি কোনদিন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন মিঃ গারস্টিন মেয়ের দুঃখের কথা শুনে।

—বাবা, শুধু একটিবার মন খুলে বলতে দাও আমায়। আমি নিজে ছিলুম এতকাল একটা নিরেট অপদার্থ, জঘন্য। কঠিন শাস্তি তাই পেয়েওছি আমি। আমার মেয়েকে এই সবের হাত থেকে বাঁচাতে চাই এই আমার সংকল্প। আমি তাকে দেখতে চাই নির্ভিক, স্পষ্টবাদী; পরনির্ভরশীল নয়; সে হবে শুধু আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ; পৃথিবীকে ভোগ করবে সে স্বাধীন মানুষেরই মতো, জীবনকে সে আমার মতো ব্যর্থ হতে দেবে না।

—এ সব কী বলছো, মা? এখনো যে জীবনের অনেকদিন পড়ে রয়েছে সামনে তোমার। এখনই ভেঙে পড়ো না।

মাথা নাড়ে কিটী; হাসে একটু শুধু।

—না, বাবা, ভেঙে আমি পড়িনি। আমাব আশা আছে, উদ্যম আছে এখনো!

অতীত শেষ হয়ে গিয়েছে তার। যাক না, মৃত্যুর গহ্বরে ডুবে যাক সে অতীত। কী-ই-বা ক্ষতি তাতে! বুক ভবা তার আশা, সে শিখেছে দাক্ষিণ্য, পেয়েছে সে দানেব মর্যাদা। জানে না কী আছে লুকিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে; কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় সে সঞ্চিত করেছে দুর্জয় সাহস, দুই হাতে হৃষ্টচিত্তে ববণ করে নিতে প্রস্তুত যে ডালিই নিয়ে আসুক না কেন অজানা ভবিষ্যত! হঠাৎ যেন কী এক অজানা কারণে মনের কোন এক অবচেতন দেশ থেকেই বুঝি তাদের—সে এবং হতভাগ্য ওয়ালটারের—সেই মহামারির দেশে যাত্রাপথের স্মৃতিটুকু মাথা তুলে দাঁড়ালো তার চোখের সামনে। তখনো ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি, তারা দুজন চলেছে চেয়ারে; দিনের আলোর সংগে সংগে দেখতে পেলো—বরং প্রতিভাত হোল বলাই সংগত—অপূর্ব এক জ্যোতি,

বুকের সব গ্লানি যেন মুছে গেল নিমেষে ঐ পুলকের স্পর্শে। পার্থিব তুচ্ছ লাভ ক্ষতি কলহ সংশয় সব অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে উঁকি দিলো সূর্যের আলো। দৃষ্টি যতদূর যায় দেখতে পেলো সম্মুখে পথ প্রসারিত। কখনো ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, ছোট্ট নদী পেরিয়ে ; অসমতল ভূমিতে কখনো উঁচুতে উঠেছে, কখনো নিচে নেমে গেছে। হয়তো-বা তার ভুল ত্রুটী, দুঃখ বেদনা, কিছুই ব্যর্থ নয় যদি সে সামনে এগোতে পারে এই পথের অস্পষ্ট রেখা ধরে। এপথ ঐ নির্বোধ আমুদে ওয়াডিংটনের নেতিবাদের পথ নয়। এ পথ শান্তির, যে পথে কৃচ্ছ্রতার ভেতর দিয়ে চলেছে কনভেণ্টের প্রিয় ভিক্ষুনীরা।



॥ বিচিত্রা প্রকাশিত চতুর্থ গ্রন্থ : আবরণ ॥

W. SOMERSET MAUGHAM

PAINTED VEIL

এর



প্রথম বাংলা সংস্করণ
আষাঢ়। ১৩৬৫



প্রকাশক . খগেন্দ্র বিশ্বাস। বিচিত্রা। ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলকাতা-১২ ॥ প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা : গণেশ বসু ॥ মুদ্রণ . গৌবচন্দ্র পাল। নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস। ২-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলকাতা-৬ ॥ বাঁধাই দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস। ১০১, বৈঠকখানা রোড। কলকাতা-৯ ॥



পাঁচ টাকা

